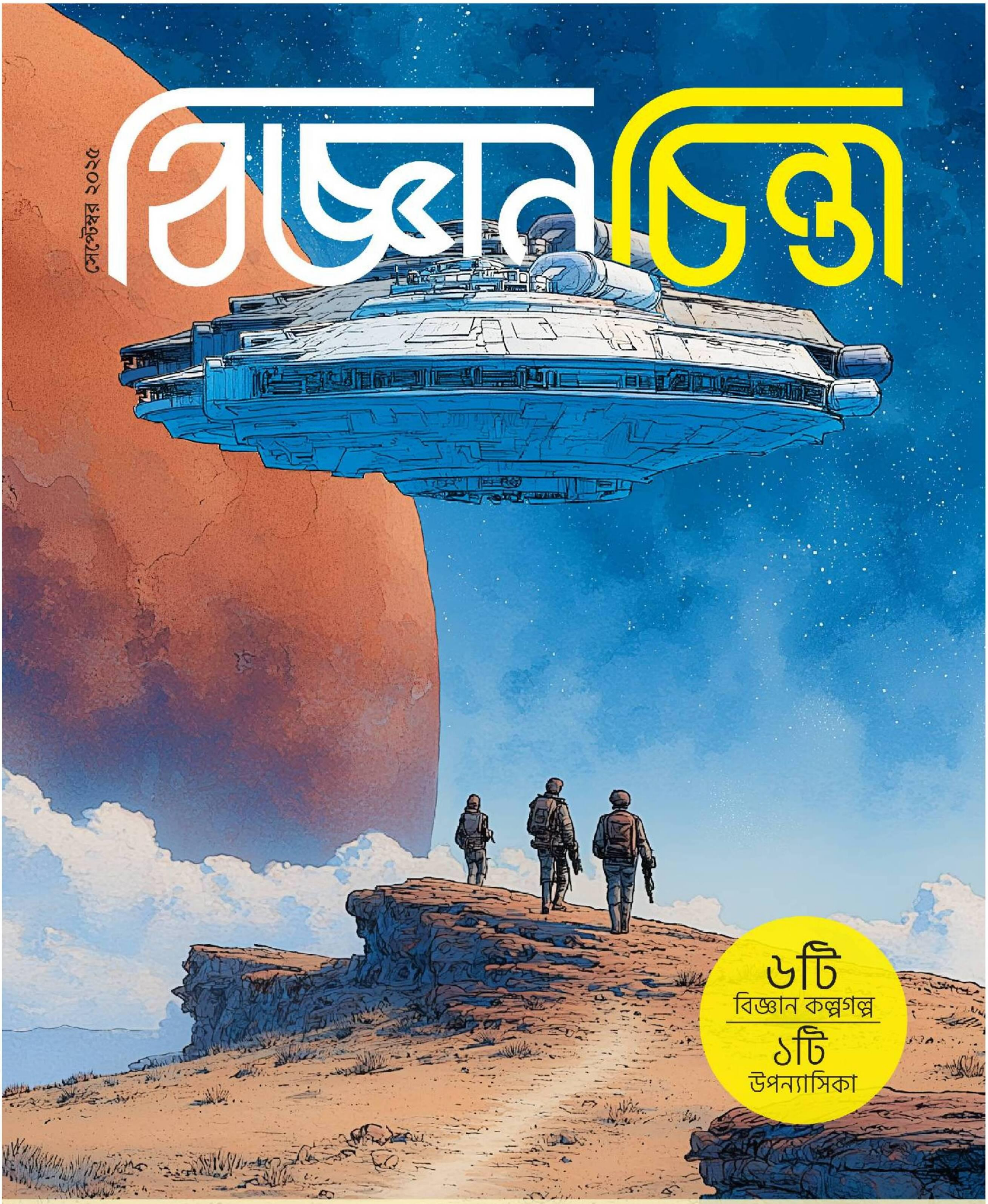
বিজ্ঞান বিচিত্রা

সেপ্টেম্বর ২০২৫



৬টি
বিজ্ঞান কল্পগল্প

১টি
উপন্যাসিকা

সিএমবি ফোটনের আসল উৎস কী
এআইয়ের দখলে ইন্টারনেট

প্রহেলিকাময় কোয়ান্টাম তত্ত্ব
রাসায়নিক বিক্রিয়া সহজ পাঠ

রম্য, ছড়া, কমিক,
ধাঁধা, কার্যকারণ

সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসারে

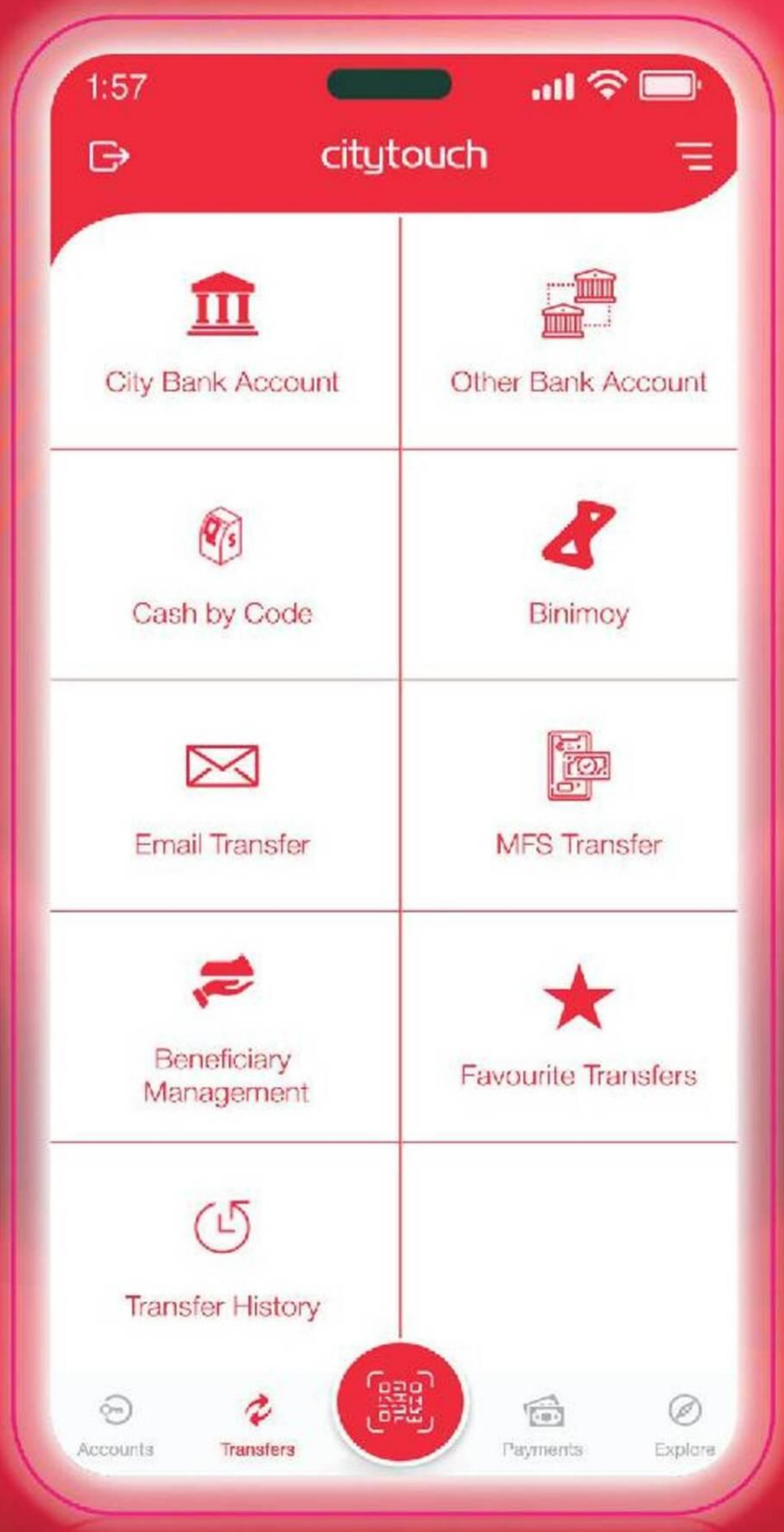
সিটি ব্যাংক™

citytouch
DIGITAL BANKING

city bank™
making sense of money

ব্যাংকিংয়ের সব এক অ্যাপেই সম্ভব

সকল ব্যাংকিং সেবার ওয়ানস্টপ সল্যুশন সিটিটাচ। ফান্ড ট্রান্সফার থেকে শুরু করে ডিপিএস, ফিক্সড ডিপোজিটসহ প্রয়োজনীয় যেকোনো ব্যাংকিং করতে পারবেন মাত্র কয়েকটা ট্যাপেই। তাই আজই খুলে ফেলুন সিটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আর সিটিটাচ অ্যাপ ডাউনলোড করে উপভোগ করুন ব্যাংকিংয়ের সকল সুবিধা। ***সিটিটাচ হাতে, ব্যাংকিং সাথে সাথে।***



সিটিটাচ ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন

ডাউনলোড করুন

citytouch
GET IT ON Google Play
EXPLORE IT ON AppGallery
Available on the App Store

FCB&ITOPI/24

ওয়ান্ডার

লেয়ার কেক



বাইটে বাইটে ওয়ান্ডার



ENVOY TEXTILES LIMITED

- **WORLD'S FIRST LEED CERTIFIED PLATINUM DENIM MILL**
- **FIRST ROPE-DYEING TECHNOLOGY** IN BANGLADESH
- **FIRST ECO LAB** IN BANGLADESH IN STRATEGIC PARTNERSHIP WITH **JEANOLOGIA**
- **11**-TIME WINNER OF **NATIONAL EXPORT TROPHY**
- WINNER OF **NATIONAL ENVIRONMENTAL AWARD**
- **3**-TIME WINNER OF **PRESIDENT'S INDUSTRIAL DEVELOPMENT AWARD**
- MULTIPLE-TIME WINNER OF **HIGHEST TAXPAYER AWARD**
- **2**-TIME WINNER OF **HSBC EXPORT EXCELLENCE AWARD**
- **LAB ACCREDITATION** BY RENOWNED BRANDS LIKE **LEVI'S, KONTOOR, AMERICAN EAGLE, JCREW, VF, RALPH LAUREN, TARGET,** etc.

amfori BSCI Trade with purpose

amfori BEPI Trade with purpose

GOTS - Global Organic Testing Standard
GRS - Global Recycled Standard
OCS - Organic Content Standard
RCS - Recycled Claim Standard

EXPORTING WORLDWIDE

www.envoytextiles.com



নবীন বিজ্ঞানীরাই আমাদের ভবিষ্যৎ

এখন ডিজিটাল যুগ। এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগ। এককালে যা ছিল আমাদের কল্পনায়, আজ তার অনেক কিছু বাস্তব। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন ছবি আঁকতে পারে, কবিতা লিখতে পারে। চশমার কাচে বা স্বচ্ছ ফোনে বাস্তবতা ও কল্পনার জগৎ মিলেমিশে এক হয়ে যাচ্ছে (মিক্সড রিয়েলিটি প্রযুক্তি), মহাবিশ্বের দূর প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে নভোযান ও নভোদুরবিন—এসবই আজ বাস্তব।

এই প্রযুক্তি ও বদলে যাওয়া ডিজিটাল যুগে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের পৃথিবীটা কেমন হবে, তা কল্পনা করা একদিক থেকে কঠিন, অন্যদিকে বেশ রোমাঞ্চকর। সম্ভাব্য সেই ভবিষ্যতের পৃথিবীর কথা ভাবা, সেভাবে নিজেদের প্রস্তুত করা এবং কল্পনা ও চিন্তার উন্নতির জন্য আমরা মাঝেমধ্যে কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা প্রকাশ করি। এবারের গল্পগুলো সে রকম। এর কোনোটিতে উঠে এসেছে ভবিষ্যতের পৃথিবীর কথা, কোনোটিতে এসেছে সভ্যতার বদলে যাওয়ার কথা। তবে প্রতিটি গল্পের মূল সুর একটিই—মানবিকতা। বদলে যাওয়া এই পৃথিবীতে আমরা যা-ই করব, মানুষের উন্নতির জন্য করব, ভালোর জন্য করব। সে কথা মাথায় রেখেই এবারের সংখ্যায় থাকছে ছয়টি বিজ্ঞান কল্পগল্প ও একটি উপন্যাসিকা।

বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের অবশেষ মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ (সিএমবি)। এই বিকিরণ বা আলোর ফোটনের পেছনের বিজ্ঞান নিয়ে লিখেছেন জ্যোতির্বিদ দীপেন ভট্টাচার্য। কোয়ান্টাম তত্ত্ব আসলে কতটা হেঁয়ালি? বিশ্বের বড় বড় কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীকে নিয়ে বিশ্বখ্যাত *নেচার* জার্নাল পরিচালিত এক জরিপ নিয়ে লিখেছেন প্রদীপ দেব। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সহজ ব্যাখ্যা থাকছে রসায়নবিদ রউফুল আলমের কলমে। থাকছে ইন্টারনেটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বর্তমান পরিস্থিতি ও এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপায় নিয়ে একটি ফিচার। এ ছাড়া থাকছে কার্যকারণ, বিজ্ঞান রম্য, ছড়া, আইনস্টাইনের ধাঁধা, বুদ্ধির ব্যায়ামসহ নিয়মিত সব আয়োজন।

সম্প্রতি ঢাকা আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসবের মাধ্যমে শুরু হয়েছে এবারের বিজ্ঞান উৎসব ২০২৫। এরপর একে একে রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেটে আয়োজিত হবে এ উৎসবের আঞ্চলিক পর্ব। স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে উৎসাহী করে তোলা এবং নবীন বিজ্ঞানীদের মেধা যাচাইয়ের সুযোগ এই জাতীয় বিজ্ঞানায়োজন। ওরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। শিক্ষার্থীরা প্রজেক্ট বানিয়ে আনবে, ডিজিটাল যুগের উপযোগী স্মার্ট হয়ে উঠবে, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সবাইকে শুভেচ্ছা।

বিজ্ঞানচিন্তা

সেপ্টেম্বর ২০২৫
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩২
বর্ষ ৯ সংখ্যা ১২
পঞ্চাশ টাকা

সম্পাদক
আব্দুল কাইয়ুম

উপদেষ্টা পরিষদ
ড. রেজাউর রহমান
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. জেবা ইসলাম সেরাজ
ড. আরশাদ মোমেন
ড. মাহবুব মজুমদার
মুনির হাসান

নির্বাহী সম্পাদক
আবুল বাসার

সহসম্পাদক
উচ্ছ্বাস তৌসিফ
কাজী আকাশ

বিশেষ সহযোগী
রাজীব হাসান

সম্পাদনা দল
ইবরাহিম মুদ্দাসসের

ম্যাগাজিন সমন্বয়ক
শাহাদাত ফয়েজ ওয়াইসি

বিপণন ব্যবস্থাপনা
মো. মহিউদ্দিন রওনক

শিল্প নির্দেশনা
সৈয়দ লতিফ হোসাইন

ডিজাইন
আপন জোয়ার্দার

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
শামসুল হক

প্রচ্ছদ : **এআই আর্ট**

সর্বস্তরে বিজ্ঞান প্রসারে সহযোগিতায়

সিটি ব্যাংক™

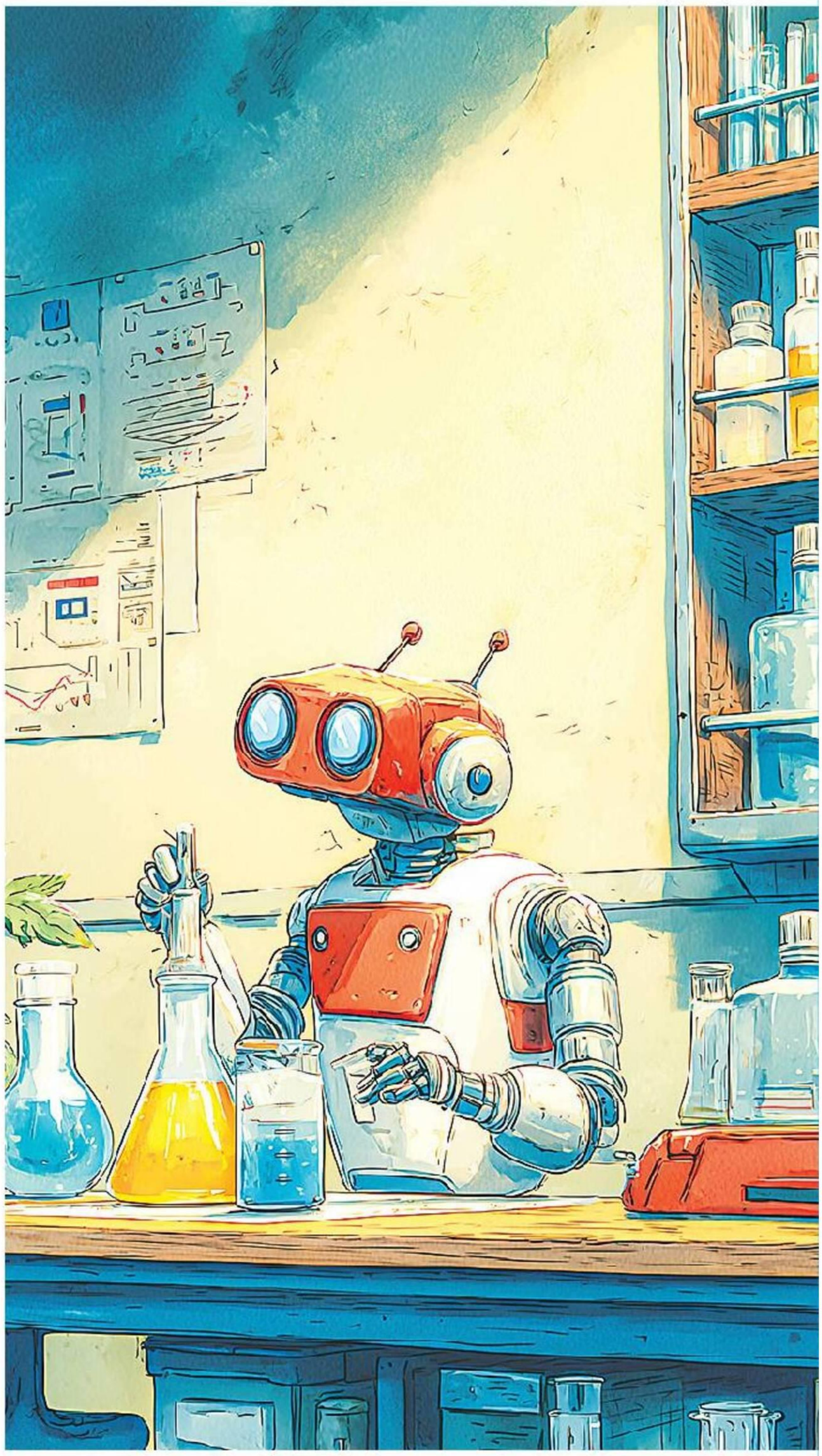
প্রকাশক আব্দুল কাইয়ুম কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ : বিজ্ঞানচিন্তা, প্রথম আলো ভবন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩। ফ্যাক্স : ৯১২১০৫২।
ওয়েবসাইট : bigganchinta.com
ই-মেইল : editor@bigganchinta.com
ফেসবুক : facebook.com/Bigganchinta

পরিবেশক : প্রথমা

১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

সূচিপত্র



বিজ্ঞান কল্পকাহিনি

কেমন হবে ভবিষ্যতে পৃথিবী? তথ্যপ্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেমন করে গড়ে উঠবে বদলে যাওয়া সভ্যতা? আমরা শুধু জানি, সব শেষে আমাদের মানুষের কথাই বলতে হবে। এমনই ৬টি কল্পগল্প এবং একটি উপন্যাসিকা নিয়ে সাজানো হয়েছে এ সংখ্যা। ভবিষ্যতের পৃথিবী, গ্রহান্তরের অভিযান থেকে শুরু করে বাস্তব ও কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে...

কল্পগল্প

ফিলোসফারস স্টোন
আহসান হাবীব ১৪

চশমা
তানজিনা হোসেন ১৭

বৃক্ষোভ
লুৎফুল কায়সার ২০

খেলা
ডিউক জন ২৪

সোনালি কুয়াশা
পিটার কারটুর
ভাষান্তর : মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ ২৬

ফেরা
ডব্লিউ হিলটন ইয়াং
ভাষান্তর : আবুল বাসার ২৮

উপন্যাসিকা

দ্য কসমিক পোচার
মূল : ফিলিপ কে ডিক
ভাষান্তর : হাসান খুরশীদ রুমী ২৯

বিজ্ঞান উৎসব
বিজ্ঞানে বিকাশ

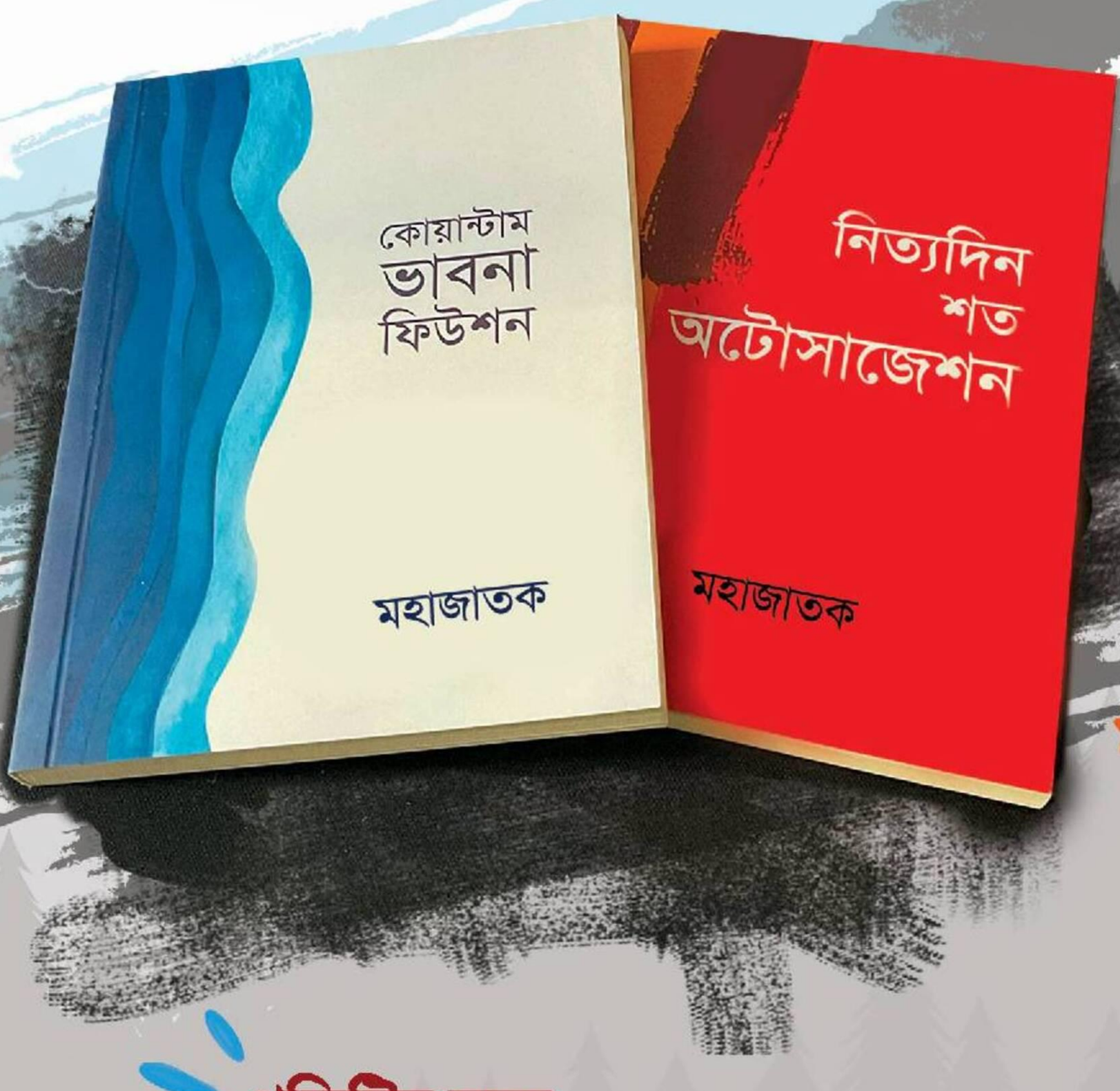
নবীনের কেতন উড়িয়ে যাত্রা শুরু বিজ্ঞান উৎসবের
আবদুল গাফফার ৫০

বিজ্ঞান রম্য

হীরাবিষয়ক বৈজ্ঞানিক আড্ডা!
আহসান হাবীব ১১

যিনি আস্ত একটা হীরার গ্রহ আবিষ্কার করেছেন তার কী নোবেলের সামান্য ১০ কোটি টাকার দরকার আছে?

সুখী সফল জীবনের শত সূত্র



প্রতিটির মূল্য
৫৫ টাকা মাত্র

অর্ডার করুন
০১৩২৯৭৪৬৬০৪

quantummethod.org.bd

ফিচার

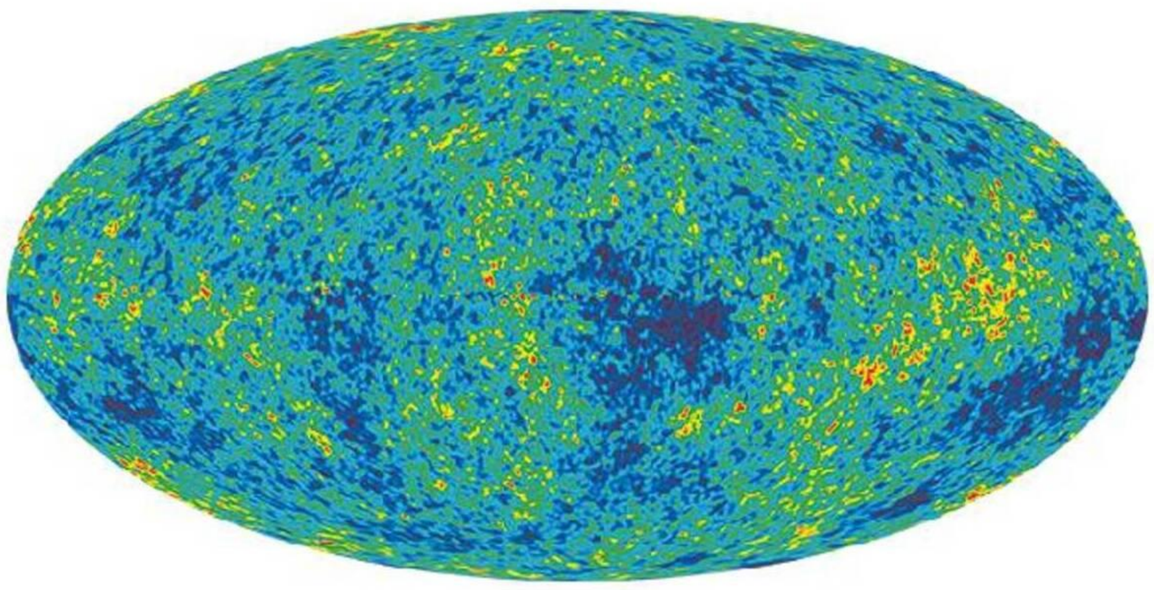
সিএমবি ফোটনের আসল উৎস কী
দীপেন ভট্টাচার্য **৫৪**

প্রহেলিকাময় কোয়ান্টাম তত্ত্ব
প্রদীপ দেব **৫৮**

রাসায়নিক বিক্রিয়া সহজ পাঠ : পর্ব ৫
রউফুল আলম **৬২**

এআইয়ের দখলে ইন্টারনেট বাঁচার লড়াই
উচ্ছ্বাস তৌসিফ **৬৪**

ওরে পাখি...
কাজী আলিম-উজ-জামান **৭০**



সাক্ষাৎকার



মশিউর রহমান
ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার,
ওমরন হেলথকেয়ার, সিঙ্গাপুর **৪৬**

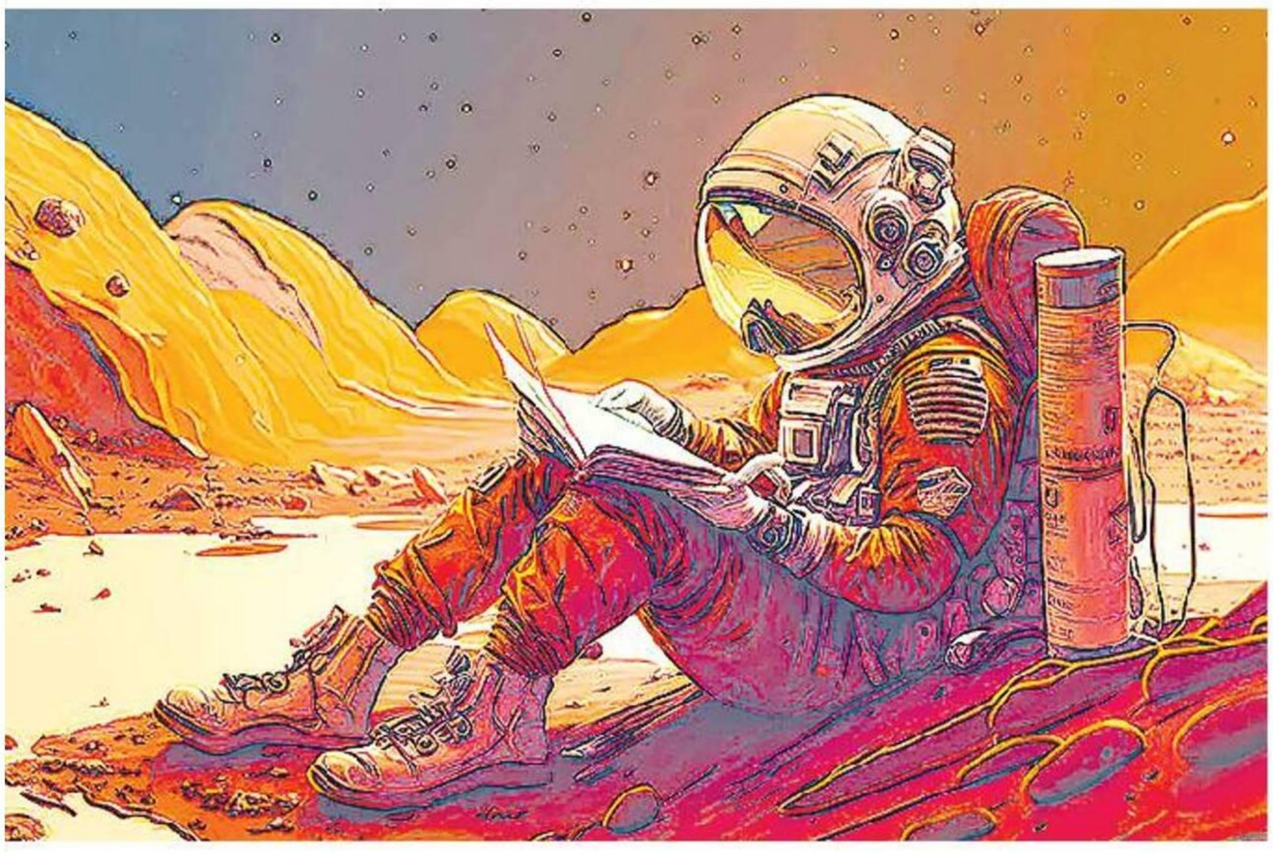


বিজ্ঞান কমিক

৩৭, ৩৯, ৪৩

রকমারি বিজ্ঞান

একজন নভোচারীর বেতন কত ৩৫
গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি কি সত্যিই দুর্বল ৭৩
ডলফিন আর শুশুকের তফাত কী ৭৪



বিজ্ঞান ছড়া

সুগন্ধ নাও ফুলের
শেখ সালাহ্উদ্দীন **১৩**



নিয়মিত বিভাগ

ডাকবাক্স ৮
ছবিঘর ১২
গণিতের সমস্যা ১৯
শব্দজট ২০
বিজ্ঞানায়োজন ১৬, ৬৩, ৭২, ৭৩
দুই চালে মাত ৩৫
বইপত্র ৩৬
বুদ্ধির ব্যায়াম ৪৫
আইনস্টাইনের ধাঁধা ৫৭
শব্দজট ৭৩
কার্যকারণ ৭৬
গোয়েন্দা ধাঁধা ৭৬
প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞান ৭৭
সুডোকু ৭৭
গণিতের কুইজ ৭৮
কুইজ ৭৯

HSC 2026
Premium Academic Course
MODULE 04

এইচএসসি'২৬ এর ফিনিশ লাইনে সবার আগে পৌঁছে যেতে চাও?

সায়েন্সের ৪ সাবজেক্টের বেসিক মজবুত করতে চাও?

বোর্ড এক্সাম আর অ্যাডমিশন, দুটোর জন্যেই প্রস্তুত থাকতে চাও?

তাহলে তোমার জন্যেই আমাদের
HSC'26 Module 4!

কোর্সে যা যা থাকবে

- লাইভ ক্লাস ১৮০
- MCQ এক্সাম ১৮০ + প্র্যাকটিস এক্সাম ১৮০ + CQ ৩০
- ২৪/৭ Q&A সার্ভিস
- অ্যানিমেশন, সিমুলেশন, বাস্তব উদাহরণ সহ ক্লাস।
- সেরা টিচার প্যানেল

তোমার অবস্থা যাই হোক পথ দেখাবে আমাদের রোডম্যাপ

এর আগের তিনটি মডিউল যদি করে থাকো, তাহলে তো জানোই আমাদের পড়ানোর আন্তরিকতা আর স্টাইল সম্পর্কে। কোনো সংশয় থাকলে আমাদের ফ্রি ক্লাসগুলি করে দেখতে পারো। প্রতি সাবজেক্টের ২টি করে ফ্রি ক্লাস পাবে।

✓ ওরিয়েন্টেশন
১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

✓ ক্লাস শুরু
১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

✓ ফ্রি ক্লাস
প্রতি বিষয়ে
প্রথম ২টি ক্লাস ফ্রি

এনরোল করতে
স্ক্যান করো

*১৫ দিনের
শিওর মানিব্যাক গ্যারান্টি

+8809638711711
www.utkorsho.tech

উৎকর্ষ

ডাকবাক্স

এমআরএনএ সংখ্যা আমাকে আলোড়িত করেছে

তোমার গত সংখ্যায় প্রকাশিত এমআরএনএ প্রযুক্তিবিষয়ক লেখা আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। দীর্ঘদিন ধরে ভ্যাকসিন প্রযুক্তি যেভাবে ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে সীমাবদ্ধ ছিল, সেই জায়গা থেকে এমআরএনএ প্রযুক্তির আগমন নিঃসন্দেহে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। লেখায় আমি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছি এর আণবিক স্তরে ব্যাখ্যা। কীভাবে মেসেঞ্জার আরএনএ কোষকে প্রোটিন তৈরির নির্দেশনা দেয় এবং এর মাধ্যমে শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন চেনাতে সাহায্য করে। সহজ ভাষায় উপস্থাপিত হওয়ায় বিষয়টি শুধু বোঝাই সহজ হয়নি, বরং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ভেতরের সৌন্দর্যও ধরা দিয়েছে। বিশেষভাবে ভালো লেগেছে, লেখাটি কেবল ভ্যাকসিনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং ভবিষ্যতে ক্যানসার থেরাপি বা জেনেটিক রোগ নিরাময়ের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করেছে। এতে বোঝা যায়, এমআরএনএ প্রযুক্তি আসলে জীববিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে যাচ্ছে। তাই বিজ্ঞানচিন্তাকে অনেক ধন্যবাদ প্রতিনিয়ত বিজ্ঞানের এ রকম নতুন নতুন মজাদার ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার জন্য। ভালো থেকো।

রেদুয়ান ইসলাম রুমান, অষ্টম শ্রেণি, পঞ্চগড় বিষ্ণু প্রসাদ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, পঞ্চগড়

বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত হোক সারা বিশ্ব

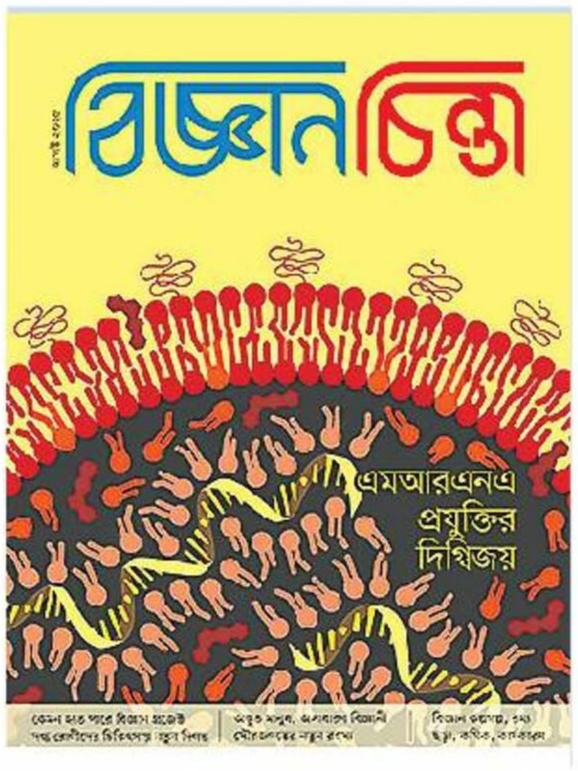
কেমন আছ? আশা করি, ভালো আছ। হাতে বিজ্ঞানচিন্তা নিয়ে আমিও অবশ্য ভালো আছি। আমার সেনা পাবলিক স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমার পাঠক বাড়াতে আমার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। আমি প্রতিদিন বিজ্ঞানচিন্তা ম্যাগাজিনটি স্কুলে নিয়ে গিয়ে পড়ি এবং সবাইকে তা দেখাই। অনেকেই আমাকে দেখে বিজ্ঞানচিন্তার পাঠক হয়েছে। সবশেষে বিজ্ঞানচিন্তা পড়তে আসলেই ভালো লাগে এবং এতে জানার অনেক কিছু আছে। আনন্দের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু জানা যায়। বিশেষ করে গত সংখ্যায় যে নিজের ডিএনএ নিজেই সংগ্রহ করার পদ্ধতি দিয়েছিলে, সেটি আমার খুব ভালো লেগেছে এবং আমি নিজে এটি চেষ্টা করেছি। আসলে এটি কাজ করেছে। এভাবেই সব সময় আমাদের পাশে থেকো। ধন্যবাদ বিজ্ঞানচিন্তাকে।

আবিদ আসনাফ, ষষ্ঠ শ্রেণি, সেনা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সাভার সেনানিবাস, ঢাকা

গুপ্তধন!

এত দিন 'গুপ্তধন' শব্দটা শুনলে মনে করতাম, হয়তো লুকানো কোনো সিন্দুক। চোখের সামনে ভেসে উঠত একটা পুরোনো সিন্দুকের ছবি। আর তার ভেতরে থাকতে পারে সোনার কয়েন কিংবা অলংকার, আর না হয় কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। কিন্তু আমার ধারণাটা ভেঙে গেল এ বছর ২২ জুলাইয়ে। আসলে আগে আমার তেমন কোনো শখ ছিল না। কিন্তু যখন থেকে নিয়মিত বিজ্ঞানচিন্তা পড়া শুরু করি (মে ২০২৪), তখন থেকে এর পুরোনো সংখ্যাগুলো পড়া আমার নতুন শখে পরিণত হয়। এত দিন পত্রিকার স্টল কিংবা পুরোনো বইয়ের দোকানে খুঁজতাম বিজ্ঞানচিন্তার পুরোনো সংখ্যাগুলো, কিন্তু কখনো পেতাম না। তাই ভাবতাম, আমার হয়তো বিজ্ঞানচিন্তার পুরোনো সংখ্যাগুলো আর পড়াই হবে না।

জুলাইয়ের ২১ তারিখ সাহস করে আমার নতুন স্কুলের লাইব্রেরিতে প্রথমবারের মতো ঢুকলাম। ভেতরে অনেক বই চোখে পড়ল। অনেক খুঁজলাম বিজ্ঞানচিন্তার সংখ্যাগুলো। কিন্তু পেলাম না। হতাশায় সেদিন সেখান থেকে বের হয়ে গেলাম। পরদিন টিফিন টাইমে আবার ঢুকলাম সেখানে। এবার একদম একটা কোনা-ইঞ্চিও বাদ দিলাম না। অবশেষে পেয়ে গেলাম আমার কাঙ্ক্ষিত গুপ্তধন! বিজ্ঞানচিন্তার পুরোনো সংখ্যা দেখে আমি তো আহ্লাদে আটখানা। এখন থেকে প্রতিদিন টিফিনে অপেক্ষা করি লাইব্রেরি থেকে বিজ্ঞানচিন্তা পড়ব বলে। যাহোক, আমাদের লাইব্রেরিতে অক্টোবর ২০১৮ সালের পর থেকে প্রায় সব সংখ্যাই আছে বিজ্ঞানচিন্তার। এখন তো শুধু মজা আর মজা!



বিজ্ঞানচিন্তার গতবারের সংখ্যাটাও বরাবরের মতো চমকপ্রদ ছিল। বিজ্ঞান উৎসব সম্পর্কে লেখাগুলো ভালো লেগেছে। সবচেয়ে ভালো লেগেছে 'এই গল্প এমআরএনএর'। পাশাপাশি 'সঙ্গীসাথি অণুজীব' লেখাটা পড়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম। তা ছাড়া দেহঘড়ি নিয়ে লেখাগুলো আমার খুব ভালো লাগে। 'দগ্ধ রোগীদের চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত', 'ইনসুলিন যখন খুনের অস্ত্র'—লেখাগুলো ভালো লেগেছে অনেক। বিজ্ঞানচিন্তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেহঘড়ি নিয়ে একটা সংখ্যা বের করলে মজা হবে। সামনের মাসের পরের মাসেই তো বিজ্ঞানচিন্তার জন্মদিন। অপেক্ষায় থাকলাম। বিজ্ঞানচিন্তার জন্য শুভকামনা। ভালো থেকো।

মো. নানজিব ফাহিম, অষ্টম শ্রেণি, বর্ণমালা আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা

অ্যানিমে নিয়ে সংখ্যা চাই

আশা করি তুমি ভালো আছ। আমিও ভালো আছি। তুমি জেনে খুশি হবে, আমি তোমার অনেক পুরোনো পাঠক। আজকে চিঠিটা আমি তোমাকে প্রথম লিখলাম, আশা করি ছাপাবে। যদি এই আবদার রাখো, তাহলে এর পর থেকে প্রতিবারই চিঠি লিখব। আমার বিদ্যালয়ে পরের মাসে অ্যানিমে নিয়ে একটা অনুষ্ঠান আছে, সেখানে আমি নাম দিয়েছি—অ্যানিমে নিয়ে অনেক কিছু লিখব ও ছবি দেব। এ জন্য তোমার কাছে চিঠি লিখলাম যেন তুমি আমার এই আবদার রেখে পুরো একটা সংখ্যা ছাপাও।

বি.সি. হালদার, ঠিকানাবিহীন

১১৮টি মৌলিক পদার্থ নিয়ে লেখা চাই

গত সংখ্যায় আমার চিঠি ছাপানোর জন্য বিজ্ঞানচিন্তাকে অনেক ধন্যবাদ। আগস্ট মাসের বিজ্ঞানচিন্তায় ডিএনএ সংগ্রহ করার পদ্ধতিটা অনেক সহজ ছিল। আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে। বিজ্ঞানচিন্তা নিয়মিতভাবে পড়ার আগেই বিজ্ঞানচিন্তার কাছে আমার আবদার বেড়েই যাচ্ছে। আমি চাই বিজ্ঞানচিন্তায় যেন সংকেত, প্রতীকসহ ১১৮টি মৌলিক পদার্থ নিয়ে লেখা হয়। অনেক শুভেচ্ছা রইল বিজ্ঞানচিন্তার জন্য।

সাদিয়া ইসরাত, অষ্টম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

তিনটি আবদার

যদিও আগে কখনো পড়া হয়নি। প্রথমবার শিখো জিপিএ ফাইভ সংবর্ধনায় বিজ্ঞানচিন্তা আগস্ট ২৫ সংখ্যাটি কিনে

পড়েছি, ভালো লাগল। অনেক কিছু জানতে পেরেছি। তিনটি আবদার রইল : এক. গণিত নিয়ে একটা সংখ্যা করো। দুই. দৈনিন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কাজে আমরা যে অজান্তে বিজ্ঞান ব্যবহার করি, তা নিয়ে একটা সংখ্যা চাই। তিন. চট্টগ্রামে যেসব সরকারি কলেজ আছে, তার প্রতিটি লাইব্রেরিতে বিজ্ঞানচিন্তা বিক্রির ব্যবস্থা করলে আমাদের জন্য ম্যাগাজিন কেনা সহজ হয়। ভেবে দেখো।

তাসনিমুল হুসাইন, ঠিকানাবিহীন

প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে সংখ্যা চাই

আমি ক্লাস ফাইভ থেকে বিজ্ঞানচিন্তা পড়ছি, তাই নিজেকে নিয়মিত পাঠক বলতেই পারি। নতুন সংখ্যা হাতে পেলেই আমি প্রথমে খুঁজি কী কী ইনফোগ্রাফ ও কল্পগল্প আছে। আমি এখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমাদের বিজ্ঞান বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে 'নিম্নশ্রেণির জীব'। অধ্যায়টি কয়েকবার পড়ার পর মনে হলো, এখানে যদি বিজ্ঞানচিন্তার মতো সুন্দর ছবি বা ইনফোগ্রাফ থাকত, তাহলে পড়তে আরও মজা লাগত। সেখানে বেশ কিছু প্রাণীর কথা ও তিনটি রাজ্যের কথা বলা আছে। আশা করি ভবিষ্যতে বিজ্ঞানচিন্তার কোনো সংখ্যায় এ বিষয়ে লেখা পাব।

রাফি রহমান, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

বিজ্ঞানীদের জীবনকাহিনি নিয়ে একটি সংখ্যা চাই

প্রিয় বিজ্ঞানচিন্তা, আশা করি ভালো আছ। তোমাকে কখনো চিঠি লিখিনি। এটাই আমার প্রথম চিঠি। আমার চিঠির সঙ্গে একটা আবদারও আছে। সেটা হলো, ১০০ জন বা অনেকজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে একটি সংখ্যা চাই। তাঁদের জীবনকাহিনি সম্পর্কে জানতে আমি আগ্রহ প্রকাশ করছি। সবাই জানে, আইনস্টাইন, নিউটন এবং আরও বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার সম্পর্কে। কিন্তু খুব কম মানুষই তাঁদের জীবনকাহিনি জানে। এ জন্য আমি বিজ্ঞানচিন্তায় বিজ্ঞানীদের জীবনকাহিনি ও আবিষ্কার নিয়ে একটি সংখ্যা দেখতে চাই।

আকাশ, সপ্তম শ্রেণি, মনির আহমদ একাডেমি, সিলেট

বিজ্ঞান আর ভয় লাগে না আমার

আপনাদের হাত ধরে বিজ্ঞানকে নতুন করে চিনতে শিখেছি। আগে আমার কাছে বিজ্ঞান ছিল এক জটিল ধাঁধার মতো, যার রহস্য বোঝা অসম্ভব মনে হতো। কিন্তু আপনাদের সহজবোধ্য লেখাগুলো আমার সেই সব ভয় পুরোপুরি দূর করে দিয়েছে। আপনাদের বিভিন্ন সংখ্যায় দেওয়া প্রশ্নের উত্তরগুলো এমন ছিল, যেন প্রতিটি প্রশ্ন আমিই জানতে চেয়েছিলাম। বিশেষ করে ১০০টা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সাজানো আপনাদের ১০০তম সংখ্যাটি আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে। আপনাদের পুরো টিমের সঙ্গে আমার দেখা করার খুব ইচ্ছা। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি, কবে সেই সুযোগ হয়। আশা করি, এভাবেই আপনারা সব সময় আমাদের পাশে থাকবেন।

রিফাত আমিন, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

আমাদের লিখুন

বিজ্ঞানচিন্তা

১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫
ওয়েবসাইট : www.bigganchinta.com
ই-মেইল : editor@bigganchinta.com
ফেসবুক : fb/Bigganchinta

বিজ্ঞানের সবকিছু এক ক্লিকে!

bigganchinta.com

এআইয়ের কারিকুরি?
নোবেলজয়ী গবেষণা? নতুন সব আবিস্কার, উদ্ভাবন, বিভিন্ন আপডেট
পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন প্রযুক্তি, কল্পগল্প, কমিকস—সবকিছু একসঙ্গে
প্রতিদিন, শুধু বিজ্ঞানচিন্তায়



facebook.com/bigganchinta
facebook.com/groups/bigganchinta

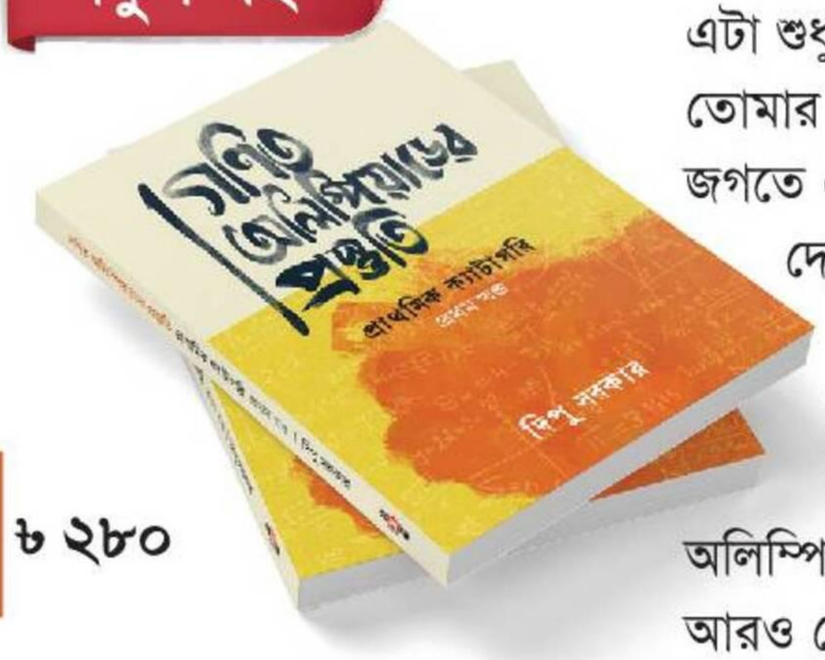
বিজ্ঞানচিন্তা
বিজ্ঞান আছে, চিন্তা কী

গণিত অলিম্পিয়াডের প্রস্তুতি

প্রাথমিক ক্যাটাগরি প্রথম খণ্ড

দিপু সরকার

নতুন বই



৳ ২৮০

এটা শুধু গণিত শেখার বই নয়, বরং তোমার যুক্তি, বিশ্লেষণ ও সৃজনশীলতার জগতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনের পথ দেখাবে। গণিত শুধু পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার জন্য নয়, বরং বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলোকে সমাধান করার বড় হাতিয়ার। আর গণিত অলিম্পিয়াড তোমাকে এ দক্ষতাগুলো আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং উপায় ব্যবহার করতে শেখায়।

বিজ্ঞান ও গণিতের আরও বই

কার্লো রোভেল্লি
ভাষান্তর : আবুল বাসার
হোয়াইট হোলস ৳ ৩২০

ওয়াল্টার লুইন
ভাষান্তর : আবুল বাসার
ফর দ্য লাভ অব ফিজিকস
২য় মুদ্রণ। ৳ ৬০০

আবুল বাসার
মহাজাগতিক প্রথম আলো
৩য় মুদ্রণ। ৳ ৫২৫
আবিষ্কারের কাহিনি ৳ ৪০০

ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী
এক্সোপ্ল্যানেট
বহিঃসৌরগ্রহের খোঁজে
৳ ৪২০

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ
জিরো
দ্য বায়োগ্রাফি অব আ ডেঞ্জারাস আইডিয়া ৳ ৪২৫



আব্দুল কাইয়ুম
আরও গণিত আরও স্মার্ট
৩য় মুদ্রণ। ৳ ৩৪০
গণিত আর গণিত
৩য় মুদ্রণ। ৳ ৩২০
গণিতের জাদু
১৩তম মুদ্রণ। ৳ ৩২০
গণিতের ধাঁধা
৫ম মুদ্রণ। ৳ ৩০০

নাফিস তিহাম
গণিত অলিম্পিয়াড
১০১ সমস্যা ও সমাধান
৮ম মুদ্রণ। ৳ ২৮০

নাফিস তিহাম, সংকলন ও পরিমার্জন
বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের যত প্রশ্ন
২য় মুদ্রণ। ৳ ৬০০

কাজী আকাশ
গণিতের খেলা গণিতের মজা
২য় মুদ্রণ। ৳ ২৫০
ঝটপট গণিত ২য় মুদ্রণ। ৳ ৩০০



প্রথমা প্রকাশন

ঢাকা : ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা। ০১৯৫৫৫৫২১৭৭ ● ৪৩-৪৪ আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। ০১৯৫৫৫৫২১৭৬ ● শেফ'স টেবিল, ইউনাইটেড সিটি, ঢাকা। ০১৭৩০০০০৬০০ ● মান্নান মার্কেট, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭৩০০০০৬৪৮ ● **সিলেট :** ইউনিমার্ট বিল্ডিং, আম্বরখানা, সিলেট। ০১৭০৮৪৩৫৫৭৯

ঘরে বসে বই পেতে ভিজিট করুন www.prothoma.com ০১৭৩০০০০৬১৯



হীরাবিষয়ক বৈজ্ঞানিক আড্ডা!

আহসান হাবীব

—হীরা প্রথম আবিষ্কার করল কে?

—হীরা কেউ আবিষ্কার করেনি। খনিতে পাওয়া গেছে।

—আরে জ্বালা! ল্যাবরেটরিতে কার্বন থেকে যে প্রথম হীরা তৈরি করল, সে কে?

—আমি।

—অ্যাঁ? সত্যিই আপনি? সবাই সেই 'আমি'র দিকে তাকাল।

—তা আপনি কতটুকু হীরা আবিষ্কার করলেন?

—খুব বেশি নয়, ছোট্ট এক টুকরা কয়লা নিয়ে ২৫০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট আর ৮,২৫,০০০ পাউন্ড পার স্কয়ার ইঞ্চি প্রেশারে ল্যাবরেটরিতে তৈরি করলাম প্রথম হীরা! সে-ও বহু বছর আগের কথা।

—বলেন কী, দারুণ ব্যাপার! তারপর সেই হীরাটা কী করলেন?

—একটা আংটিতে বসিয়ে স্ত্রীকে গিফট করলাম।

—পৃথিবীর প্রথম হীরার আংটি!

—ওয়াও! দারুণ রোমান্টিক ব্যাপার। আবিষ্কারকের আশপাশে বসা সবাই হইহই করে উঠলেন।

—এ রকম দামি হীরার আংটি পেয়ে আপনার স্ত্রী কী করলেন?

এবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হীরা আবিষ্কারক; মৃদু স্বরে বললেন, 'ও এক মাস কথা বলা বন্ধ করে দিল।'

—সে কী, কেন? সবাই আবার হইহইয়ের সঙ্গে রইরই করে উঠল!

যিনি আস্ত একটি হীরার গ্রহ আবিষ্কার করেছেন, তাঁর কি নোবেলের সামান্য ১০ কোটি টাকার দরকার আছে?

—সে রকমই চুক্তি ছিল ওর সঙ্গে আমার। মিনমিন করে বললেন হীরা আবিষ্কারক।

এটা স্রেফ একটা গল্পই। এই গল্প বিশ্বাস করার দরকার নেই; বরং হীরা নিয়ে আরেকটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প শোনা যেতে পারে। ইনি একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। গ্রহ-নক্ষত্র আবিষ্কার করে বেড়ান। একদিন তিনি একটি হীরার আস্ত গ্রহ আবিষ্কার করে বসলেন।

—বলেন কী, আস্ত গ্রহটাই একটি হীরা?

—ঠিক তা-ই, প্রচণ্ড মহাজাগতিক চাপ ও তাপে...।

—দারুণ আবিষ্কার!

—এই জ্যোতির্বিদকে শিগগিরই নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত।

—নোবেল কমিটি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু উনি রিফিউজ করেন।

—সে কী! কেন?

—আর কেন, যিনি আস্ত একটি হীরার গ্রহ আবিষ্কার করেছেন, তাঁর কি নোবেলের সামান্য ১০ কোটি টাকার দরকার আছে? পাশ থেকে আরেকজন মন্তব্য করেন।

—ঠিক কথা, ওই গ্রহের হীরা বেচেই তো...আচ্ছা, গ্রহটা কোথায়?

—প্রায় ১৫ কোটি আলোকবর্ষ দূরে।

হঠাৎ আড্ডার সব আলোচক চুপ হয়ে গেলেন... একসঙ্গে।

লেখক : রম্য লেখক ও কার্টুনিস্ট; সম্পাদক, *উন্মাদ*

অদৃশ্য সি-হর্স

ফিলিপাইনের গভীর সাগরে প্রায় অদৃশ্য এক প্রাণী বাস করে। এর নাম পিগমি সি-হর্স। আকারে মাত্র দুই সেন্টিমিটার লম্বা। প্রাণীটি এর চারপাশের গোলাপি প্রবাল ও স্পঞ্জের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গিয়ে শিকারিদের চোখ ফাঁকি দেয়। এরা নলাকার মুখ ব্যবহার করে ক্ষুদ্র সামুদ্রিক পোকা খায়।

সূত্র : *হাউ ইট ওয়ার্কস*

ছড়া

সুগন্ধ নাও ফুলের

শেখ সালাহ্‌উদ্দীন

বিড়ি সিগ্রেট চুরুট পাইপ হুক্কা যারা টানে
এসব থেকে বেজায় ফুর্তি আসে যাদের প্রাণে
কিংবা যাদের মনের মাঝে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে
ভবিষ্যতে ধূম্রপানের গোপন কোনো ইচ্ছে
তাদের জন্য আজকে আমি রাখছি লিখে ছড়া
তাদের উচিত ভালো করে এই লেখাটা পড়া।

বলছি এবার কী কী ঘটে ধোঁয়া টানা হলে
মুখের থেকে লাংয়ে ধোঁয়া একছুটে যায় চলে।
লাংয়ে থাকা রক্তের সাথে ধোঁয়ার বিনিময়
অ্যালভিওলার মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়।
সহস্রাধিক রাসায়নিক মেশে রক্তের সাথে
অনেক রকম ক্ষতিকারক দ্রব্য থাকে তাতে;

যেমন ধরো অ্যামোনিয়া কার্বন মনোক্সাইড
সত্তর ধরন কার্সিনোজেন টার ফরমালডিহাইড
বেরিলিয়াম হাইড্রালাজিন নিকোটিন ক্যাডমিয়াম
বিউটেন বেনজিন অ্যাসিটোন লেড অ্যাক্রোলিন ক্রোমিয়াম।
এদের কিছু কঠিন, কিছু গ্যাসীয় বা তরল
মানবদেহের পক্ষে এসব আসলেই গরল।

রক্তে মিশে এসব গরল থাকে না তো বসে
মুহূর্তেই যায় ছড়িয়ে দেহের কোষে কোষে।
তখন থেকেই দেহের কোষে এদের বসবাস
সেখানেই শুরু করে হরেক রোগের চাষ।
কাশি অ্যাজমা সিওপিডি ক্যানসার আলসার স্ট্রোক
ডায়াবেটিস নিউমোনিয়া; কে চায় এসব হোক!
ধূমপান দিচ্ছে এমনতরো অসুখ হাজারোটা
তলেতলে সাধের দেহের বাজাচ্ছে বারোটা।

তুমি শিকার হয়েছ কি এই বেকুবি, ভুলের?
শপথ করে ‘না’ বলো আর সুগন্ধ নাও ফুলের।

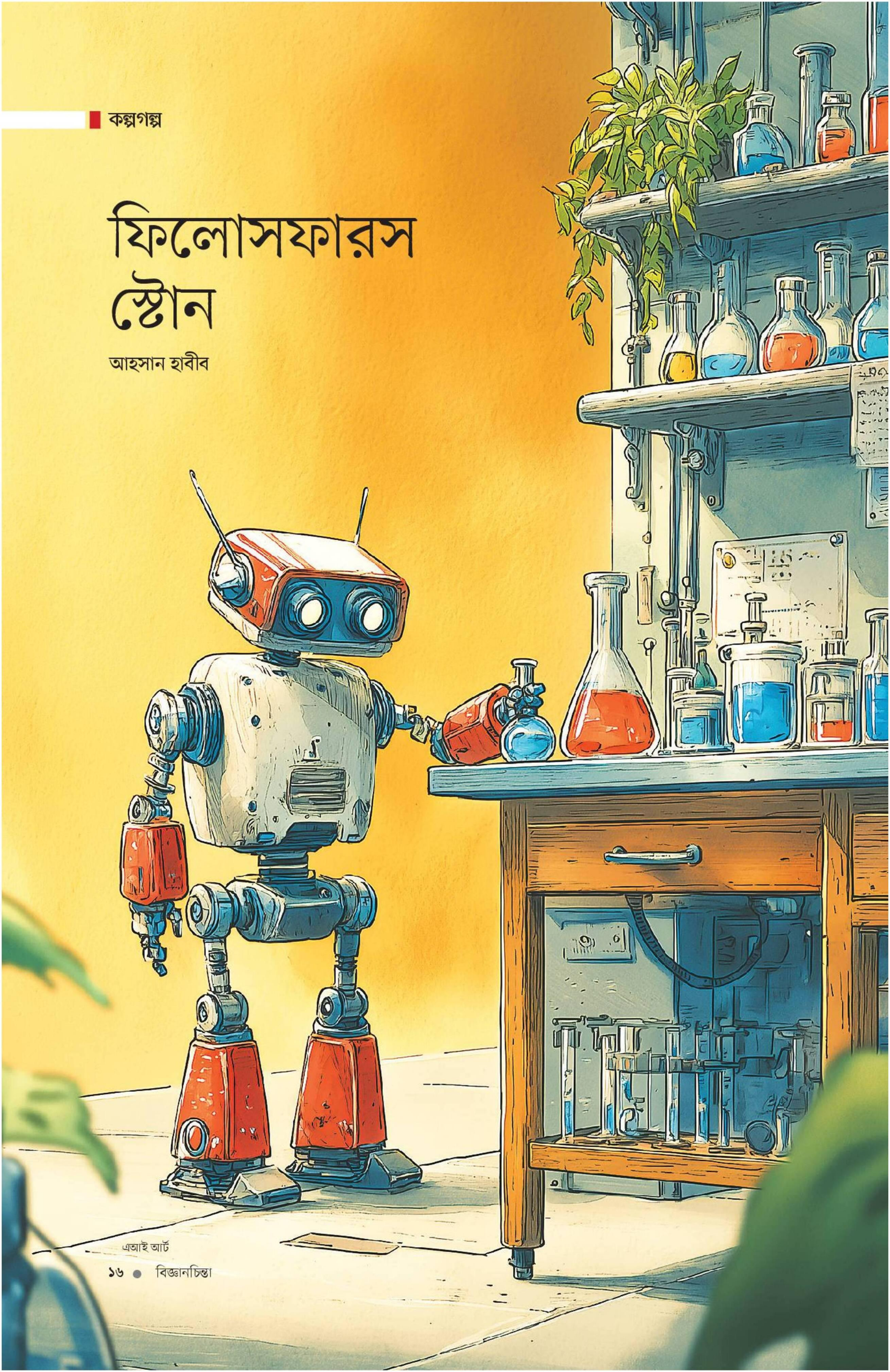
অলংকরণ : রাকিব



কল্পগল্প

ফিলোসফারস স্টোন

আহসান হাবীব



এআই আর্ট

অবশেষে আলমাস খান একটা পুরোনো রোবট কিনেই ফেললেন। সেই প্রথম দিককার শ্রমিক রোবট। এই রোবট ৮ থেকে ১০ বছর আগেই বাতিল হয়ে গেছে। পুরোনো রোবট কোথায় পাওয়া যাবে, সে খবর দিয়েছিল তাঁর কলিগ শামসু মিয়া। তবে রোবট কেনার অভিজ্ঞতাটা মন্দ ছিল না।

জায়গাটি শহরের শেষ প্রান্তে, এখানে বেশির ভাগই ভাঙারির দোকানপাট। ৪৮ নম্বর দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দোকানের বুড়ো মালিক চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে বেরিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—

- কী লাগবে?

- রোবট।

বুড়ো ভ্রু কুঁচকে এমন ভাব করল, যেন রোবট শব্দটা সে এই প্রথম শুনল। তারপর ধীরেসুস্থে চুরুটে একটা লম্বা টান দিল, ভুস ভুস করে প্রাচীনকালের কয়লার ইঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে গেল দোকানের পেছনে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, তবে দোকানটা বড়ই। অনেকক্ষণ পর একটা বেশ বড়সড় জিনিস টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এল দোকানের বাইরে। জিনিসটা আর কিছু নয়, একটা রোবট, লোহালক্কড়ে তৈরি জিনিসটা মাটিতে পড়ে রইল লম্বা হয়ে। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বহু আগের বাতিল মাল। জায়গায় জায়গায় জং ধরে গেছে।

সিরিশ কাগজ দিয়ে ঘষলে জংয়ের জায়গাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর ইয়ে... ব্যাটারি লাগাতে হবে। বুড়ো চুরুটে টান দিয়ে লম্বা করে আবার ধোঁয়া ছাড়ে। বুড়োর চুরুট টানার ভঙ্গিটা বেশ।

- ব্যাটারি আপনার কাছে আছে না?

- আছে।

- লাগিয়ে দিন। ব্যাটারি লাগালে কি ও উঠে দাঁড়াবে?

- হ্যাঁ।

- বেশ, লাগান।

- ব্যাটারির খরচা কিন্তু আলাদা।

- বেশ, দেব। সিরিশ দিয়ে ঘষে দেবেন একটু?

- না, ওটা সে নিজেই করে নিতে পারবে।

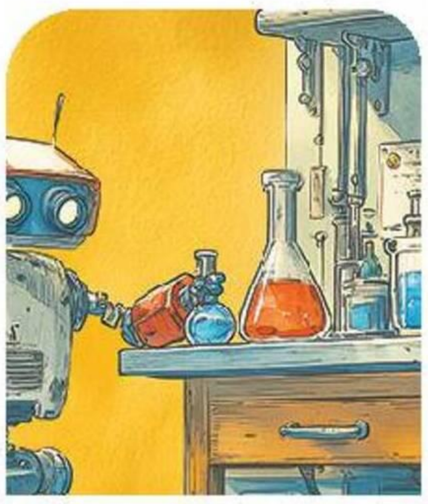
পেটের কাছে গোল ব্যাটারিটা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে চিত হয়ে পড়ে থাকা রোবটের সবুজ ঘষা কাচের মতো চোখ দুটি জ্বলে উঠল। খুব দ্রুতই সে উঠে বসল এবং একটু পর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। ভাঙা যান্ত্রিক গলায় বলল, 'ধন্যবাদ'। ঠিক কাকে ধন্যবাদ দিল, তা অবশ্য বোঝা গেল না।

টাকাপয়সার লেনদেন শেষ করে বিদায় নেওয়ার সময় রোবটটা বুড়োর দিকে ঘুরে সেই খসখসে ভাঙা যান্ত্রিক গলায় বলল—

- মালিক, আমার ব্যাগটা কি নিতে পারি?

- পারো, ওতে আছেটা কী?

- আমার কিছু ব্যক্তিগত জিনিস।



তারপর একসময় মানুষ যখন সিসা থেকে সোনা বানানো শুরু করল, তখন আমরা বেকার হয়ে গেলাম। আমাদের ব্যাটারি খুলে ভাঙারি মার্কেটে লট ধরে বিক্রি করে দিল। তবে কিছুদিন মালিকের ল্যাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল...তখন কিছু জিনিস শিখেছি।

- ওহ্, রোবটের আবার ব্যক্তিগত জিনিস। বুড়ো দোকানি নাকে কেমন একটা শব্দ করে।

বাসায় ফিরে রোবটকে তার ঘর দেখিয়ে দেন আলমাস খান। এই ঘর তাঁর ছেলের ছিল। স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর সব ঘরই শূন্য পড়ে আছে।

- তুমি এ ঘরটায় থাকবে।

- ধন্যবাদ মালিক।

- আমাকে মালিক বলার দরকার নেই। আমার নাম ধরেই ডাকতে পারো। আমার নাম আলমাস খান।

- আমি সুমো।

- সুমো, তুমি আগে কী করতে?

- একটা সোনার খনিতে কাজ করতাম।

- বলো কী? ওই খনিতে সোনা পেতে?

- পেতাম।

- তারপর?

- তারপর একসময় মানুষ যখন সিসা থেকে সোনা বানানো শুরু করল, তখন আমরা বেকার হয়ে গেলাম। আমাদের ব্যাটারি খুলে ভাঙারি মার্কেটে লট ধরে বিক্রি করে দিল। তবে কিছুদিন মালিকের ল্যাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল...তখন কিছু জিনিস শিখেছি।

- সিসা থেকে সোনা?

- হ্যাঁ, সিসার ইলেকট্রন ৮২টা আর সোনার ৭৯টা। ব্যস...বোমবার্ড করে সিসার তিনটা ইলেকট্রন সরালেই তো সোনা।

- তুমি এত কিছু জানো কীভাবে?

- সোনার খনি থেকে যখন ছাঁটাই হলাম, কেন হলাম; সেটা আমাদের জানতে হবে না? আর ওই যে বললাম, মালিকের ল্যাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল...

- হুম।

- মালিক, আপনার কি সোনার প্রতি আগ্রহ আছে?

- মানে, কী বলতে চাইছ?

- আপনি চাইলে...।

আলমাস খান ব্যঙ্গ করে বললেন, 'আমি চাইলে তুমি আমাকে সিসা থেকে সোনা বানিয়ে দেবে, তাই?'

- সিসা বা পারদ থেকে আপনাকে সোনা বানিয়ে দিতে না পারি, অন্য বুদ্ধি আছে।

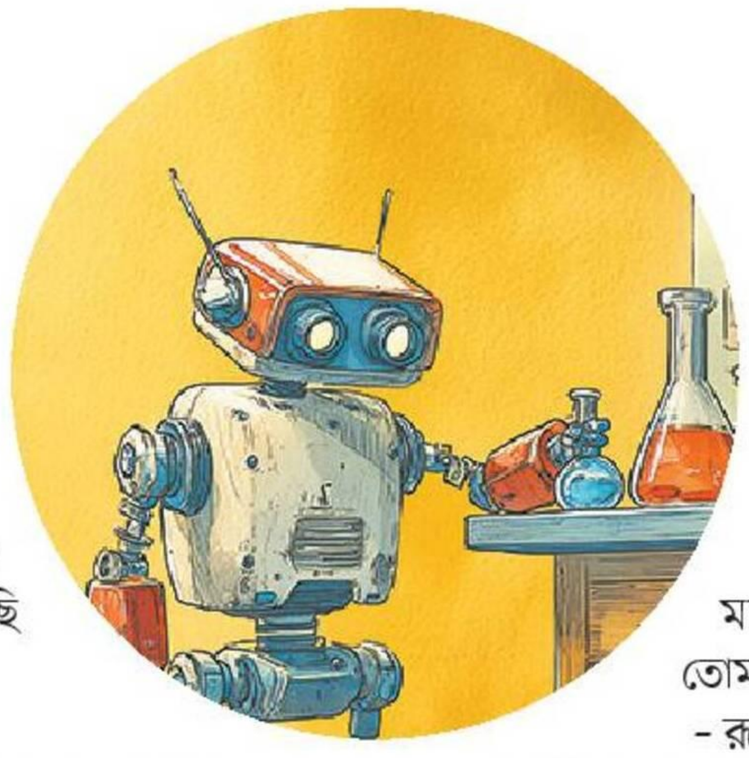
- এর মধ্যে আবার পারদ ঢুকল কেন?

- পারদের ইলেকট্রনের সংখ্যা সোনার আরও কাছাকাছি...৮০ আর সোনা ৭৯। মাত্র একটা ইলেকট্রন সরালেই...তা ছাড়া অন্য কোনো রেডিও অ্যাকটিভ এলিমেন্ট দিয়ে রিঅ্যাকশন করিয়ে দিয়েও...সোনা তৈরি সম্ভব। সেটা আমার মালিক জানতেন। তিনি একজন নামকরা কেমিস্ট ছিলেন।

- তা, তোমার অন্য বুদ্ধিটা কী?

- ফিলোসফারস স্টোন। আমার কাছে একটা ফিলোসফারস স্টোন আছে।

- ফিলোসফারস স্টোন! মানে, পরশপাথর? সেটাও বানিয়ে ফেলেছ? আচ্ছা, তুমি কি ভুলে



যাও, তুমি একটা শ্রমিক রোবট, তোমার বুদ্ধিবৃত্তি খুব নিচু স্তরের?

- নিজের সম্পর্কে আমার ধারণা আছে মালিক। তবে যখন আগের মালিকের ল্যাবে ছিলাম, তখন নিজেদের অল্পবিস্তর আপগ্রেড করেছি আমরা!

- আমরা মানে?

- আমরা সাতজন ওই খনিতে কাজ করতাম। ওনার ল্যাবে আমাদের মধ্য থেকে তিনজনকে নেওয়া হয়েছিল হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে। অন্যদের অকেজো করে বিক্রি করে দেন। পরে অবশ্য আমাদেরও বিক্রি করে দেন।

- তোমার মালিক ওখানে, মানে ওই ল্যাবে সোনা বানাত?

- জি, তিনি সোনার খনি বিক্রি করে দিয়ে একুশ শতাব্দীর সার্নের মতো একটা ল্যাব তৈরি করলেন।

- সেই ল্যাবে সোনা তৈরি হতে লাগল?

- সেই ল্যাবে শক্তিশালী এক্সিলেটরে সিসাকে অন্য কোনো নিউক্লিয়াস দিয়ে বোমবার্ড করলে সিসার নিউক্লিয়াসে পরিবর্তন হয়ে অনেক ধরনের নিউক্লিয়াস হতেই পারে...এ ধারণা থেকেই তিনি সিসা থেকে সোনা তৈরি করলেন। আগেই বলেছি, সোনা আর সিসার পারমাণবিক নম্বর যথেষ্ট কাছাকাছি; সিসা ৮২, সোনা ৭৯...পারদ তো আরও কাছে।

- উফ! তোমার জ্ঞানের ঠেলায় আমার মাথা ধরে যাচ্ছে হে...ভালো ভালো...যাও, এখন রাতের খাবারটা একটু তৈরি করে ফেলো...আমি একটু ঘুমাব। ভালো কথা, তোমাকে জানিয়ে রাখি, সোনার প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই। যদিও এর ভরি নাকি এখন ক্রিপ্টোকারেন্সিতেও ধরাছোঁয়ার বাইরে।

কয়েক দিন পর হঠাৎ আলমাস খান আবিষ্কার করলেন, তাঁর রোবট সুমো সময় পেলেই নিচের বেজমেন্টে চলে যায়। নিচের বেজমেন্টটা আসলে আস্ত একটা ভাঙাচোরা জিনিসপত্রের ভাগাড় হয়ে আছে বললে কম বলা হয়। ওখানে সুমো কী করে? একদিন বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন—

- তুমি বেজমেন্টে কী করো?

- আমার ফিলোসফারস স্টোনটাকে অ্যাকটিভেট করার চেষ্টা করছি মালিক, ওখানে একটু কাজ বাকি আছে...।

- উফ! আলমাস মাথা চেপে ধরার মতো একটা ভঙ্গি করেন। 'আচ্ছা, তুমি তোমার রূপকথা বন্ধ করবে?'

- রূপকথা নয় মালিক, সেই মানব ইতিহাসের আদি যুগে আলকেমিস্টরা ওই ফিলোসফারস স্টোন তৈরির চেষ্টা করেছিল...সেখান থেকেই কিন্তু কেমিস্ট্রির শুরু... মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনও কিন্তু ফিলোসফারস স্টোন নিয়ে কাজ করেছেন!

- ওরে বাবা, তুমি দেখছি আঠারো শতকের বিজ্ঞানী নিউটনকেও চেনো...শোনো হে বোকারাম, এটা ত্রিশ শতাব্দী চলছে...মাইন্ড ইট...এই শতাব্দীতে সব ধরনের রূপকথা বাতিল। এ নিয়ে আমার সঙ্গে আর দ্বিতীয় কোনো কথা বলতে এসো না...ভাগো...

- রোবট সুমো তার যান্ত্রিক রংচটা চেহারায় বা শরীরে একটা হতাশার ভঙ্গি করে পিছিয়ে গেল। এখন মালিকের ঘুমানোর সময়; তারও কাজ নেই। সে বেজমেন্টের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগোয়। আলমাস খান পেছন থেকে চেঁচান...'পারলে বেজমেন্টটা একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করো, সেটা বরং একটা কাজের কাজ হবে...'

তার এক সপ্তাহ পরের ঘটনা। রাত কত হবে—দুইটা, আড়াইটা বা তিনটা। কোনো একটা বিদঘুটে শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আলমাস খানের। তাকিয়ে দেখেন, তাঁর সামনে রোবট সুমো দাঁড়িয়ে! কিন্তু এ কোন সুমো। তার রংচটা লোহার শরীরটা সোনালি আভায় ঝকঝক করছে!

- মালিক ফিলোসফারস স্টোনটা অ্যাকটিভেট হয়েছে। ভুল করে গ্লাভস ছাড়া কাজ করছিলাম...আমার পুরো শরীর...

আলমাস খান হতভম্ব হয়ে দেখেন, হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই তাঁর সামনে রোবট সুমোই দাঁড়িয়ে আছে, তবে সম্পূর্ণ সোনার তৈরি শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে!

বিশ্বমঞ্চে স্বর্ণপদক পেল বাংলাদেশের টিম অটোমর্ফ



ইন্দোনেশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনভেনশন এক্সপো (IIIEX) ২০২৫-এ স্বর্ণপদক জয় করেছে বাংলাদেশি তরুণ উদ্ভাবক দল অটোমর্ফ। গত ৮-১১ আগস্ট ইন্দোনেশিয়ায় আয়োজিত হয় বৈশ্বিক উদ্ভাবনের এই মহাযজ্ঞ। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ২৭০টির বেশি দল অংশ নেয়। রোবট 'রক্ষ-বট' তৈরি করে এতে স্বর্ণপদক জয় করেছেন বাংলাদেশের টিম অটোমর্ফের তরুণ শিক্ষার্থীরা। শুধু তা-ই নয়, বিশেষ স্বীকৃতি হিসেবে তাঁরা মালয়েশিয়া ইনোভেশন ইনভেনশন ক্রিয়েটিভিটি অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ পুরস্কারও পেয়েছেন।

টিম অটোমর্ফের তৈরি রোবটটি এ প্রতিযোগিতায় বাস্তবসম্মত ও মানবকল্যাণে নিবেদিত প্রকল্প হিসেবে সবার নজর কাড়ে। এই রোবটের নাম রাখা হয়েছে বাংলা 'রক্ষা' শব্দের অনুকরণে। নাম শুনেই বোঝা যায়, এটি তৈরি করা হয়েছে সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য। রোবটটি বিপজ্জনক পরিবেশে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারে, ঝুঁকি শনাক্ত করতে পারে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নিতে পারে সিদ্ধান্ত। এর মধ্যকার রোবোটিক আর্ম বা বাহু বিপজ্জনক বস্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পাশাপাশি ভেতরে থাকা ড্রোন সিস্টেম মুহূর্তেই আকাশে উঠে পর্যবেক্ষণ করতে পারে চারপাশের পরিস্থিতি। এ ছাড়া এই রোবটে রয়েছে নাইট ভিশন, সৌরশক্তি ও মাল্টিচ্যানেল যোগাযোগব্যবস্থা।

চশমা

তানজিনা হোসেন

দরজা দিয়ে বেরিয়ে অন্ত চশমাটা পরে নিল। বাইরে আজ ঝকঝকে আকাশ। গাঢ় নীল আকাশে রবীন্দ্রনাথের দাড়ির মতো পেঁজা পেঁজা সাদা মেঘ। ওর ঘরের সামনে টানা পিচের রাস্তার দুই দিকে ফুটেছে নানা রঙের ফুল। জারুল, কৃষ্ণচূড়া ও রাধাচূড়া। এখন বসন্তকাল বুঝি? অন্তর মনটা ফুরফুরে হয়ে গেল। তার চশমার জিপিএস বলল, আজ একবার নদীর ধারে যাবে নাকি?

নদী? উফ্, কত দিন নদী দেখিনি? কোথায় নদী?

চলো, নিয়ে যাচ্ছি। এই ফুলে ছাওয়া পথ ধরে ১০০ গজ সামনে এগোলে ডান দিকে একটা ছোট নুড়ির পথ দেখবে। সেই পথে পা দিয়ে আরও মিনিট ত্রিশেক হাঁটলে পরে সামনে নদী।

নদীটার নাম কী?

সোনালু।

সোনালু? সে তো একটা ফুলের নাম।

হুম, ফুলের নামেই নাম। সন্ধ্যাবেলা সোনালি রং ধরে সূর্য ডোবার সময়, তাই এই নাম দিলাম। চলো চলো, সন্ধ্যার আর দেরি নেই।

অন্ত জিপিএসের নির্দেশিত পথে যেতে যেতে নুড়ির পথটা পেয়ে গেল। জুতার নিচে মচমচ করছে নুড়িগুলো। চারদিকে ঘন বন।

এতাহার তাত

পাখিরা ডাকছে। আর নাম না-জানা অনেক পোকামাকড়। ঝিঁঝি চিঁচিঁ, ক্রিপ ক্রিপ করেই যাচ্ছে। আহা, পৃথিবীটা কী সুন্দর। হঠাৎ কী একটা যেন দৌড়ে গেল সামনে দিয়ে।

কী ওটা? জিজ্ঞেস করল অন্ত।

কাঠবিড়ালি। ধূসর ত্বক, লেজটা বড়। কাঠবিড়ালিরা খুব শান্ত প্রাণী।

ওরা কী খায়?

বাদাম দিতে পারো। ওরা বাদাম খেতে ভালোবাসে। এবার যদি একটু বাঁয়ে তাকাও, দেখতে পাবে আখরোটের গাছ। কয়েকটা বাদাম পেড়ে ঘাসের ওপর রাখলে কাঠবিড়ালিরা ছুটে আসবে।

অন্ত তা-ই করল। আখরোট পেড়ে উবু হতে না হতেই গুটিগুটি পায়ে কোত্থেকে দুই-তিনটে কাঠবিড়ালি এসে হাজির। সাদা দাঁত বের করে কুটকুট করে খেতে শুরু করল বাদামগুলো। বেশ মজার তো!

বাদাম খাওয়ানো শেষ করে আবার নিজ পথে রওনা দিল অন্ত। আজ সে নদী দেখবে। এর আগে সে কোনো দিন নদী জিনিসটা দেখেনি।

নুড়িভরা পথে চলতে চলতে হঠাৎ সামনে দেখে বিশাল জলাধার। ওপারে সূর্য ডুবছে, তাই সোনালি আলোয় চিকচিক করছে পানি। এটাই তাহলে নদী? কী অপূর্ব! কী অপূর্ব! অন্ত নদীর ধারে ঘাসের ওপর ধপ করে বসে পড়ল। আজ সে অনেকক্ষণ এখানে বসে থাকবে। প্রাণভরে পৃথিবীটাকে দেখবে।

কিন্তু ব্যাটারির চার্জ ফুরিয়ে যাবে যে। কথা বলে উঠল চশমা। তোমাকে ফিরতে হবে, সোনা।

ইশ্! একদম ফিরতে মন চাইছে না।

কিন্তু ফিরতে হবে। সাতটার আগে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ো। নয়তো বিপদ।

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্ত উঠল। চমৎকার নদীটাকে ছেড়ে তার একদম যেতে ইচ্ছা করছিল না। গত সপ্তাহে জন্মদিন উপলক্ষে বাবা ওকে চশমাটা উপহার পাঠিয়েছেন। বলেছেন, 'যখন তোমার মন খারাপ হবে, আমার কথা মনে পড়বে, তখন চশমাটা পরে বেরিয়ে পোড়ো। মন ভালো হয়ে যাবে।'

চলো, অন্ত। আর বেশি সময় নেই। তাড়া দিল চশমা।

অন্ত এবার উঠল। জামাকাপড় ঝাড়ল। তারপর আবার নুড়ি বিছানো পথে ফিরতে শুরু করল বাড়ির দিকে। চলতে চলতে হঠাৎ দেখে, একটা ত্রস্ত হরিণ ছুটে যাচ্ছে।

হ-রি-ণ! চিৎকার করে উঠল অন্ত। হরিণের ছবি সে বইয়ে দেখেছে। উত্তেজিত হয়ে সে ওটার পিছু পিছু ছুটল। চশমা তাকে বারবার নিষেধ করতে থাকল, ওদিকে যেয়ো না অন্ত, যেয়ো না। পথ হারাবে। আর আমার চার্জ ফুরিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত বাড়ি চলো।

অন্ত শুনল না। অনেকক্ষণ হরিণটার পিছু ছোটাছুটি করে ক্লান্ত হয়ে যেই না নুড়ি বিছানো পথে ফিরে এসেছে, অমনি খেয়াল করে দেখে, চারদিকের সবুজ বনটা ফিকে ধূসর হয়ে যাচ্ছে। পাখি ও পোকামাকড়ের ডাক আর শোনা যাচ্ছে না। সবকিছু কেমন ঝাপসা ও অন্ধকার।

সে ভয় পেয়ে বলল, কী হয়েছে?

চশমা রেগে গিয়ে বলল, তোমাকে বলেছি আমার চার্জ ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমি আর তোমাকে এসব দেখাতে পারব না। জলদি চলো। দৌড়াও।

অন্ত দৌড়াতে থাকল। দৌড়, দৌড়। তার চারপাশের কৃত্রিম বাস্তব পৃথিবী একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে। বনগুলো সব ভেঙে পড়া ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দালানকোঠা হয়ে যাচ্ছে। ফুলের গাছ ঘেরা পথটা আর ও রকম নেই। উধাও হয়ে গেছে কৃষ্ণচূড়া ও জারুল। তার বদলে দুই ধারে পোড়া ভবন ও পোড়া কংক্রিট। যেন ভুতুড়ে এক শহর।

ছোটবেলায় মা সিন্ডারেলার গল্প শুনিয়েছিলেন। রাত ১২টার আগে ফিরতে না পারলে মুহূর্তের মধ্যে নেই হয়ে যাবে সিন্ডারেলার ঘোড়ার গাড়ি, সুন্দর ঝলমলে পোশাক ও কাচের জুতা। আবার সে পুরোনো গরিব ময়লা সিন্ডারেলা হয়ে পড়বে। মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারটাও তা-ই। যে করেই হোক, সবকিছু আগের মতো হয়ে যাওয়ার আগেই তাকে ফিরতে হবে। তাই সে ছুটতে শুরু করল। তার পেছনে নীল আকাশটা ভয়ংকর ধোঁয়াশা দূষিত কালো হয়ে যাচ্ছে। মেঘ নেই, দেখা যাচ্ছে কেবল কালো ধোঁয়া। বহুদিন সে ঘর থেকে বেরোয়নি। বাবা নিষেধ করেছেন। বাইরের পরিবেশ নাকি খুব খারাপ। কোথাও একটা গাছ নেই, প্রাণী নেই, পাখি নেই। আকাশ নেই, মেঘ নেই, নদী নেই। পৃথিবীটা এমন দূষিত যে বাইরে স্বস্তিতে শ্বাসও নেওয়া যায় না। বহুদিন, বহু মাস ঘরের ভেতর বন্দী থাকার পর গত সপ্তাহে বাবা তাকে এই উপহার পাঠিয়েছেন। কৃত্রিম বাস্তবতার চশমা। এই চশমা তাকে তা-ই দেখাবে, যা সে দেখতে চায়। বাবা বলেছেন, 'তোমার দম বন্ধ লাগলে মাঝেমধ্যে চশমা পরে একটু বাইরে যেয়ো। ভালো লাগবে। কিন্তু খবরদার। একমুহূর্তের জন্যও চোখ থেকে চশমা খুলবে না। তাহলেই আসল পৃথিবী তোমাকে খেয়ে ফেলতে চাইবে।'



বাবা বলেছেন, 'তোমার দম বন্ধ লাগলে মাঝেমধ্যে চশমা পরে একটু বাইরে যেয়ো। ভালো লাগবে। কিন্তু খবরদার। একমুহূর্তের জন্যও চোখ থেকে চশমা খুলবে না

অন্ত চশমা একবারও খোলেনি। কিন্তু চার্জ ফুরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তার মাথায় ছিল না। এখন সে ছুটতে ছুটতে কোনোমতে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। এ কী! ওদের ঘরটাও বুঝি এমন কালো, পোড়া ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে! সে তো জানত না।

দরজা খোলো! চশমা চেঁচাল। ঢুকে পড়ো, ঢুকে পড়ো। ধুলাঝড় আসছে।

অন্ত তাকিয়ে দেখল, পোড়া শহরটার ওদিক থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা কালো দৈত্যের মতো ঝড় এগিয়ে আসছে। প্রায়ই হয় এমনটা। তারপর শুরু হয় বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির পানি এত দূষিত যে গায়ে পড়লে চাকা চাকা ফোসকা পড়ে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোমতে ঘরে ঢুকে পড়ল। যাক, এবারের মতো বাঁচা গেল!

রাতে বাবা স্ক্রিনে এসে দিনটা কেমন কাটল জিজ্ঞেস করলে সে অবশ্য এই সবকিছু তেমন খুলে বলল না; বরং উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, আজ সে কী কী দেখেছে।

বাবা বললেন, 'বাহ্। মাঝেমধ্যে তুমি এমন বাইরে বেরোতে পারো। এরপর কী দেখতে চাও সোনা?'

'পাহাড়! পাহাড়, বাবা। আমি কখনো পাহাড় দেখিনি।'

বেশ, 'চশমাবন্ধুকে বললেই হবে। সে তোমাকে পাহাড়ে

নিয়ে যাবে। কিন্তু দেরি কোরো না যেন। খুব বেশিক্ষণ সে তোমাকে দেখাতে পারবে না। তার লিমিটেশন আছে।'

তার পরের সপ্তাহ সারা দিন একা একা পড়াশোনা করল অন্ত। সাহস সঞ্চয় করল আবার বাইরে যাওয়ার। সত্যিকারের বাহিরটা দেখার সাহস নেই তার। তার কেন, এই পোড়া শহরের কারোরই বাইরে যাওয়ার সাহস নেই। সবাই ঘরের ভেতর বসে থাকে। খাবারদাবার বাজারসদাই দরকার হলে মুদিদোকানে অর্ডার দেয়। ডেলিভারি রোবটরা এসে ঘরে সবকিছু দিয়ে যায়। পড়াশোনা ও অফিসের কাজ সবাই ঘরে বসেই করে। তাদের এ শহর এত দূষিত হয়ে গেছে যে এখানকার মানুষেরা অন্য শহরে যেতে পারে না, অন্য শহরের মানুষ এখানে আসতে পারে না। সে জন্য বাবাও আর আসতে পারেন না। অন্ত এখানে, এই ঘরে একলা আটকা পড়ে গেছে। কত দিনের জন্য, কে জানে। মাঝেমধ্যে ওর এত কান্না লাগে! মনে হয়, মরে যায়।

পরের ছুটির দিনে অন্ত আবার তার চশমা পরে ঘর থেকে বেরোল। আজ সে পাহাড় দেখবে। শুনেছে, পাহাড় অনেক উঁচু একটা জায়গা। আর ওই উঁচু থেকে সবকিছু খুব সুন্দর ও অপূর্ব দেখায়। ঘর থেকে বেরিয়ে আজকের পথটার দুই দিকে আগের গাছগুলো দেখল না অন্ত। আজ দুই ধারে অনেক গোলাপ, কসমস আর নয়নতারা ফুটেছে। প্রজাপতিরা ওড়াউড়ি করছে। কী সুন্দর! সে লক্ষ করল, আশপাশের বাসাগুলোর জানালা থেকে দু-একজন গভীর বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা ছোট ছেলে এই দূষিত শহরে নাকে অক্সিজেন, বিশেষ পোশাক আর চোখে মোটা চশমা পরে নাচতে নাচতে চলেছে, এ তো অবিশ্বাস্য।

সোজা নাক বরাবর গিয়ে বাঁয়ে মোড় নেবে। একটা ঘাসে ছাওয়া মাঠ সোজা একটু একটু করে ওপরে উঠেছে। কখনো পাথুরে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে ওপরে উঠতে থাকবে। প্রায় ২৩ তলা ওঠার পর আমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পারব। কিন্তু অন্ত, সাবধান। আজ আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। সেদিনের মতো ভুল করবে না।

অন্ত মাথা নেড়ে ছুটতে শুরু করল। সবুজ ঘাস। ঘাসের ওপর প্রজাপতি আর নানা রঙের পোকা। লজ্জাবতীগাছ। সে পাহাড়ের পাথুরে লাল সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। চারদিকে কী সুন্দর আকাশ। মেঘ। ঝিরঝিরে বাতাস। উঠতে উঠতে পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় এসে পড়ল অন্ত। এখান থেকে চারদিকের দৃশ্যটা অকল্পনীয় সুন্দর। দূরে দেখা যায়, বন ও বনের ওপারে নদী, যেখানে সে গতবার গিয়েছিল। ওপরে ওঠার কারণে মনে হচ্ছে, আকাশটা ওর একদম কাছে চলে এসেছে। সে গুটিগুটি পায়ে পাহাড়ের প্রান্তে এগিয়ে গেল।

সাবধান! অন্ত, সাবধান। আমরা কিন্তু অনেক উঁচুতে।

আমি জানি।

অন্ত, তুমি বিপজ্জনক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ! পিছিয়ে আসো।

আমার ভালো লাগছে এখানে। অন্ত দুই দিকে শূন্যে দুই হাত বাড়িয়ে প্রাণভরে শ্বাস নিল।

অন্ত, তুমি পড়ে যাবে। পিছিয়ে এসো।

অন্ত কোনো কথা শুনল না।

এই শহরে কেউ বাড়ি থেকে বেরোয় না বলে জানতে পারল না, শহরে টিকে থাকা সবচেয়ে উঁচু ভবনের নিচে একটা ছেলে পড়ে আছে অনেক দিন থেকে। পাশে তার ভাঙা চশমা আর অক্সিজেন সিলিন্ডার।

গণিতের সমস্যা ১০৫

শ্রেণি অনুসারে নিচের গণিতের সমস্যার সমাধান করে আমাদের কাছে পাঠান। সঠিক সমাধানদাতা তিনজন পাবেন রকমারি ডটকমের সৌজন্যে ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর। খামের ওপর **গণিতের সমস্যা ১০৫** লিখুন। নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর স্পষ্ট করে লিখুন।



প্রাইমারি

একটি ব্যাঙ সংখ্যারেখায় লাফালাফি করছে। সে 0 থেকে শুরু করে এবং 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9—এই সংখ্যাগুলোয় একবার করে লাফ দিয়ে পড়ে। পরিশেষে আবার শূন্যে লাফ দেয়। তার লাফ দেওয়ার ক্রম যদি যেকোনো রকম হতে পারে, তবে তার লাফ দেওয়া মোট পথের দৈর্ঘ্য কি—

ক. 20 হতে পারে?

খ. 25 হতে পারে?

জুনিয়র

একটি অসীম, অধ্রুবক পূর্ণসংখ্যার সমান্তর ধারায় 1 রয়েছে। প্রমাণ করো যে এই ধারায় অসীমসংখ্যক পূর্ণ ঘন সংখ্যা রয়েছে।

সাধারণ

একটি আয়তক্ষেত্র ABCD-এর অভ্যন্তরে দুটি অছেদি বৃত্ত ω_1 ও ω_2 এমনভাবে আঁকা হয়েছে যে ω_1 বৃত্তটি AB ও AD বাহুকে যথাক্রমে P ও S বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং ω_2 বৃত্তটি CB ও CD বাহুকে যথাক্রমে T ও Q বিন্দুতে স্পর্শ করে। দেওয়া আছে যে PQ = 11, ST = 10 এবং BD = 14।

বৃত্ত দুটির কেন্দ্রের দূরত্ব কত? ω_1 ও ω_2 বৃত্ত দুটির কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করো।

গণিতের সমস্যা ১০৪-এর বিজয়ী

সুমন চন্দ্র, শ্যামপুর, ঢাকা

সিয়াম হোসেন, ইটনা, কিশোরগঞ্জ

তাসনিমুল হাসান, কালকিনি, মাদারীপুর

গ্রন্থনা : **নাফিস তিহাম**, একাডেমিক সমন্বয়ক
বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি

বৃক্ষোভ

লুৎফুল কায়সার

চুপচাপ বসে আকাশ দেখছিল সে। নীল আকাশটাকে খুব অদ্ভুত লাগে তার কাছে। এ জন্য সময় পেলেই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে ও। অবসর সময়ের কাজ আরকি!

তবে আজকের কথা ভিন্ন। অসুস্থতা, ক্ষুধা আর বিষণ্নতায় জর্জরিত হয়ে প্রায় আধমরা অবস্থায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বাস্তবতা ভুলতে চাইছে ও। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়। রক্তিম লাল রং ধারণ করতে থাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন ঘোর লেগে গেছে ওর।

গত দুই দিন একদমই কিছু না খাওয়ার কারণে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে শরীরের কোথাও তেমন অনুভূতি হচ্ছে না। কেমন যেন একটা অবসাদ চলে এসেছে সবকিছুতে।

এই খোলা প্রান্তরে সে এভাবে আহত অবস্থায় পড়ে আছে প্রায় তিন দিন। অনেক চেষ্টা করেও উঠে দাঁড়াতে পারেনি। সঙ্গে থাকা হালকা খাবারও শেষ হয়ে গেছে সেই প্রথম দিনই।

তবে উঠে দাঁড়াতে পারলেও খুব একটা যে সুবিধা হতো, তা নয়। হাজার হাজার মাইল হাঁটলেও যে খাবার পাওয়া যাবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

বর্তমান পৃথিবীতে খাবারের খুবই অভাব! অভাব রয়েছে পানিরও! গত তিন শ বছরে পৃথিবী পুরোপুরি বদলে গেছে।

সময়টা যে নিশ্চিত তিন শ বছর, তা বলার কিন্তু অবকাশ নেই। কারণ, কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীর বাসিন্দারা সময়ের হিসাব ঠিকমতো রাখে না।



রাখার প্রয়োজনও হয় না। কারণ, পৃথিবীর সভ্য যুগ বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে। যা টিকে আছে, তাকে কোনো সভ্যতা না বলে সভ্যতার কঙ্কাল বললেই বোধ হয় ভালো শোনায়। পুরোপুরি অনুর্বর হয়ে গেছে এর উপরিভাগ, নষ্ট হয়ে গেছে সব প্রাকৃতিক সম্পদ! নির্জন অবস্থায় পড়ে রয়েছে এককালের আলোঝলমলে শহরগুলো, সেগুলোয় এখন প্রেতপুরীর মতো নির্জনতা। গুটিকয় মানুষ যা বেঁচে আছে, তারা বাস করে মাটির নিচে। একটা ছোট কৃত্রিম নগরী বানানো হয়েছে সেখানে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্য নিউ ল্যান্ড'। কে এই নাম দিয়েছিল, তা আর কারোরই মনে নেই। তবে সম্ভবত আড়াই শ বছর আগে কেউ বানিয়েছিল ওই নগর।

তবে লোকজন বলে, যে ভদ্রলোক এই নগরের নকশা করেছিলেন, তিনি ছিলেন একজন প্রকৌশলী। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, এখান থেকেই আবার মানবসভ্যতা নতুন করে শুরু হবে।

তবে কাজের কাজ আসলে কিছু হয়নি। গত কয়েক শ বছরে মানুষের সংখ্যা আরও কমেছে! মানুষের কাজ এখন অনেকটা খাদ্য সংগ্রাহক আর যোদ্ধার মতো। মাটির ওপর রাজত্ব করে বেড়ানো বিভীষিকাগুলোর বিরুদ্ধে এখনো যুদ্ধ করতে হচ্ছে তাদের। সংগ্রহ করতে হচ্ছে নিজেদের খাবার।

মাটির ওপরের বিভীষিকাগুলো! ওরা কারা? ওরা কী?

সেসব পরে বলব। শুধু এটুকু বলে রাখি যে এমন এক পৃথিবীর গল্প শোনাচ্ছি আজ, যা আপনি নিজের সবচেয়ে খারাপ দুঃস্বপ্নেও দেখতে চাইবেন না।

কী ভাবছেন? পৃথিবীর এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? কোনো মহাপ্রলয়?

ব্যাপারটা কিছুটা এমনই।

তবে এসবের কিছুই জানে না সে। শুধু জানে, 'বাঁচতে হলে খেতে হবে।' আর খাবার সংগ্রহ করতে বের হয়েই শত্রুর হাতে এই অবস্থা তার।

চুপচাপ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। বিশ্রাম দরকার তার। কয়েক দিন ধরে তো শুধু বিশ্রামই নিয়ে যাচ্ছে, আর অপেক্ষা করছে সেই ক্ষণের, যখন সে মুক্তি পাবে সব যন্ত্রণা থেকে আর চলে যাবে অনন্ত বিশ্রামে!

যাহোক, বিশ্রাম নিক ও। ততক্ষণে আপনাদের শোনাই সেই গল্প, যার ফলে পৃথিবীর আজ এই অবস্থা।

***

শুরুটা হয়েছিল ২০৫৯ সালে।

তত দিনে যুদ্ধে যুদ্ধে একেবারে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল পৃথিবী। শক্তিশালী দেশগুলো নিজেদের ক্ষমতাধর প্রমাণ করার জন্য একের পর এক অস্ত্রের মহড়া দিতে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। ছোট দেশগুলোর পক্ষে অনেক চেষ্টা করেও নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব ছিল না। কোনো না কোনো ক্ষমতাধর দেশের সঙ্গে যোগ দিতে হলো তাদের। ফলে অহিংস অঞ্চলগুলোও হয়ে উঠল ধ্বংস আর বিপর্যয়ের লীলাভূমি। হিংসার বলি হতে লাগল শতসহস্র নিরপরাধ মানুষ।

শুরু হলো পারমাণবিক আক্রমণ। একের জবাবে আরেক। মৃত্যুর জাল যেন ঘিরে ধরল গোটা পৃথিবীকে। কিন্তু মৃত্যুর ক্ষুধা যেন মিটছিলই না!

প্রতিদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হচ্ছিল বহু সৈনিকের। ব্যাপারটা বেশ বিচলিত করে তোলে পরাশক্তিগুলোকে। মানুষের জায়গায় রোবট সৈন্য ব্যবহার করে কিছুদিন যুদ্ধ চালিয়ে গেল তারা। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ক্ষমতাসম্পন্ন ভয়াবহ সব রোবট আবিষ্কার করে চললেন বিজ্ঞানীরা।

এভাবেই কেটে গেল কয়েক বছর।

রোবট বানাতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হতে লাগল, তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ল ক্ষমতাধর দেশগুলো। রোবট বাদ দিয়ে আবার মানবসৈন্যের দিকে ফিরে যেতে চাইল কিছু দেশ। কিন্তু তত দিনে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে! বেঁচে থাকা অধিকাংশ মানুষও যুদ্ধে যেতে আর আগ্রহী ছিল না।

সমাধান খুঁজে বের করতে নতুন প্রযুক্তির সন্ধান করতে লাগল পরাশক্তিগুলো। নতুন নতুন বিজ্ঞানীকে নিয়োগ দেওয়া হলো এ কাজে। ঠিক এ কারণেই বাংলাদেশের প্রখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী ড. জাহিদ হোসেনকে নিয়োগ দিয়েছিল এক অতি ক্ষমতাধর দেশ। সেই পরাশক্তি কিংবা জাহিদ হোসেন কেউই হয়তো জানতেন না, তাঁদের এই কাজ বদলে দেবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে!

২০৫৫ সালের দিকে এক অদ্ভুত থিওরি দিয়েছিলেন ড. জাহিদ।

এক সেমিনারে ড. জাহিদ বলেছিলেন, 'আমরা রূপান্তরিত হচ্ছি, প্রতিনিয়ত রূপান্তরিত হয়েই যাচ্ছি। ঠিক সেভাবেই গাছও কিন্তু রূপান্তরিত হচ্ছে, ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে তারা। চাইলেই কিন্তু এমন এক প্রজাতি সৃষ্টি করা সম্ভব, যারা একই সঙ্গে প্রাণী ও উদ্ভিদ।'

'প্রাণী ও উদ্ভিদ একই সঙ্গে? বুঝলাম না। একটু বুঝিয়ে

বলবেন কি?' ভ্রু কুঁচকে প্রশ্নটা করেছিলেন একজন।

'আচ্ছা,' হাসিমুখে বলেছিলেন ড. জাহিদ, 'আমি মূলত এমন এক প্রজাতির উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে চাই, যারা প্রাণীর মতো আচরণ করবে। প্রাণীর মতো চলাফেরা করে বেড়াবে, শিকার করবে আর প্রাণীর মতোই শক্ত খাবার গ্রহণ করবে! সর্বোপরি ওই প্রজাতির গাছের আচরণ হবে প্রাণীর মতো। আমি ব্যাপারটা নিয়ে কাজও শুরু করে দিয়েছি। কিছু পতঙ্গভুক উদ্ভিদ নিয়ে প্রাথমিকভাবে শুরু করেছিলাম। বর্তমানে আমার কাজ মোটামুটি একটা পর্যায়ে চলে এসেছে। খুব তাড়াতাড়ি হয়তো আপনাদের ফলাফল দেখাতে পারব।'

'কিন্তু প্রাণীর মতো উদ্ভিদ সৃষ্টি করে লাভ? আর ওরা কী শিকার করবে? ওদের খাবার জোগাবে কে?' হাসতে হাসতে বলেছিলেন আরেকজন।

'আমরা সবাই জানি যে মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। মানুষের সেই অভাব রোবট দিয়ে পূরণ করছে উন্নত দেশগুলো। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলোর সেই উপায়ও নেই। আমরা যদি এমন প্রজাতির গাছের জন্ম দিতে পারি, যারা কাজ করবে এবং আমাদের আদেশ মেনে চলবে, তবে সেগুলোকে আমরা আমাদের দেশের শ্রমবাজারে কাজে লাগাতে পারি। আমি বর্তমানে ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ আর পিচার প্ল্যান্টের ওপর কাজ করে এমন এক ছোট প্রজাতির গাছের জন্ম দিয়েছি, যা খুব তাড়াতাড়ি বংশবিস্তার করতে পারে এবং আমার আদেশে কম পরিশ্রমের কাজও করতে পারে। আশা করছি, খুব তাড়াতাড়ি বড় কোনো গাছের জন্মও দিতে পারব। 'খাবার?' খাবার নিয়ে চিন্তা করবেন না, ওরা যদি আমাদের জন্য শ্রম দেয়, তবে ওদের খাবার জোগাতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কারণ, দিনের শেষে ওটা তো আর মজুরি নেবে না, শুধু খাবারটাই খাবে আরকি!' গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন ড. জাহিদ।

পরদিন দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত সায়েন্স ম্যাগাজিনের প্রধান শিরোনাম ছিল, 'সায়েন্স ফিকশন বিলাসী ড. জাহিদের কথা!'

বলা বাহুল্য, এই পুরো আর্টিকেলে ড. জাহিদকে একেবারে ধুয়ে দেওয়া হয়েছিল!

ড. জাহিদের এই থিওরি নিয়ে কয়েক মাস ধরে বিজ্ঞানীমহলে হাসাহাসি চলেছিল। সায়েন্স ম্যাগাজিনগুলোও তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কলাম লিখতে ছাড়ল না।

সবকিছু দেখে বেশ হতাশ হয়ে পড়লেন ড. জাহিদ। নিজের কাজ নিয়ে কথা বলা বলতে গেলে ছেড়েই দিলেন তিনি।

ড. জাহিদ যদি জানতেন, তাঁর এই আবিষ্কারই বদলে দেবে পৃথিবীর চেহারা!

***

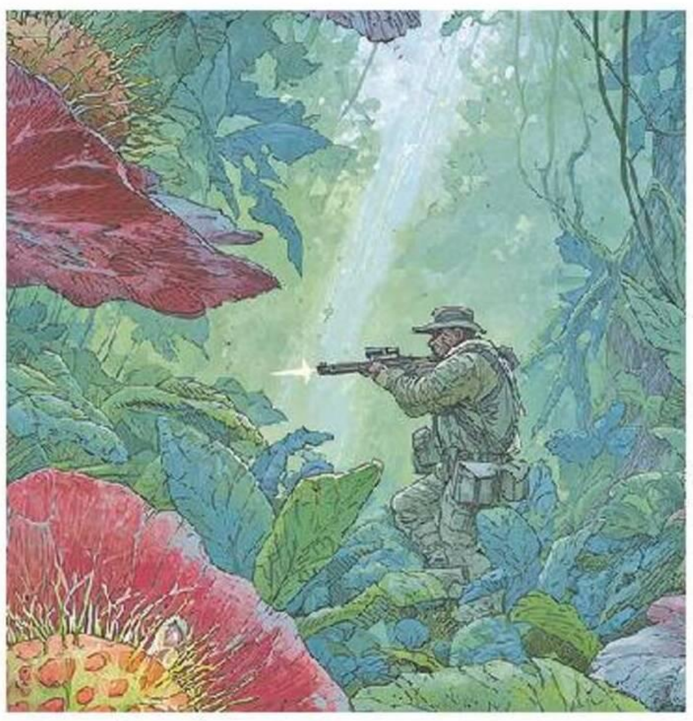
দেশের মানুষ কোনো মূল্যায়ন না করলেও ড. জাহিদ ঠিকই একটি ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের নজরে পড়েছিলেন। ওরাই পরে তাঁর গবেষণার সব খরচ জুগিয়েছিল। তবে তাদের শর্ত ছিল একটাই, আর সেটা হলো, 'এমন এক প্রজাতির গাছের জন্ম দিতে হবে, যাদের সৈন্যের মতো ব্যবহার করা যাবে।'

প্রচণ্ড মেধাবী ছিলেন ড. জাহিদ। মাত্র কয়েক মাসের প্রচেষ্টাতেই এক ভয়ানক গাছ বানিয়ে ফেললেন তিনি। বিরাট আকৃতির এক ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপের জন্ম দিলেন, যেটি হাঁটতে ও চলতে সক্ষম!

কিন্তু সবকিছুতেই একটা ফাঁক থেকে যায়। ড. জাহিদের কাজেও ছিল।

ড. জাহিদের সৃষ্টি করা গাছটি জন্মের কিছুক্ষণ পরই নিজের জন্মদাতাকে হত্যা করে। সেখান থেকেই শুরু।

এরপর গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তারা। পৃথিবীর কোনো দেশের সেনাবাহিনীই ওদের সামনে দাঁড়াতে পারল না



বংশবিস্তারের ক্ষমতা খুব প্রবল ছিল ওই গাছের। অযৌনপদ্ধতিতে এক দিনে নিজের মতোই প্রায় পাঁচ শ দানবের জন্ম দেয় সে।

রাস্তায় নেমে হত্যা আর ধ্বংসে মেতে ওঠে তারা।

ভয়াবহ সেই দানবগুলোকে ঠেকাতে নিজেদের সেনাবাহিনীকে আদেশ দেয় সেই ক্ষমতাধর দেশ। সেনাবাহিনীর গুলি, বারুদ আর বোমায় মারা যায় অসংখ্য রাক্ষুসে গাছ। কিন্তু তাদের বংশবিস্তারের হার এত বেশি ছিল যে এতে কিছুই যায়-আসেনি! ওই দেশের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দেশটাকে একদম নিষ্প্রাণ করে দেয় দানবগুলো।

এরপর গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তারা। পৃথিবীর কোনো দেশের সেনাবাহিনীই ওদের সামনে দাঁড়াতে পারল না। রক্তের নহর বইতে লাগল পৃথিবীর এককালের আলোঝলমলে শহরগুলোতে। পিশাচগুলোর ওই ধ্বংসযজ্ঞের কাছে ম্লান হয়ে গেল অতীতের সব হত্যালীলা!

একটা সময় মানুষ হার মানতে লাগল। তারা বুঝতে পারল, এই দানবগুলোর সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব।

আর সেখান থেকেই সৃষ্টি 'দ্য নিউ ল্যান্ড'-এর। অবশিষ্ট মানুষেরা সেখানেই বাস করতে লাগল। মাটির উপরিভাগ আর দ্য নিউ ল্যান্ডের মাঝখানে সৃষ্টি করা হলো একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র। এটি এত শক্তিশালী ছিল যে সেটা পেরিয়ে নিউ ল্যান্ডে ঢোকা সম্ভব ছিল না গাছগুলোর পক্ষে।

মাটির নিচে স্থায়ী হয়ে পড়ল মানুষ। আর ওপরে চলতে লাগল সেই ভয়াবহ গাছগুলোর রাজত্ব।

কিন্তু মাটির নিচে টিকে থাকতে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে লাগল মানুষ। খাবার আর পানির মজুত ফুরিয়ে গেল খুব তাড়াতাড়িই, অক্সিজেনের মজুতও শেষের দিকে চলে এল। অপর দিকে মাটির ওপর প্রায় সব গাছ ও প্রাণীকে নির্মমভাবে শেষ করে দিয়েছিল ওই গাছগুলো।

খাবার আর অক্সিজেনের অভাবে দিশাহারা হয়ে পড়ল মাটির নিচের মানুষেরা।

আর তারপরই খাবার আর অক্সিজেনের জন্য এক অভিনব উপায় বের হয়ে এল। অস্ত্র নিয়ে মাটির ওপর উঠে আসতে লাগল কিছু মানুষ কিছুক্ষণের জন্য, উদ্দেশ্য—অক্সিজেন আর খাবার সংগ্রহ। স্বয়ংক্রিয় মেশিন দিয়ে খুব তাড়াতাড়িই অক্সিজেন সংগ্রহ করে ফেলত তারা। কিন্তু খাবার? খাবারের জন্য মানুষ বেছে নিল ওই দানবগুলোকেই! ওগুলোকে হত্যা করে মাটির নিচে নিয়ে যেতে লাগল তারা, তারপর গাছগুলোর মাংস বাজারে বিক্রি হতো! মাঝেমধ্যে শিকারে গিয়ে শিকারিও শিকারে পরিণত হতে লাগল।

বদলে গেল মানবসভ্যতা। দ্য নিউ ল্যান্ডে জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্মের পরই শেখানো হতে লাগল যুদ্ধবিদ্যা; যাতে তারা শিকার করে খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে। মানুষের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল খাদ্য সংগ্রহ। অনেকটা আদিমকালের মতো। বদলে গেল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, হারিয়ে গেল সময়ের হিসাব।

সেই প্রযুক্তিগুলোই টিকে রইল, যা মানুষকে শিকার ধরতে সহায়তা করতে পারে! বাকি সব হারিয়ে যেতে লাগল। রইল না বিনোদনের কোনো উৎস; কারণ, দ্য নিউ ল্যান্ডের বিষণ্ন পরিবেশে কেউই বিনোদন চাইত না। সবাই শুধু একটা জিনিসই চাইত, আর তা হলো 'খাবার'।

মানুষের জন্য সময়ের হিসাব থমকে গেল দিন আর রাতে!

আর এভাবেই কেটে গেল কয়েক শ বছর!

***

মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ঘুরে তাকাল সে। হ্যাঁ, দুজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে। দুজনের হাতে দুটি ভয়াবহ চেইন স। একে অপরের সঙ্গে কথা বলছে ওরা দুজন।

'বেঁচে আছে কি?' ডিকের দিকে তাকিয়ে বলল জন।

'তা আছে, তবে মৃতপ্রায়ই বলা চলে, চলো দেখি,' বলল ডিক।

জন আর ডিক এগিয়ে এল ওর দিকে।

'প্রায় মরেই গেছে, এই দিয়ে...'

কথাটা আর শেষ করতে পারল না ডিক। সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নিজের শুঁড়গুলো দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল সে। চিৎকার করে উঠল ডিক। সঙ্গে সঙ্গে ওর একটা শুঁড়ের ওপর চেইন স চালিয়ে দিল জন, তীব্র ব্যথায় যেন অবশ হয়ে পড়তে চাইল তার মস্তিষ্ক। তবে ওই মুহূর্তে যেন আসুরিক শক্তি ভর করেছিল ওর গায়ে। খুবই দ্রুত দুটি শুঁড় দিয়ে জনের চোখ বরাবর আঘাত করল সে, চিৎকার করে বসে পড়ল জন।

***

উষ্ণ রক্তের স্বাদে যেন প্রাণ ফিরে এসেছে ওর শরীরে। সামনেই পড়ে রয়েছে জন আর ডিকের খুবলানো মৃতদেহ।

এখনো পুরোপুরি উঠে দাঁড়াতে পারছে না সে। তবে সামনের কয়েক দিনের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, এটা নিয়ে সন্তুষ্ট সে।

আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করতে লাগল ও। জনের কেটে দেওয়া শুঁড়গুলোর জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড বড় এক ক্ষত। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

তার জ্ঞান কি আর ফিরবে? কে জানে! ফিরতেও পারে!

সে একটা গাছ। ওর কোনো নাম নেই। নেই কোনো ঠিকানা। শিকার করেই বেঁচে থাকে, খিদে পেলে খায়।

বলেছিলাম না? এমন এক সময়ের গল্প আপনাদের বলছি, যা হয়তো নিজেদের সবচেয়ে বাজে দুঃস্বপ্নেও দেখতে চাইবে না কেউ!

বিজ্ঞান উৎসব
বিজ্ঞানে বিকাশ



বিজ্ঞানী হতে চাও?
প্রজেক্ট বানিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দাও

সহযোগিতায় :
প্রথম আলো বন্ধুসভা

বিজ্ঞানচিন্তা bigganchinta.com | বিকাশ

বিজ্ঞান উৎসব আসছে তোমার অঞ্চলে

নিবন্ধন চলছে
প্রতিদিন সকাল ১১-৫টা

খুলনা বিজ্ঞান উৎসব
নিবন্ধনের স্থান:
৮ নাজিরঘাট ক্রস রোড (হাজীবাড়ী মোড় এলাকা), খুলনা।
০১৯২৯০০৯৩৬৬

বরিশাল বিজ্ঞান উৎসব
নিবন্ধনের স্থান:
হেলেনা প্যালেস, ৫৫৭ পুলিশ লাইনস রোড, বাংলাবাজার মোড়, বরিশাল।
০১৭০৩১৩১৫৪৩

চট্টগ্রাম বিজ্ঞান উৎসব
নিবন্ধনের স্থান:
প্রথম আলো অফিস, এ এস টাওয়ার, রোড: ১, প্লট: ৫৫৩ (শিশু একাডেমির পাশে), হিলভিউ আ/এ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
০১৬২২-২০২৯৩৬

সিলেট বিজ্ঞান উৎসব
নিবন্ধনের স্থান:
প্রথম আলো মনির ম্যানশন (৩য় তলা), বারুদখানা, সিলেট
০১৬১৯৭১০০৩৪

চোখ রাখো : বিজ্ঞানচিন্তার ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজ, বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ফেসবুক পেজ এবং প্রথম আলোয় | মুঠোফোন: ০১৭০৮১৬৮৭৯০

কল্পগল্প

খেলা

ডিউক জন

খেলা হচ্ছে। কনফেশন গেম।

কার্পেটের ওপর গোল হয়ে বসেছে চার তরুণ, দুই তরুণী। নিচু একটা টেবিল ঘিরে।

কমবেশি উত্তেজিত হয়ে আছে সবাই। একজন ছাড়া। লিসা। তার অস্বস্তি লাগছে।

'ওকে', টেবিলের ওপর শোয়ানো বোতলটা স্পর্শ করে বলল রাকিব, 'আবার দিলাম ঘুরিয়ে!'

আইডিয়াটা রাকিবেরই। ঘুরতে ঘুরতে বোতলের মুখটা যার দিকে স্থির হবে, তাকে তার জীবনের এমন একটা গুমর ফাঁস করতে হবে, যেটার কথা আজ পর্যন্ত কাউকে বলেনি সে।

প্রস্তাবটি পছন্দ হয়নি লিসার। কিন্তু খেলার জন্য জোরাজুরি শুরু করল রাকিব। দেখাদেখি অন্যরাও।

ঘুরছে খালি বোতলটা। হেলিকপ্টারের ব্লেডের মতো।

তীক্ষ্ণ এক চিৎকারে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সবার চোখ ঘুরে গেল সেদিকে।

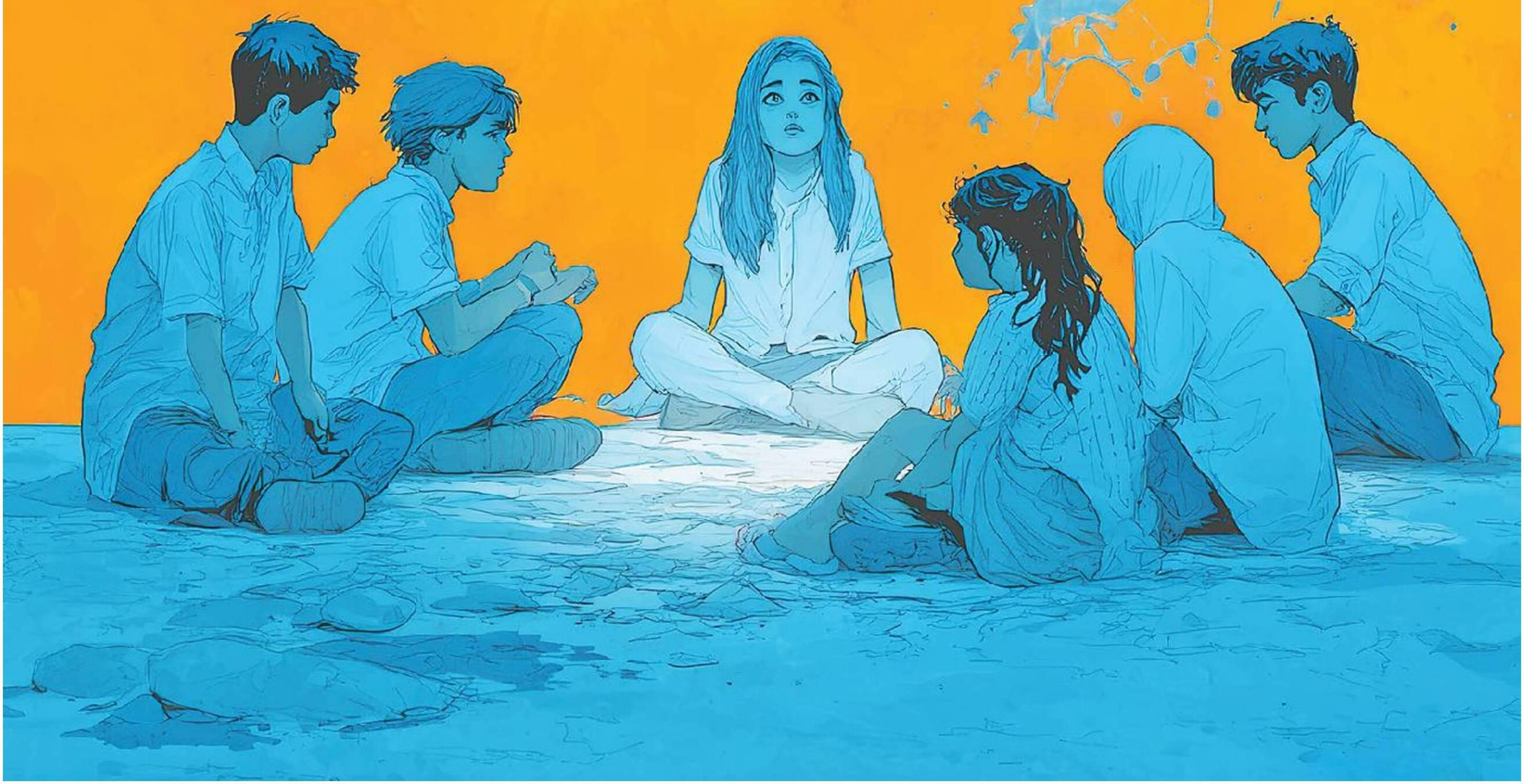
চিৎকারটা জিনার। পার্টিতে ডিজের ভূমিকা পালন করছে সে।

ধিড়িম ধিড়িম ইলেকট্রনিক ড্রামবিটের সঙ্গে নতুন গান শুরু হলো।

'ইয়াহ!' উল্লাসে মাথার ওপর মুঠো ছুড়ল জিমি—ছয়জনের একজন।

খিলখিল করে হেসে উঠল মারিয়া।

বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল ওদের লিসা। অজান্তেই হাত দুটি বেঁধে ফেলেছে বুকের ওপর। শীত করছে যেন ওর।



‘আই মা!’ টেবিলের ওপর চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল সুহান।

প্রমাদ গুনল লিসা। ওর দিকেই মুখ করে আছে কোকের বোতলটা। অভিযোগের আঙুল তুলেছে যেন।

‘বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান!’ সুর করে বলে উঠল সোহেল, ‘এবার?’

‘আমাদের সবার গোপন কথা জেনে গেছ তুমি!’ হাসল সুহান, ‘এবার শুনব তোমারটা!’

আনন্দধ্বনি করে উঠল অন্য চারজন।

ক্ষণিকের জন্য খেলার কথা ভুলেই গিয়েছিল সবাই। নতুন করে এখন উত্তেজনা ভর করল ওদের ওপর। পার্টি লাইটের জ্বলজ্বলে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে প্রত্যেকের চেহারায়।

খেলতে রাজি হওয়ার জন্য পস্তাচ্ছে এখন লিসা। ভাবছে, মিথ্যা কথা বলবে? বানিয়ে বানিয়ে বলে দেবে কিছু একটা? কী বলা যায়...কী বলা যায়! টের পেল, রক্ত চলাচলের গতি দ্রুত হয়ে উঠেছে ওর শিরা ও ধমনিতে।

‘কই, শুরু করো!’ তাগাদা দিল মারিয়া।

ধুর, কিছুই তো আসছে না মাথায়! নিজের ওপরই বিরক্ত হলো লিসা। আসলে এই পার্টিতে আসাই উচিত হয়নি ওর!

‘সিরিয়াস কেস মনে হচ্ছে!’ মন্তব্য করল জিমি, ‘কী করেছ তুমি, লিসা? চুরি? খুন? নাকি...!’

‘না, না, ওসব কিছু না!’ তাড়াতাড়ি বলে উঠল লিসা। একেক করে তাকাল পাঁচ বন্ধুর দিকে, ‘আসলে...আমি তখন ছোট...’ বলতে গিয়েও ব্রেক কষল। হঠাৎই আনমনা হয়ে পড়েছে।

লিসার কথার খেই ধরল রাকিব, ‘তুমি তখন ছোট, তারপর?’

‘হুঁ?’

‘ছোটবেলায় কী করেছিলে তুমি?’ জানতে চাইল সোহেল।

‘কারও কফিতে থুতু দিয়েছিলে নাকি?’ খিক খিক করে হেসে উঠল সুহান।

ওর হাসির সঙ্গে তাল মেলাল মারিয়া।

রেগে উঠল লিসা, ‘তুমি দিয়েছ মনে হয়!’

‘থামো তোমরা!’ সিরিয়াস ভঙ্গিতে দুই হাত তুলল রাকিব, ‘বলতে দাও ওকে! লিসা, ছেলেবেলায় কী ঘটেছিল তোমার জীবনে, বলো আমাদের!’

‘আচ্ছা, আচ্ছা, বলছি!’ আত্মসমর্পণ করল লিসা। প্রাণপণ চেষ্টা করছে শরীরের কাঁপুনি থামানোর, ‘অভিজ্ঞতাটা সুখকর ছিল না আমার জন্য!’

লিসার বাহুতে সহানুভূতির হাত রাখল পাশে বসা মারিয়া। ওর দিকে একবার তাকাল লিসা। তারপর আবার বলতে শুরু করল, ‘আমি...আমি...গোপন একটা এক্সপেরিমেন্টের অংশ ছিলাম!’ বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল কণ্ঠস্বর।

‘এক্সপেরিমেন্ট?’ প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল জিমি আর সোহেল।

‘হ্যাঁ। ব্রেন কম্পিউটার ইন্টারফেস নিয়ে কাজ করছিল ওরা। আর আমি ছিলাম ওদের গিনিপিগ। তবে এ-ই সব নয়। স্মৃতি বদলে দেওয়া হয় আমার, বানোয়াট স্মৃতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয় মাথার মধ্যে। বলা যায়, হ্যাক করা হয়েছিল আমার মগজটা।’

গানবাজনার চড়া আওয়াজের মধ্যেও নিস্তব্ধতা নেমে এল যেন কামরায়। চোখ পিটপিট করছে লিসার। বন্ধুরা লিসার কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছে।

‘ত-তবে...।’ বলতে গিয়ে তোতলাতে লাগল লিসা, ‘স্রেফ এক্সপেরিমেন্টের অংশ ছিলাম না আমি। এমন এক

ব্রেন কম্পিউটার ইন্টারফেস নিয়ে কাজ করছিল ওরা। আর আমি ছিলাম ওদের গিনিপিগ। তবে এ-ই সব নয়। স্মৃতি বদলে দেওয়া হয় আমার, বানোয়াট স্মৃতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয় মাথার মধ্যে



প্রোগ্রামের অংশ ছিলাম, যেটা স্মৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারে, ম্যানিপুলেট করতে পারে স্মৃতিকে। ওরা...ওরা আসলে অস্ত্র হিসেবে তৈরি করছিল আমাদের!’

কথাটা শুনে গা শিরশির করে উঠল অন্যদের, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওরা লিসার দিকে।

‘কী বলতে চাইছ?’ নার্ভাস হাসল সোহেল, ‘কোনো ধরনের স্লিপার এজেন্ট তুমি? মাইন্ডকন্ট্রোলড সোলজার?’

‘ছিলাম। তবে এখন আর নেই। ওদের খপ্পর থেকে অনেক আগেই বেরিয়ে এসেছি। যদিও এর পর থেকেই আমাকে প্রতিনিয়ত ট্র্যাক করা হচ্ছে।’ বলে সারতে পারল না, টের পেল লিসা, ভাইব্রেশন হচ্ছে ওর নিউরাল ইমপ্ল্যান্টে।

কেউ কোনো মন্তব্য করতে পারার আগেই তীক্ষ্ণ শব্দে ভরে উঠল কামরাটা। ভোজবাজির মতো উদয় হয়ে ক্রমাগত ঝলসাতে থাকা হলোগ্রাফিক গ্রিড ছেয়ে ফেলল ওদের।

‘ক কী হচ্ছে এসব?’ জিমির কণ্ঠে আতঙ্ক।

তীব্র গোলমালের আওয়াজের সঙ্গে হঠাৎ বদলে যেতে শুরু করল চারপাশের দেয়ালগুলো। নতুন এক ডিজিটাল দুনিয়া জন্ম নিচ্ছে ওদের ঘিরে। একটু আগের ওই খেলার খেলোয়াড় নয় আর ছেলেমেয়েগুলো; বরং ওদের নিয়েই খেলছে যেন কেউ আড়াল থেকে! আদতে ওরা এখন কল্পনাতীত বিশাল কোনো এক্সপেরিমেন্টের অংশ।

ফ্যাকাশে চেহারায় পালা করে তাকাল সবার দিকে লিসা। কম্পিত কণ্ঠে বলল, ‘আবার প্রোগ্রামে জুড়ে দেওয়া হয়েছে আমাকে! আর এবার...একা শুধু আমাকে নয়, তোমাদের সবাইকেও!’

সোনালি কুয়াশা

পিটার কারটুর
মো. ফুয়াদ আল ফিদাহ

বড়সড় লোকটা গম্ভীর গলায় বলল, ‘ওটা হবে না, জনাব। শনিবার রাতে আমি শহরে যাই। আজ তো শনিবার রাত।’

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা ছোটখাটো লোকটা কাঁপছিল। কুকুরের চিৎকার ছাপিয়ে যেন কথাগুলো শুনতে পায়, সে জন্য কান পেতে রেখেছে। তার মুখ শুকনা, চোখে একটা অস্থির উন্মাদনা। পুরো মানুষটাকেই যেন ছোট আর ক্লান্ত দেখায়, জামাকাপড়ও ঢলঢলে। চোখেমুখে ভেসে আছে হারের ক্লান্তি।

‘ব্রাউন সাহেব...এবার যদি সত্যিই দেখা যায়! গুজব না হয়ে যদি বাস্তব হয়...প্লিজ!’

ব্রাউন দুপাশে মাথা নাড়ল ধীরে, চোখ দুটো সতর্ক।

‘আমি কিন্তু ওটাই খুঁজছিলাম, আপনিই তো বলেছেন যে আপনি দেখেছেন। অন্যরাও দেখেছে। আপনি তো শপথ পর্যন্ত করেছিলেন...’

‘হ্যাঁ,’ থুতু ফেলল ব্রাউন। ‘দেখেছি। আর যারা বলে দেখিনি, তারা মিথ্যুক।’

‘আমি জানি...ব্রাউন সাহেব। আমি অতিপ্রাকৃত বিষয় খুঁজে বেড়াই—প্রেতাত্মা, আত্মা ইত্যাদি। আজ রাতেই দেখতে হবে ওটাকে।’ ছোট্ট মানুষটা চোখ বন্ধ করল একমুহূর্তের জন্য, ভর দিল বারান্দার খুঁটির ওপর।

‘আজ শনিবার।’

‘কিন্তু এই রাতটাই শেষ রাত।’

‘এখন থেকে হয়তো রোজই দেখা যাবে, কে জানে।’

‘আমি জানি যে যাবে না, ব্রাউন সাহেব। আর ১০ মিনিট...তারপর আর ওটা থাকবে না।’ চোখে

এআই আর্ট

আকুতি ভরিয়ে চাইল ছোটখাটো লোকটা।

'দেখার মতো জিনিসই বটে।'

'আপনি নিশ্চিত যে ওটা কেমন দেখতে?'

'যা দেখেছি, ঠিকঠাকমতোই দেখেছি। সোনালি, জ্বলজ্বলে। অন্ধকার ছাড়া দেখা যায় না। নড়াচড়া করে না, কিন্তু হালকা কাঁপে, যেন ঝিকিমিকি।'

'ঠিক বলেছেন, ব্রাউন সাহেব! আমার নিজের চোখে দেখতেই হবে।'

'দুঃখিত, সাহেব, তা হবে না। আমাকে শহরে যেতেই হবে।' ব্রাউন চোখ রাখল ছোট্ট লোকটার মুখে। দৃষ্টি পড়ল সেই যন্ত্রণায় ভরা চোখে। 'তবে...যদি বিনিময়ে কিছু মেলে তো—শনিবারের রাতে বাইরে যাওয়া ছাড়তে হলে তো কিছু পেতে হবে।'

'একমুহূর্তও লাগবে না।'

'তা-ও আমি চলেই যাব।'

'আমার কাছে দেখতে পাওয়ার ব্যাপারটা অমূল্য... একদম সবকিছু।'

'কত দেবে?'

'আ-আমার কাছে টাকা নেই।'

'হুহ!'

'৭০০ মাইল এর-ওর গাড়িতে দয়া চেয়ে চেয়ে এসেছি এখানে।'

ব্রাউন মাথা নাড়ল। 'তোমার আঙুলে দারুণ একটা আংটি আছে...যাক, আমি যাচ্ছি।'

লোকটা হাত নামিয়ে নিল, আবার উঠিয়ে আনল পরক্ষণেই। তাকাল সেই অদ্ভুত আকৃতির আংটির দিকে। 'এই আংটিটা দেওয়া যাবে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল ব্রাউন, দরজার দিকে ফিরে হাত রাখল চাবিতে। 'গেট লক করতে হবে...কুকুর ছাড়ব এখন। বাইরে থাকলে তা তোমার জন্য ভালো হবে না।'

'না, দাঁড়ান...আপনি নিতে পারেন আংটিটা।'

চোখ বন্ধ করল ব্রাউন। 'দিতে চাচ্ছ?'

'হ্যাঁ...আপনি নিন।'

ব্রাউন দরজাটা খুলে দিল, বিনিময়ে নিয়ে নিল আংটিটা। বাতি জ্বালাল ভেতরে ঢুকে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল আংটিটা : সোনালি, কিন্তু সোনা নয়। ভারী, অস্বাভাবিক ওজনদার। দেখা শেষে ঢুকিয়ে নিল কনিষ্ঠায়, চামড়ায় আঁটসাঁট হয়ে রইল আংটিটা।

ওদিকে ছোট্ট লোকটা শোবার ঘরের দরজার দিকে এগোল নার্ভাস ভঙ্গিতে।

ওকে ঠেলল ব্রাউন। 'আরে, ঢুকেই পড়ো না। দাম দিয়ে দিয়েছ তো। ক্ষতিকর কিছু না।'

কিন্তু ছোট্ট লোকটা আগে ঢুকল না। পাশে দাঁড়িয়ে ইশারা করল ব্রাউনকে, আগে প্রবেশ করতে।

ঘরের ভেতর বাতাসে ভেসে আছে এক সোনালি ঝলক, যেন আলোয় গড়া কুয়াশা। আট ফুট উঁচু, চার ফুট চওড়া। 'ভূতটূত কিছু না,' হাসল ব্রাউন। 'হয়তো ভেবেছিলে, ভূত দেখার জন্য দাম দিচ্ছ। তবে আমি কিন্তু বলিনি যে ভেতরে ভূত আছে!'

ছোট লোকটার মুখ শক্ত হলো, দৃষ্টিটা ভারী আর দুঃখভরা। তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমার বিশ্বাসই হতে চাইছে না যে আপনি সত্যিই ওটার ভেতর দিয়ে হেঁটে গেছেন, মি. ব্রাউন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, গেছি তো,' ব্রাউন এগোল। 'এই দেখো।'

'দাঁড়ান, একসঙ্গেই যাই,' বলল ছোট্ট লোকটা, হাত রাখল ব্রাউনের বাহুতে। 'ঠিক আছে?'

দুজন একসঙ্গে ঢুকল সোনালি কুয়াশার ভেতর।

এবার নতুন অভিজ্ঞতা হলো ব্রাউনের। শরীরজুড়ে তীব্র ঝিলিক, অথচ আগেরবার বাতাস ছাড়া কিছু অনুভব করেনি। পেছনে ফিরতে চাইল বিশালদেহী লোকটা, কিন্তু ছোট্ট লোকটার আঁকড়ে ধরা হাত ওকে ছাড়ল না; অস্বাভাবিক শক্তিতে বাধ্য করল এগিয়ে যেতে। আংটি পরা আঙুল থেকে গরম স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ছে একধরনের কাঁপুনি। ফিরে যেতে চাইল ব্রাউন, সেই চেনা শোবার ঘরে; কিন্তু পারল না।

কুয়াশার বাইরে পা রাখতেই থমকে গেল। পরিচিত ঘর, বাড়ি, রাত—সবকিছু গায়েব।

চারপাশে এখন দিন। ঘাসের রং অচেনা—নীলচে। গাছগুলো লম্বা সুচের মতো, ডাল নেই। আকাশ কমলা আর সেখানে জ্বলছে তিনটা সূর্য।

ভয়ে ছিটকে ব্রাউন পেছনে ফিরে তাকাল, ছুটল কুয়াশার দিকে। দেখে শুধু মাথা নাড়ল, ছোট্ট লোকটা মাথা নাড়ল।

'টায় টায় পৌঁছে গেছি, ব্রাউন। কুয়াশা শেষ।'

ছোট্ট লোকটা বদলে যাচ্ছে। শরীর ভরাট হচ্ছে, কাপড়টাও টান টান হয়ে উঠছে। 'আমি দুঃখিত, ব্রাউন। আমি পারতাম না



ঘরের ভেতর বাতাসে ভেসে আছে এক সোনালি ঝলক, যেন আলোয় গড়া কুয়াশা। আট ফুট উঁচু, চার ফুট চওড়া। 'ভূতটূত কিছু না,' হাসল ব্রাউন

কুয়াশার এপাশে আসতে, আংটিটা আমার লাগতই। অথবা লাগত এমন কাউকে যে আংটি পরে আছে...; অর্থাৎ তোমাকে যেতে দেওয়ার উপায় ছিল না।'

'এসব পাগলামি। আমি কোথায়?' থেমে গেল ব্রাউন, চোখ রাখল আকাশে।

'বাড়ি, আমার বাড়ি। এখানেই থাকি আমি...পারলে আরেকটা কুয়াশা খুঁজে নাও, আংটিটা যেন থাকে তোমার হাতে। তখন ফিরে যেয়ো...মার বাড়িতে।'

'কিন্তু—কুয়াশা পাব কোথায়?'

'কান পেতে থাকো। অনেক গুজব শুনবে। শুনবে অদ্ভুত গল্প। এই দিকেও ভূতের গল্প প্রচুর। তদন্ত করো। খুঁজে বের করো।'

'কিন্তু—'

'শুভকামনা, ব্রাউন।'

ঘুরে দাঁড়াল ছোট্ট লোকটা। হাঁটতে শুরু করল সেই অদ্ভুত নীল ঘাসের ওপর দিয়ে। একবার পেছনে তাকাল, দেখল—ব্রাউন তাকিয়ে আছে অসহায় চোখে।

একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর এগিয়ে গেল পা ফেলে। একমুহূর্ত পরই সুচের মতো গাছের ভেতর মিলিয়ে গেল লোকটা...

...আর দেখা গেল না ওকে।

ফেরা

ডব্লিউ হিলটন ইয়াং
ভাষান্তর : আবুল বাসার

ভবিষ্যতে যাওয়ার আগে একটি ক্যামেরা ও একটি টেপরেকর্ডার কিনল উইলিয়ামস। নোট করার জন্য শর্টহ্যান্ডও শিখল। একসময় সব প্রস্তুতি শেষ হলো। এরপর, সেদিন রাতে আমরা কফি বানালাম। তার ফিরে আসার জন্য ব্র্যান্ডি ও গ্লাস বের করে রাখলাম।

'বিদায়।' আমি বললাম, 'বেশি দেরি কোরো না কিন্তু।'

'চিন্তা কোরো না; তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।' সে উত্তর দিল।

আমি তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। সে সামান্যতমও কাঁপল না।

উইলিয়াম যাত্রা শুরু করল।

ঘড়ির কাঁটার যে সময়ে সে রওনা হলো, ফিরে এল ঠিক একই সময়েই। তাকে দেখে মনে হলো, বয়স এক দিনও বাড়েনি। ভেবেছিলাম, ভবিষ্যতে গিয়ে সে হয়তো বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে আসবে।

'তাহলে?'

'তাহলে।' সে বলল, 'চলো, কফি খাওয়া যাক।'

আমি কফি ঢাললাম। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে খুব অধৈর্য হয়ে উঠলাম। সেটা কিছুতেই চাপা দিতে পারছিলাম না। তাকে কফি দিয়ে আবারও বললাম, 'তাহলে?'

'তাহলে ব্যাপারটা হলো, আমার আসলে কিছুই মনে নেই।'

'কী? কিছুই মনে নেই? একটা কিছুও না?'

সে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর দুঃখের সঙ্গে জবাব দিল, 'না, কিছুই না।'

'কিন্তু তোমার নোট? ক্যামেরা? রেকর্ডিং মেশিন?'

নোটবুকটি ফাঁকা। ক্যামেরার রিলের ইন্ডিকেটর '১'-এ এসে স্থির হয়ে ছিল। ভবিষ্যতে যাত্রা শুরুর আগে আমরা ক্যামেরাটা ওখানেই সেট করেছিলাম। টেপটিরেকর্ডিং মেশিনে লোডও করা হয়নি।

'কিন্তু ওহ ঈশ্বর,' আমি প্রতিবাদ করলাম, 'কেন? এটা ঘটল কীভাবে? তোমার কি কিছুই মনে নেই?'

'আমার কেবল একটি ব্যাপার মনে আছে।'

'কী সেটা?'

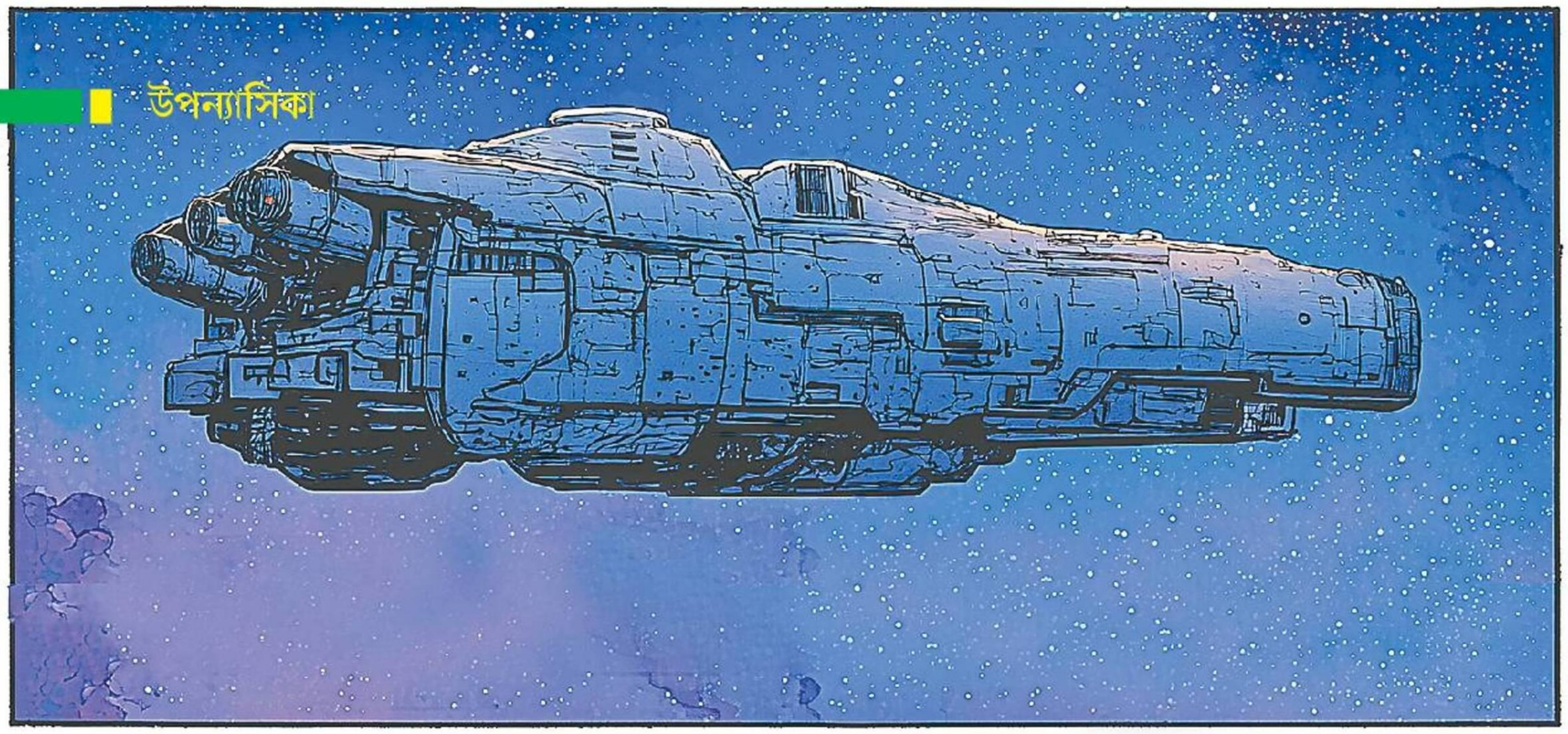
'আমাকে সবকিছু দেখানো হয়েছিল। কিন্তু এখানে ফিরে আসার পর আমার মনে রাখা উচিত কি না, সেই বিষয়ে আমাকে একটা অপশন বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।'

'আর তুমি মনে না রাখার সিদ্ধান্ত নিলে? কিন্তু এটা তো একটা অদ্ভুত ব্যাপার—'

সে জবাবে বলল, 'তাই নাকি?'

এআই আর্ট

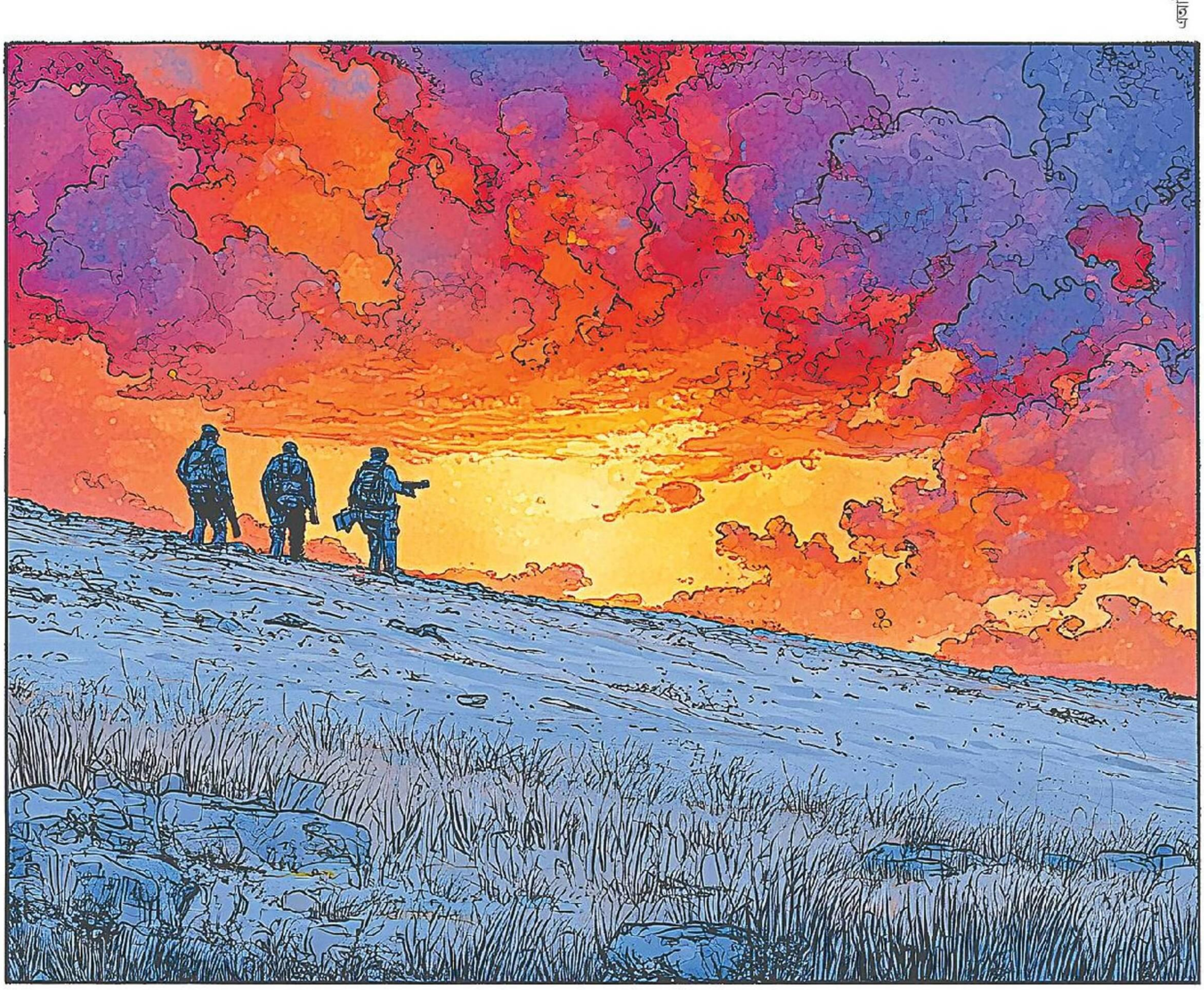
উপন্যাসিকা



দ্য কসমিক পোচার

মূল : ফিলিপ কে ডিক
অনুবাদ : হাসান খুরশীদ রুমী

এতাই আর্ট



'কী ধরনের মহাকাশযান এটা?' ভিউস্ক্রিনের দিকে স্থিরদৃষ্টে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন শুরে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর হাত কন্ট্রোল প্যানেলের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রক যন্ত্রগুলোকে সাবধানে স্পর্শ করে আছে।

নেভিগেটর নেলসন তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিলেন, 'এক মিনিট দাঁড়ান।' তিনি নিয়ন্ত্রণ ক্যামেরা ঘুরিয়ে মনিটর স্ক্রিন থেকে একটা ছবি তুলে নিলেন। ছবিটা ক্যামেরা থেকে বেরিয়ে আসতেই মেসেজ টিউব দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন চার্টরুমে।

'একটু অপেক্ষা করুন। বার্নসের কাছ থেকে সঠিক তথ্য পেয়ে যাব।'

'ওরা এখানে কী করছে? কী চায় ওরা? নিশ্চয়ই জানে যে সিরিয়াস সিস্টেমে চলাচল বন্ধ রয়েছে এখন।'

'ওই বেলুনের মতো দিকটা দেখেছেন?' নেলসন আঙুল দিয়ে স্ক্রিনে দেখিয়ে বললেন, 'এটা একটা মালবাহী মহাকাশযান। ওই ফোলানো অংশটা দেখুন। এটা ওদের কার্গো ক্যারিয়ার।'

'এটাও দেখুন।' ক্যাপ্টেন শুরে কন্ট্রোল প্যানেল থেকে এনলার্জার ঘুরিয়ে মহাকাশযানের ছবিটা বড় করলেন। 'ওই সারি সারি প্রজেকশনগুলো দেখেছেন?'

'হুম, তো?' জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

'ভারী মহাকাশ উপযোগী অস্ত্র। ডিপ স্পেস ফায়ারিংয়ের জন্য বসানো। এটা মালবাহী মহাকাশযান ঠিকই, তবে সশস্ত্র।'

'দস্যু হতে পারে?'

'হতে পারে।' শুরে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে আনমনে বললেন, 'মনে হচ্ছে, টেরায় একটা বার্তা পাঠিয়ে দিই।'

'কেন?'

'এটা হয়তো স্কাউট মহাকাশযান।'

নেলসনের চোখ একটু চকচক করে উঠল। 'তাহলে কি ওরা আমাদের পরীক্ষা করছে? কিন্তু আরও যদি থাকে, তা আমাদের স্ক্রিনে ধরা পড়ছে না কেন?'

'বাকিগুলো হয়তো আমাদের স্ক্যানারের রেঞ্জের বাইরে।'

'দুই আলোকবর্ষের বেশি দূরে? স্ক্রিন তো সর্বোচ্চ পাওয়ারে চালানো আছে। আর এগুলোই বর্তমান সময়কার সেরা ডিপ স্পেস স্ক্যানার স্ক্রিন।'

চার্টরুম থেকে ফিরতি বার্তা টিউব দিয়ে এসে টেবিলে পড়ল। ক্যাপ্টেন শুরে সেটা খুলে দ্রুত পড়ে ফেললেন। তারপর ওটা নেলসনের দিকে এগিয়ে দিলেন। 'নাও, দেখো।'

নেলসন পড়লেন, 'মহাকাশযানটা আদহারান ডিজাইন। প্রথম শ্রেণির, নতুন একটা মালবাহী গ্রুপের অংশ।' বার্নস নিজের হাতে একটা মন্তব্য লিখে পাঠিয়েছেন ফুটনোটে—'কিন্তু এটা সশস্ত্র হওয়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই ভারী অস্ত্রগুলো পরে যোগ করা হয়েছে। আদহারান মালবাহী মহাকাশযানে এসব সাধারণত থাকে না।'

'তাহলে এটা ফাঁদ নয়,' শুরে নিজের মনে বললেন। 'কিন্তু আদহারানের বিষয়টা কী? কেন ওদের মহাকাশযান সিরিয়াস সিস্টেমে থাকবে? টেরা তো বছরের পর বছর ধরে এই পুরো অঞ্চলটা বন্ধ রেখেছে। ওরা জানে যে এখানে বাণিজ্য নিষিদ্ধ।'

'আদহারানদের সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। একবার অল-গ্যালাক্সি ট্রেড কনফারেন্সে অংশ নিয়েছিল, ব্যস ওটুকুই।'

'তারা কোন জাতির?'

'আরাকনিড টাইপ। এই এলাকায় এ ধরনের জাতি অনেক আছে। এরা মূলত গ্রেট মুরজিম স্টেম থেকে এসেছে। মুরজিম মূল জাতির একটা ভেরিয়েন্ট। তারা বেশির ভাগ সময় নিজেদের নিয়েই থাকে। এদের জটিল সামাজিক কাঠামো আছে, খুব কঠিন নিয়মকানুন। অর্গানিক-স্টেট গ্রুপিং, হাইভ সিস্টেম।'

'তুমি আসলে বলতে চাইছ, ওরা পোকামাকড় ধরনের কিছু?'

'আসলে বলতে গেলে তা-ই। সেভাবে চিন্তা করলে আমাদেরও বাঁদরদের সঙ্গে তুলনা করা যায়।'

শুরে আবার ভিউস্ক্রিনের দিকে মনোযোগ দিলেন। ম্যাগনিফিকেশন কমিয়ে নজর রাখতে শুরু করলেন। স্ক্রিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদহারানের মহাকাশযানকে অনুসরণ করতে থাকল, যেন মহাকাশযানটা সব সময় স্ক্রিনের মাঝখানে থাকে।

মহাকাশযানটা ভারী ও কালো, টেরানদের সুন্দর গঠনের ক্রুজারের তুলনায় বেশ বিদঘুটে দেখতে। পেটভরা একটা পোকার মতো মোটাসোটা, গাঢ় কালো, প্রায় গোলাকৃতির। যখন মহাকাশযানটা সিরিয়াস সিস্টেমের বাইরের দিকের গ্রহের দিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল, তখন মাঝেমধ্যে এক পাশে গাইড লাইট জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছিল।

একসময় স্টার সিস্টেমের দশম গ্রহের কক্ষপথে প্রবেশ করল ওটা, তারপর গ্রহে অবতরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থান নিতে শুরু করল। গতি কমানোর ব্রেক জেটগুলো ঝলসে উঠল লাল আলোয়। পেটমোটা একটা পোকার মতো মহাকাশযান ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগল গ্রহটার পৃষ্ঠের দিকে।

'ওরা নামছে,' নেলসন ফিসফিস করে বললেন।

'ঠিক আছে। মাটিতে স্থির হয়ে থাকবে। আমাদের জন্য একদম উপযুক্ত টার্গেট।'

দশম গ্রহের পৃষ্ঠে আদহারানের মালবাহী মহাকাশযানটা এসে থামল, নিস্তব্ধ হয়ে গেল এর জেটগুলো। কালো ধোঁয়ার সঙ্গে ওপরে উঠতে লাগল একগাদা নির্গত কণা।

মহাকাশযানটা দুই পাহাড়শ্রেণির মাঝখানে ধূসর বালুর এক বিরানভূমিতে অবতরণ করেছে। দশম গ্রহের পৃষ্ঠ একেবারেই অনুর্বর। সেখানে কোনো জীবন, বায়ুমণ্ডল বা পানি—কিচ্ছু নেই। গ্রহটার বেশির ভাগই পাথুরে—ঠান্ডা, ধূসর পাথর। বিশাল ছায়া আর খাদ, ক্ষয়প্রাপ্ত এবং অমঙ্গলের মতো এক নিষ্ঠুর বিবর্ণ ভূমি।

হঠাৎ যেন আদহারানের মহাকাশযানটা জীবন্ত হয়ে উঠল। হ্যাচগুলো খুলে গেল, মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল ছোট ছোট কালো বিন্দু। বিন্দুগুলোর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে লাগল, যেন একঝাঁক কালো কণা বালুর ওপর ছুটে চলেছে। কয়েকটা পাহাড়ে পৌঁছে খাদ আর চূড়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাকিগুলো দূরের দিকে ছুটে গিয়ে হারিয়ে গেল দীর্ঘ ছায়ায়।

'ধুর, কিছুতেই এটা মাথায় ঢুকছে না,' ক্যাপ্টেন শুরে বিরক্তির সুরে বললেন। 'ওরা কী খুঁজছে? আমরা তো এই গ্রহগুলো খুঁটিয়ে দেখেছি। এখানে তো কারও আগ্রহ জাগার মতো কিছু কিছু নেই।'

'ওদের চাওয়া আমাদের থেকে আলাদা হতে পারে বা ওদের খোঁজার পদ্ধতিও সম্ভবত আমাদের চেয়ে আলাদা।'

শুরে সতর্ক হয়ে উঠলেন। 'ওই দেখো, ওদের গাড়িগুলো মহাকাশযানের দিকে ফিরছে।'

কালো বিন্দুগুলো আবার দেখা গেল, বেরিয়ে আসছে ছায়া আর খাদ থেকে। বালুর ওপর দিয়ে ছুটে মাদারশিপের দিকে ফিরে যাচ্ছে। হ্যাচগুলো খুলে গেল আবার, একে একে গাড়িগুলো মহাকাশযানে ঢুকতে শুরু করল, অদৃশ্য হয়ে গেল। দেরি করে আসা কিছু গাড়িও মহাকাশযানে ঢুকে গেল। তারপর বন্ধ হয়ে গেল হ্যাচগুলো।

'ওরা কী খুঁজে পেল, সেটাই তো বুঝতে পারছি না,' শুরে বললেন।

কমিউনিকেশন অফিসার বার্নস কন্ট্রোল রুমে ঢুকলেন, গলা উঁচিয়ে বললেন, 'ওরা এখনো নিচে আছে? আমাকে

একবার দেখতে দাও। আদহারানের মহাকাশযান আমি কখনো দেখিনি।'

গ্রহপৃষ্ঠে আদহারানের মহাকাশযানটা নড়তে শুরু করল। থরথর করে কাঁপতে শুরু করল ওটা। পৃষ্ঠ থেকে উঠে দ্রুত নিজের উচ্চতা বাড়িয়ে চলে এল মহাকাশে। এরপর তাদের দেখা গেল নবম গ্রহের দিকে রওনা দিতে। কিছুক্ষণ নবম গ্রহের চারপাশ চক্কর দিল, পর্যবেক্ষণ করল নিচের ক্ষয়ে যাওয়া, খাদযুক্ত পৃষ্ঠ। শুকিয়ে যাওয়া মহাসাগরের শূন্য তলদেশগুলো ছড়িয়ে আছে অনেক দূরে দূরে। আদহারানের মহাকাশযান সে রকম একটা তলদেশ বেছে নিয়ে সেখানে অবতরণ করল। আবার আকাশে উড়ছে ধোঁয়ার মেঘ।

'আবার একই কাণ্ড,' শুরে নিচু গলায় বললেন।

হ্যাচগুলো খুলে গেল। ছোট ছোট কালো বিন্দু লাফিয়ে বেরিয়ে এল পৃষ্ঠে, আগের মতোই আবারও ছুটে গেল চারদিকে।

শুরের চোয়াল রাগে শক্ত হয়ে উঠল। 'আমাদের জানতে হবে, ওরা কী খুঁজছে। দেখো কেমন ছুটছে! ওরা স্পষ্ট জানে, কী করছে।' তিনি কমিউনিকেশন মাইক তুলে নিলেন, তারপর আবার নামিয়ে রাখলেন। 'আমরা নিজেরাই সামলাতে পারব। টেরার সাহায্য লাগবে না।'

'মহাকাশযানটা সশস্ত্র, এ কথা ভুলে গেলে চলবে না।'

'আমরা ওদের পরেরবার অবতরণের সময় ধরে ফেলব। ওরা প্রতিটা গ্রহে থামছে, এখন আছে পঞ্চম গ্রহে। আমরা সরাসরি চতুর্থ গ্রহে যাব।' শুরে দ্রুত নির্দেশপত্র টেনে নিয়ে এলেন। 'যখন চতুর্থ গ্রহে নামবে, আমরা ওখানেই থাকব।'

'ওরা হয়তো লড়াই করবে,' সতর্ক করলেন নেলসন।

'হতে পারে; কিন্তু আমাদের এটা জানতে হবে, ওরা কী নিয়ে যাচ্ছে—যত যা-ই হোক, সেটা আমাদের জানতেই হবে।'

সিরিয়াস সিস্টেমের চতুর্থ গ্রহে মানুষের উপযুক্ত বায়ুমণ্ডল আছে, সঙ্গে আছে কিছু পরিমাণে পানি। ক্যাপ্টেন শুরে তাঁর ক্রুজারটা একটা প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষে নামালেন। জায়গাটা বহুদিন ধরেই পরিত্যক্ত।

আদহারানের মালবাহী মহাকাশযান এখনো হাজির হয়নি। শুরে আকাশ স্ক্যান করে নিশ্চিত হয়ে মেইন হ্যাচ উন্মুক্ত করলেন। বার্নস, নেলসন ও তিনি শক্তিশালী স্লেম রাইফেল হাতে বাইরে পা রাখলেন সতর্কতার সঙ্গে। তাঁদের পেছনে হ্যাচটা বন্ধ হয়ে গেল, আর ক্রুজারটা উঠে গেল আকাশে।

তাঁরা রাইফেল হাতে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ক্রুজারটাকে আকাশে উড়ে যেতে দেখছিলেন। শীতল, হালকা বাতাস গায়ে এসে লাগছে, যেন তাঁরা কোনো সুউচ্চ পর্বতের চূড়ায় দাঁড়িয়ে। এর মধ্যেও অনুভব করতে পারছেন, কেমন করে তেজি বাতাস তাঁদের প্রেশার স্যুটের চারপাশে ঘুরছে।

বার্নস তাঁর স্যুটের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। 'গ্রহটা আমার জন্য মনে হচ্ছে একটু বেশিই ঠান্ডা।'

'এটা মনে করিয়ে দেয়, আমরা এখনো টেরান,' নেলসন বললেন। 'যদিও বাড়ি থেকে আলোকবর্ষ দূরে।'

'পরিকল্পনাটা ওটাই,' ক্যাপ্টেন শুরে বললেন। 'আমরা তো আর ওদের উড়িয়ে দিতে পারব না, কাজেই সেটা বাদ। আমরা আসলে ওদের কার্গো চাই। যদি ওদের উড়িয়ে দিতেই হয়, তাহলে কার্গোও উড়ে যাবে।

'তাহলে কী ব্যবহার করব?'

'একটা ভ্যাপোর ক্লাউড বিস্ফোরক ছুড়ে দেওয়া যায়।'

'ভ্যাপোর ক্লাউড বিস্ফোরক? কিন্তু ক্যাপ্টেন...'

'ক্যাপ্টেন,' নেলসন আপত্তি করলেন, 'আমরা ওই বিস্ফোরক ব্যবহার করতে পারি না। ওদের মহাকাশযান থেকে বের হওয়া সেই কালো ধোঁয়া নিষ্ক্রিয় না হওয়া পর্যন্ত আমরা ওদের কাছেও যেতে পারব না।'

'এই গ্রহে বাতাস আছে। ভ্যাপোর এজেন্ট দ্রুত ছড়িয়ে যাবে। আর যা-ই হোক, আমাদের এটাই করতে হবে। ঝুঁকি নিতেই হবে। আদহারানদের দেখা পাওয়ামাত্র গুলি চালাতে হবে।'

'যদি সেই বিস্ফোরক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়?'

'তাহলে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে।' শুরে আকাশের দিকে গভীর মনোযোগে তাকালেন। 'আমার মনে হয়, ওরা আসছে। চলুন।'

তাঁরা ছুটে গেলেন পাথরের স্তূপের আড়ালে, যেখানে ধ্বংসাবশেষ আর ধুলাবালুতে ডুবে আছে স্তম্ভ আর টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ, জমে আছে বড় বড় ঢিবির মতো।

'এতেই হবে,' শুরে বললেন। তিনি নুয়ে পড়লেন, স্লেম রাইফেল শক্ত করে ধরে আছেন। 'প্রস্তুত হও, ওরা এসে গেছে।'

আদহারানের মহাকাশযানটা তাঁদের মাথার ওপরে। কাছাকাছি কোথাও অবতরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। জেটগুলো গর্জে উঠল, নির্গমন কণা ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। প্রচণ্ড গর্জন করে মাটিতে আঘাত করে সামান্য লাফিয়ে উঠে শেষে স্থির হলো মহাকাশযানটা।

শুরে তাঁর কমিউনিকেশন মডিউলে জানালেন, 'ঠিক আছে, আক্রমণ শুরু করতে পারো।'

তাঁদের মাথার ওপর আকাশে ক্রুজারটা দেখা দিল, ঝাঁপিয়ে পড়ল আদহারান মহাকাশযানের ওপর দিয়ে। ক্রুজার থেকে একটা নীল-সাদা মেঘ বেরিয়ে এল, প্রেশার জেট দিয়ে বের হয়ে সরাসরি আঘাত করল আদহারান কালো মহাকাশযানে। মেঘটা পার্ক



আদহারানের মালবাহী মহাকাশযান এখনো হাজির হয়নি। শুরে আকাশ স্ক্যান করে নিশ্চিত হয়ে মেইন হ্যাচ উন্মুক্ত করলেন। বার্নস, নেলসন এবং তিনি শক্তিশালী স্লেম রাইফেল হাতে বাইরে পা রাখলেন সতর্কতার সঙ্গে

করা ফ্রেইটারটাকে ঘিরে ধরল, ধীরে ধীরে সেটার গা ঘেঁষে ছড়িয়ে গেল চারপাশে।

আদহারান মহাকাশযানের বাইরের অংশ একটু উজ্জ্বল হলো, তারপর যেন গলে গলে পড়তে শুরু করল, ভ্যাপোর অস্ত্রের প্রভাবে ক্ষয়ে যাচ্ছে যেন। টেরান ক্রুজারটা দ্রুত তার কাজ শেষ করে আকাশে মিলিয়ে গেল।

আদহারান মহাকাশযান থেকে ফিগারগুলো বেরিয়ে আসতে লাগল, লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। লম্বা পা নিয়ে তারা সব দিকে ছোটাছুটি করছিল, দিশাহারা ভঙ্গিতে লাফালাফি করছিল। বেশির ভাগই তাদের মহাকাশযানে ফিরে গেল, পাইপ আর বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে, মহাকাশের চারপাশে ছড়িয়ে পড়া বাষ্প মেঘের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, বেরিয়ে আসছে।

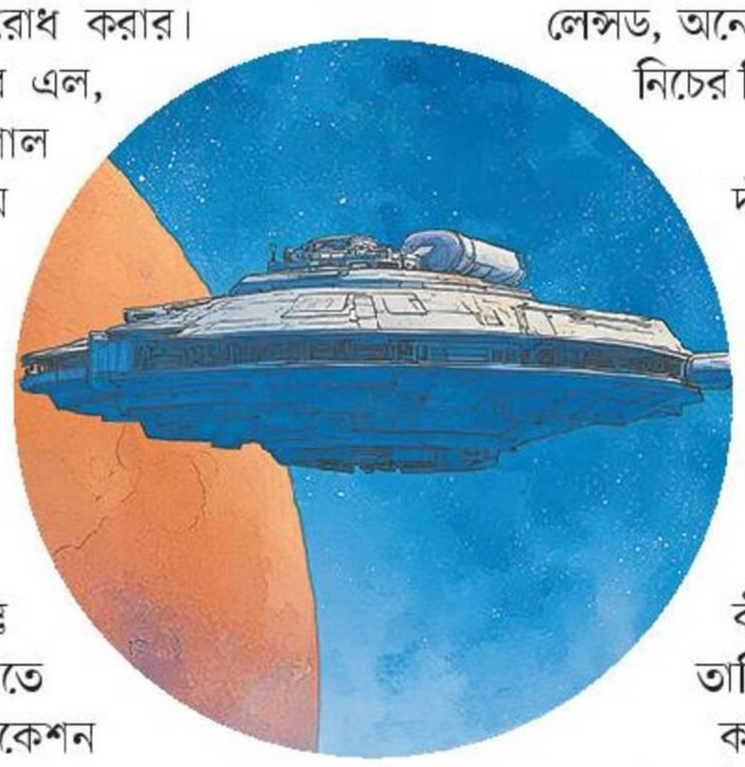
'ওরা কিছু একটা স্প্রে করছে।'

আরও আদহারান বেরিয়ে এল, মরিয়া হয়ে লাফালাফি করছে—কেউ মহাকাশযানে, কেউ মাটিতে, কেউ এদিকে, কেউ ওদিকে, সব মিলে একটা এলোমেলো অবস্থা।

'পিঁপড়ার ঢিবি তছনছ করে দেওয়া হলে এমনই হয়।' বার্নস ফিসফিস করে বললেন।

আদহারান মহাকাশযানের ওপর ওরা সবাই চড়ে আছে নিজেদের জান বাঁচাতে। মরিয়া হয়ে কিছু একটা স্প্রে করছে, চেষ্টা চালাচ্ছে মহাকাশযানের ক্ষয় রোধ করার।

তখনই টেরান ক্রুজারটা আবার ফিরে এল, আকাশের একটা বিন্দু থেকে বিশাল আকার ধারণ করল, সূর্যের আলোয় ঝলমল করতে করতে সেটাকে দেখাতে লাগল একটা সুচের মতো।



আদহারান ফ্রেইটারটার ভারী অস্ত্রের সারি মরিয়া হয়ে ভেতর থেকে উঠে এল, দ্রুতগতির ক্রুজারের দিকে নিশানা করার চেষ্টা করছে।

'কাছাকাছি বোমা ফেলো, কিন্তু সরাসরি আঘাত কোরো না। কার্গো বাঁচাতে হবে,' ক্যাপ্টেন শুরে আবার কমিউনিকেশন মডিউলে নির্দেশ দিলেন।

ক্রুজারের বাইরে আটকে থাকা বোমাগুলো খুলে নিচে পড়তে থাকল। দুটি বোমা নেমে এল, নিখুঁত বাঁক নিয়ে নিচে গড়াচ্ছে। আদহারানদের ফ্রেইটারের সঙ্গে দুই পাশ থেকে একটু দূরত্ব রেখে মাটিতে আঘাত করল। বিশাল পরিমাণে পাথর, ধুলা আর ধ্বংসাবশেষের মেঘ ওপরে উঠতে লাগল, ঢেকে দিল ফ্রেইটারটাকে। কালো মহাকাশযানটা কেঁপে উঠল, যেসব আদহারান মহাকাশযানের বাইরে থেকে কাজ করছিল, তারা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

মহাকাশযানের ভারী অস্ত্রের সারি কয়েকটা দুর্বল শট নেওয়ার চেষ্টা করল; কিন্তু ততক্ষণে ক্রুজার দ্রুত সামনে এগিয়ে গিয়ে আবার মিলিয়ে গেল আকাশে।

নেলসন ফিসফিস করলেন, 'ওদের কোনো সুযোগ নেই। হালের স্প্রে শেষ হওয়ার আগে ওরা মাটি ছেড়ে উঠতে পারবে না।'

বেশির ভাগ আদহারান এখন মহাকাশযান ছেড়ে পালাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

'ওরা মোটামুটি শেষ,' শুরে বললেন। ধ্বংসাবশেষের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে এলেন তিনি। 'চলো, এখন দেখা যাক।'

একটা সাদা ফ্লেয়ার আদহারানদের দিক থেকে উঠে এল, আকাশে উড়ে উড়ে স্পার্ক ছড়িয়ে দিল সেটা। আদহারানরা দিশাহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। ওরা হঠাৎ এই আক্রমণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। মহাকাশযান ঘিরে গ্যাসের কুণ্ডলী প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। ফ্লেয়ারটা ছিল তাদের আত্মসমর্পণের চিহ্ন।

ক্রুজার তখনো আকাশে ফ্রেইটারের ওপরে চক্কর কাটছিল, ক্যাপ্টেন শুরের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।

'ওদের দেখো,' বার্নস বললেন। 'পোকামাকড়, অথচ মানুষ সাইজের।'

'চলো!' শুরে বিরক্ত হয়ে বললেন। 'দেখি, ভেতরে কী আছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।'

আদহারান কমান্ডার তাদের মহাকাশযানের বাইরে এসে দেখা করল। সে তাদের দিকে এগিয়ে এল, আক্রমণের ধাক্কায় যেন কিছুটা হতবাক।

নেলসন, শিওর আর বার্নস তাকিয়ে রইলেন, মনের ভেতর একরকম অস্বস্তি কাজ করছিল। 'ঈশ্বর!' বার্নস বিড়বিড় করলেন। 'তাহলে এরা এমন দেখতে!'

আদহারান কমান্ডার প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা, কালো চিটিনের শক্ত খোলসে ঢাকা। চারটি চিকন পা, শরীরের মাঝখানে দুটি পা অনিশ্চিতভাবে দুলছে। একটা ঢিলেঢালা বেল্ট পরা, যেখানে তার অস্ত্র আর অন্যান্য সরঞ্জাম ঝুলছে। চোখগুলো জটিল, মাল্টি-লেন্সড, অনেকটা মাছির মতো। মাথার লম্বা আকৃতির নিচের দিকে একটা সরু মুখ, কান নেই।

কমান্ডারের পেছনে কয়েকজন ক্রু দাঁড়িয়ে ছিল, কেউ কেউ অস্ত্রের নল অর্ধেক তুলে আছে। আদহারান কমান্ডার তার মুখ দিয়ে একটা ধারালো ক্লিকের শব্দ করল, অ্যানটেনা নাড়াল। অন্য আদহারানরা নিচু করেছে তাদের অস্ত্র।

'এই জাতির সঙ্গে যোগাযোগ কীভাবে সম্ভব?' বার্নস নেলসনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

ক্যাপ্টেন শুরে এগিয়ে গেলেন। 'তা দরকার নেই। ওদেরকে আমাদের কিছু বলার নেই। ওরা জানে, ওরা এখানে বেআইনিভাবে এসেছে। আমাদের শুধু ওদের কার্গো চাই।'

ক্যাপ্টেন শুরে আদহারান কমান্ডারকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। গ্রুপটা তাঁকে পথ ছেড়ে দিল। নেলসন আর বার্নস তাঁর পেছন-পেছন মহাকাশযানে ঢুকলেন।

আদহারান মহাকাশযানের ভেতরটা ভেজা আর কর্দমাক্ত। সব জায়গায় থকথকে জেলির মতো কিছু একটা ঝুলছে, একটা বিচ্ছিরি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। সরু আর অন্ধকার করিডরগুলো যেন দীর্ঘ সুড়ঙ্গ। মেঝে পিচ্ছিল, পা ফসকানোর সমূহ আশঙ্কা আছে। অন্ধকারে কয়েকজন ক্রু দৌড়ঝাঁপ করছে, তাদের নখর আর অ্যানটেনা ভয়ভীতি প্রকাশের মতো কাঁপছে। শুরে তাঁর লাইট জ্বালিয়ে এক করিডরের দিকে তাকালেন।

'এই পথে চলো। এটা মনে হচ্ছে প্রধান পথ।'

আদহারান কমান্ডার তাঁদের ঠিক পেছনেই ছিল। শুরে তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন। বাইরে ক্রুজার কাছাকাছি জায়গায় নেমে এসেছে। নেলসন দেখতে পেলেন, টেরান সৈনিকেরা মাটিতে দাঁড়িয়ে, পরের নির্দেশের অপেক্ষায়।'

তাঁদের সামনে একটা ধাতব দরজা করিডর বন্ধ করে রেখেছে। শুরে দরজার দিকে ইঙ্গিত করলেন, হাত দিয়ে খোলার সংকেত দিলেন।

'এটা খোলো।'

আদহারান কমান্ডার পেছন দিকে সরে গেল, দরজা খোলার কোনো চেষ্টাই করল না। আরও কয়েকজন আদহারান ভিড় করে এল, সবার হাতে অস্ত্র। ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছে, এদিকে কাউকে আসতে দিতে তারা একদমই ইচ্ছুক নয়।

'এখনো ওরা লড়াই করতে পারে,' নেলসন শান্তভাবে সতর্ক করে বললেন।

শুরে তাঁর স্লেম রাইফেল তুলে দরজার দিকে তাক করলেন। 'আমাকে মনে হচ্ছে এটা উড়িয়ে দিতে হবে।'

আদহারানরা উত্তেজিত হয়ে ক্লিক শব্দ করল। কেউই দরজার কাছে এল না।

'ঠিক আছে তাহলে!' শুরে কঠিন স্বরে বললেন। তিনি গুলি চালালেন, দরজাটা ধোঁয়া তুলে ধ্বংস হয়ে গেল। দরজার জায়গায় একটা বড় ফাঁকা জায়গা তৈরি হলো, যেখানে দিয়ে ভেতরে ঢোকা সম্ভব। আদহারানরা দিশাহারা হয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল, নিজেদের মধ্যে ক্লিক ক্লিক করে কথা বলছে। আরও আদহারান বাইরে থেকে ছুটে এসে মহাকাশযানে ঢুকল, তিন টেরানের চারপাশে ভিড় করে আছে।

'চলো,' শুরে ফাঁকা জায়গা দিয়ে ঢুকে গেলেন। নেলসন আর বার্নস তাঁর পেছন-পেছন ঢুকলেন, স্লেম রাইফেল রেডি অবস্থায়। কে জানে কী আছে এর ভেতরে।

পথটা নিচের দিকে নেমে যাচ্ছিল। বাতাস ভারী আর থমথমে। পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা দেখলেন আদহারানরা পেছন থেকে ভিড় করছে।

'পেছনে যাও।' শুরে ঘুরে দাঁড়ালেন, তাঁর রাইফেল তাক করলেন ওদের দিকে। আদহারানরা থেমে গেল। 'তোমরা বরং পিছিয়েই থাকো, ওটাই তোমাদের জন্য ভালো হবে।' নিজের সঙ্গীদের ইঙ্গিত করলেন তিনি, 'চলো, আমরা সামনে এগোই।'

টেরানরা মোড় ঘুরলেন। তাঁরা এখন মহাকাশযানের কার্গো হোল্ডের কাছাকাছি। শুরে সতর্ক পায়ে সামনে এগোলেন, প্রতিটা পদক্ষেপে সাবধান। কয়েকজন আদহারান প্রহরী তাদের অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে ছিল।

'সরে দাঁড়াও।' শুরে তাঁর স্লেম রাইফেল তুলে নির্দেশ দিলেন কঠিন স্বরে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রহরীরা পথ ছাড়ল। 'চলো!'

প্রহরীরা সরে দাঁড়াল। শুরে সামনে এগোলেন, তারপর হঠাৎ থেমে গেলেন, বিস্ময়ে হতবাক।

তাঁদের সামনে ছিল মহাকাশযানের কার্গো। হোল্ডের অর্ধেকজুড়ে স্তূপ করা ছিল দুধের মতো উজ্জ্বল বিশাল সব রত্ন, যেন অতিকায় মুক্তা। হাজার হাজার রত্ন। যত দূর চোখ যায়, শুধু রত্ন। মহাকাশযানের গহিনে হারিয়ে যাওয়া অগণিত স্তূপ। এগুলো থেকে বের হচ্ছিল নরম এক আলোর আভা, যেন নিজেরাই আলো ছড়াচ্ছে। পুরো হোল্ড উজ্জ্বল হয়ে ছিল সেই আলোয়।

'অবিশ্বাস্য!' শুরে বিড়বিড় করলেন।

'এমন জিনিসের জন্য এরা বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়ার ঝুঁকি নিতেই পারে,' বার্নস গভীর শ্বাস নিয়ে বললেন, তাঁর চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে গেছে। 'আমিও হয়তো একই কাজ করতাম। দেখো একবার!'

'বেশ বড়সড়, তা-ই না?' নেলসন মন্তব্য করলেন।

তাঁরা একে অপরের দিকে তাকালেন।

'এমন কিছু আমি জীবনেও দেখিনি,' ক্যাপ্টেন শুরে যেন হতবুদ্ধি। আদহারান প্রহরীরা সতর্ক চোখে তাদের দেখছিল, অস্ত্র তাক করা। শুরে এগিয়ে গেলেন রত্নের প্রথম সারির দিকে, যেগুলো মাপজোখ করে নিখুঁতভাবে স্তূপ করে রাখা।

'এটা বিশ্বাস করাই কঠিন। রত্নগুলো স্তূপ করা আছে যেন...যেন কোনো গুদামে খাদ্যশস্য রাখা!'

'হয়তো কখনো এগুলো আদহারানদেরই ছিল,' নেলসন ভেবে বললেন। 'হয়তো সিরিয়াস সিস্টেমের নগর নির্মাতারা এগুলো চুরি করেছিলেন। এখন হয়তো আদহারানরা সেগুলো ফেরত নিচ্ছে।'

'মজার ব্যাপার,' বার্নস বললেন। 'হয়তো এভাবে এত সহজে খুঁজে পাওয়ার কারণও সেটাই। হয়তো এ নিয়ে তাদের কাছে পুরোনো কোনো চার্ট বা মানচিত্র ছিল।'

শুরে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ঘটনা যা-ই হোক, এখন এগুলো আমাদের। সিরিয়াস সিস্টেমের সবকিছুই টেরার সম্পত্তি। সবকিছু চুক্তি মোতাবেক আমাদের হয়ে গেছে।'

'কিন্তু যদি এগুলো সত্যিই আদহারানদের থেকে চুরি করা হয়ে থাকে?'

'তাহলে তাদের উচিত ছিল না ক্লোজড-সিস্টেম চুক্তিতে সই করা। তাদের নিজের সিস্টেম আছে। আমাদেরও আছে। এখন এটা টেরার সম্পত্তি।'

শুরে একটার দিকে হাত বাড়ালেন, 'ধরে দেখি কেমন।'

'সাবধান ক্যাপ্টেন। হয়তো এটা রেডিওঅ্যাকটিভ।'

শুরে রত্নগুলোর একটাতে হাত ছোঁয়ালেন।

অমনি চারপাশ থেকে আদহারানরা তাকে ধরে ছিটকে ফেলে দিল। শুরে লড়াই করার চেষ্টা করলেন, এক আদহারান তাঁর স্লেম রাইফেল ধরে মুচড়ে হাত থেকে কেড়ে নিল।

বার্নস গুলি চালালেন। একদল আদহারান মুহূর্তেই গায়েব হয়ে গেল অস্ত্রের আঘাতে।

নেলসন হাঁটু গেড়ে বসে পেছনের প্যাসেজের দিকে গুলি চালাচ্ছিলেন, তারা সেই দিক দিয়েই মহাকাশযানের পেটের ভেতরে ঢুকেছে। প্যাসেজ আদহারানদের ভিড়ে ঠাসা। কিছু আদহারান পাল্টা গুলি চালাচ্ছিল। সরু কিন্তু শক্তিশালী রশ্মি নেলসনের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল।

'ওরা আমাদের কিছু করতে পারবে না,' বার্নস হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন। 'রত্নগুলোর জন্য গুলি চালাতে ভয় পাচ্ছে।'

শুরে নেলসনের রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে আদহারানদের আরও একটা দলকে গুঁড়িয়ে দিলেন। আদহারানরা এখন কার্গো হোল্ডের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। ভারী ধাতব প্লেটগুলো টেনে এনে দ্রুত ওয়েল্ড করে সিল করে দিচ্ছিল।

'একটা ছিদ্র করো!' শুরে চেঁচিয়ে উঠলেন। তিনি মহাকাশযানের দেয়ালে গুলি চালাল। 'ওরা আমাদের এখানে আটকে রাখার চেষ্টা করছে, আমাদের কোনোভাবে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।'

বার্নস তাঁর বন্দুক দিয়ে দেয়ালে গুলি চালালেন। দুই স্লেম রাইফেলের মিলিত শক্তি মহাকাশযানের দেয়াল গলিয়ে ফেলল। হঠাৎ দেয়ালটা ভেঙে পড়ল, তাতে একটা গোলাকার ছিদ্র তৈরি হলো। সেটা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

মহাকাশযানের বাইরে টেরান সৈন্যরা আদহারানদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। আদহারানরা পিছু হটছিল, যতটা পারছিল চেষ্টা করছিল পালিয়ে যাওয়ার। কেউ গুলি চালাচ্ছিল, কেউ লাফিয়ে নিজের মহাকাশযানে উঠে যাচ্ছিল। অন্যরা বন্দুক ফেলে পালাচ্ছিল, চারপাশে দিশাহারা হয়ে ছোটাছুটি করছিল আর ক্লিক ক্লিক করছিল অদ্ভুত শব্দে।

পার্ক করা ক্রুজারের ভারী বন্দুকগুলো ধীরে ধীরে হ্যাচের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। গুলি চালানোর জন্য প্রস্তুত।

'গুলি কোরো না,' শুরে কমিউনিকেশন মডিউলে আদেশ দিলেন। 'ওদের মহাকাশযানে আক্রমণ করার দরকার নেই।'

'ওরা শেষ,' হাঁপাতে হাঁপাতে নেলসন বললেন, মহাকাশযান থেকে মাটিতে লাফিয়ে নামলেন তিনি। শুরে আর বার্নসও তাঁর পেছন-পেছন ওই মহাকাশযান থেকে নেমে এলেন। 'ওদের কোনো সুযোগ নেই। ওরা লড়তে জানে না।'

শুরে একদল টেরান সৈন্যকে নিজের কাছে ডাকলেন। 'এই দিকে এসো! তাড়াতাড়ি, দেরি কোরো না।'

মহাকাশযানের ভেতর থেকে দুধসাদা রত্নগুলো গড়িয়ে মাটিতে পড়ছিল। গোলাকার রত্নগুলো গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক গড়িয়ে চলছিল, পায়ের তলায় এসে পড়ছিল। রত্নগুলো ধরে রাখা কাঠামোর একটা অংশ সম্ভবত গোলাগুলিতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তাই সেগুলো ছড়িয়ে পড়ছে।

বার্নস একটা রত্ন তুলে নিলেন। মোটা দস্তানা ভেদ করে হাতে হালকা তাপ অনুভূত হচ্ছে, আঙুলে কেমন যেন ঝিমঝিম ভাব। তিনি সেটা আলোয় ধরে দেখলেন। গোলকটা অস্বচ্ছ। ভেতরে দুধসাদা আগুনের মধ্যে অস্পষ্ট আকৃতিগুলো ভাসছে, একদিক থেকে অন্যদিকে ঘুরছে। গোলকটা যেন প্রাণবন্ত, আলো দিচ্ছে, মৃদু স্পন্দন করছে।

নেলসন হেসে বললেন, 'দেখতে চমৎকার, তা-ই না?'

'দারুণ!' বার্নস আরেকটা তুলে নিলেন। এদিকে মহাকাশযানের ওপর থেকে এক আদহারান তাঁর দিকে গুলি চালাল, কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হলো না; বরং সে-ই এক টেরান সেনার গুলিতে উল্টে পড়ল। 'সব কটি দেখো। হাজার হাজার হবে।'

'আমাদের একটা বাণিজ্যিক মহাকাশযান আনতে হবে সব নিয়ে যাওয়ার জন্য,' শুরে বললেন। 'সবটা লোড করিয়ে টেরায় পাঠানো না হওয়া পর্যন্ত আমি শান্তি পাব না।'

ততক্ষণে যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল। যে কজন আদহারান বেঁচে ছিল, তাদের টেরান সৈন্যরা ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

'ওদের কী করা হবে?' নেলসন জিজ্ঞাসা করলেন।

শুরে কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি একটার পর একটা রত্ন হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলেন। 'দেখো তো কাণ্ড!' তিনি ফিসফিস করলেন। 'একেক পাশ থেকে ধরলে আলাদা রং বের হয়। এমন কিছু আগে দেখেছ?'

***

টেরানের বড় মালবাহী মহাকাশযানটা ধীরে ধীরে অবতরণ করল। লোডিং হ্যাচগুলো খুলে গেল। মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে এল ছোট ছোট মালবাহী গাড়িগুলোর সারি। এই গাড়িগুলো আদহারানদের মহাকাশযানের দিকে এগিয়ে গেল। নিচু সিঁড়ি নেমে গেল, কর্মী রোবট স্কুপগুলো কাজে নামার জন্য প্রস্তুত।

'তুলে নাও সব,' সিলভেনাস ফ্রাই বললেন। ক্যাপ্টেন শুরের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। টেরান এন্টারপ্রাইজেসের ম্যানেজার তাঁর লাল রুমাল দিয়ে কপাল মুছলেন। 'অসাধারণ শিকার ধরেছেন, ক্যাপ্টেন। দারুণ আবিষ্কার, হে হে।' তিনি ঘামে ভেজা হাত বাড়িয়ে দিলেন, আর ক্যাপ্টেন শুরে হাত মেলালেন।

'বুঝতে পারছি না, আমরা এটা মিস করলাম কীভাবে,' শুরে বললেন। 'আদহারানরা ঢুকে সব নিয়ে গেল। আমরা দেখেছি ওদের এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যেতে, যেন মধু খোঁজা মৌমাছির দল। আমাদের টিমগুলো এটা খুঁজে পায়নি কেন?'

ফ্রাই কাঁধ ঝাঁকালেন। 'তাতে কীই-বা যায়-আসে?' তিনি একটা রত্ন হাতে নিলেন, বাতাসে ছুড়ে দিলেন, আবার ধরে ফেললেন। 'আমি কল্পনা করতে পারছি, আজ থেকে ছয় মাসের মধ্যে টেরার প্রত্যেক নারীর গলায় এটা থাকবে অথবা প্রত্যেক নারী চাইবে এ রকম একটার মালিক হতে। তখন ওরা ভাববে, এগুলো ছাড়া আগে বাঁচত কীভাবে। মানুষ এমনই, ক্যাপ্টেন।' রত্নটা নিজের ব্রিফকেসে ঢুকিয়ে রাখলেন। 'আমি ভাবছি, একটা নিয়ে বাসায় আমার স্ত্রীকে দেব।'

এক টেরান সৈন্য আদহারান কমান্ডারকে ধরে ক্যাপ্টেন শুরের সামনে নিয়ে এলেন। কমান্ডার চুপ করে দাঁড়িয়ে, কোনো শব্দ করছেন না। যে কজন আদহারান বেঁচে ছিল, তাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের নিজেদের মহাকাশযান মেরামতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারা মহাকাশযানের হাল মেরামত করছিল, কাজের অগ্রগতি দেখে মনে হচ্ছিল যে বেশির ভাগ ক্ষয়ক্ষতি ঠিক করে ফেলেছিল।

'তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি,' আদহারান কমান্ডারকে শুরে বললেন। 'আমরা চাইলে তোমাদের জলদস্যু হিসেবে বিচার করে মেরে ফেলতে পারতাম; কিন্তু এর কোনো মানে হয় না। তোমাদের সরকারকে বলো, সিরিয়াস সিস্টেম থেকে দূরে থাকতে।'

'ও তো কিছুই বুঝতে পারছে না,' বার্নস হেসে বললেন।

'জানি, এটা শুধুই নিয়ম রক্ষার জন্য বলা। তবে আশা করি, ও মূল বিষয়টা বুঝতে পারছে।'

আদহারান কমান্ডার চুপচাপ দাঁড়িয়ে, চলে যাওয়ার অপেক্ষায়।

'ব্যস, এটুকুই। 'শুরে বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত নাড়ালেন আদহারান মহাকাশযানের দিকে। 'যাও, ওঠো। এখান থেকে সরে পড়ো। আর ফিরে আসবে না, এলে ফল ভালো হবে না।'

সৈন্যটি আদহারান কমান্ডারকে ছেড়ে দিল। কমান্ডার ধীরে ধীরে নিজের মহাকাশযানের দিকে ফিরে গেল।



ওরা মাত্র ১০টা গ্রহের মধ্যে ৫টা গ্রহে পৌঁছাতে পেরেছিল। বাকি গ্রহগুলোতে আরও থাকা উচিত। এই চালানটা টেরায় পৌঁছানোর পর আমরা ভেতরের গ্রহগুলোতে কাজ শুরু করতে পারব

মহাকাশযানের বাইরের অংশ মেরামত করা আদহারানরা নিজেদের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে কমান্ডারের পেছন-পেছন ভেতরে ঢুকল। হ্যাচগুলো বন্ধ হয়ে গেল। আদহারান মহাকাশযানটা গর্জে উঠল, তার জেট ইঞ্জিন জীবন্ত হয়ে কাঁপিয়ে তুলল মহাকাশযানকে। ভারী আর এলোমেলো ভঙ্গিতে সেটা মাটি ছেড়ে উঠল, ধীরে ধীরে আকাশে ভেসে উঠল। তারপর ঘুরে চলে গেল মহাকাশের দিকে।

শুরে তাকিয়ে রইলেন, যতক্ষণ না সেটা পুরোপুরি দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে যায়।

'এটুকুই।' শুরে আর ফ্রাই দ্রুত তাঁদের ক্রুজারের দিকে হাঁটতে লাগলেন। 'তোমার কী মনে হয়, এই রত্নগুলো টেরাতে একটু হইচই ফেলে দেবে?'

'একটু? এ নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে?'

'না।' শুরে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। 'ওরা মাত্র ১০টা গ্রহের মধ্যে ৫টা গ্রহে পৌঁছাতে পেরেছিল। বাকি গ্রহগুলোতে আরও থাকা উচিত। এই চালানটা টেরায় পৌঁছানোর পর আমরা ভেতরের গ্রহগুলোতে কাজ শুরু করতে পারব। যদি আদহারানরা খুঁজে পায়, তাহলে আমরাও পারব।'

ফ্রাইয়ের চশমার পেছনে চোখ জ্বলে উঠল। 'দারুণ।' আমি বুঝতে পারিনি যে আরও থাকতে পারে।'

'আছে।' শুরে ভ্রু কুঁচকে চোয়াল ঘষতে লাগলেন। 'অন্তত আমার হিসাবে থাকার কথা।'

‘কোনো সমস্যা? কী ভাবছেন, ক্যাপ্টেন?’

‘আমি বুঝতে পারছি না, আমরা কেন নিজেরাই এগুলো খুঁজে পাইনি!’

ফ্রাই তাঁর কাঁধে চাপড় দিল। ‘আরে, এ নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। এখন হাতে পেয়েছেন, এটাই বড় কথা!’

শুরে মাথা নেড়ে বললেন, ‘তবু আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আমরা এগুলো আগে খুঁজে পাইনি কেন? এর কোনো মানে আছে কি না।’

***

আদহারান কমান্ডার তার কন্ট্রোল স্ক্রিনের সামনে বসে যোগাযোগব্যবস্থা ঠিকঠাক করছিল।

দ্বিতীয় গ্রহের আদহারান সিস্টেমের ছবি মূল স্ক্রিনে ভেসে উঠল। কমান্ডার তার গলার কাছে সাউন্ড কন্ট্রোল ঠিক করল।

‘খারাপ খবর আছে।’

‘কী ঘটেছে?’

‘টেরানরা আমাদের আক্রমণ করেছে, আমাদের পণ্যের বাকি অংশ নিয়ে গেছে।’

‘কতটুকু ছিল?’

‘অর্ধেক। আমরা মাত্র পাঁচটা গ্রহে পৌঁছাতে পেরেছিলাম।’

‘বিষয়টা দুর্ভাগ্যজনক। ওরা সব টেরায় নিয়ে যাচ্ছে?’

‘আমার তো তা-ই মনে হয়।’

একটু নীরবতা। ‘টেরা কতটা উষ্ণ?’

‘মোটামুটি উষ্ণ, যত দূর জানি।’

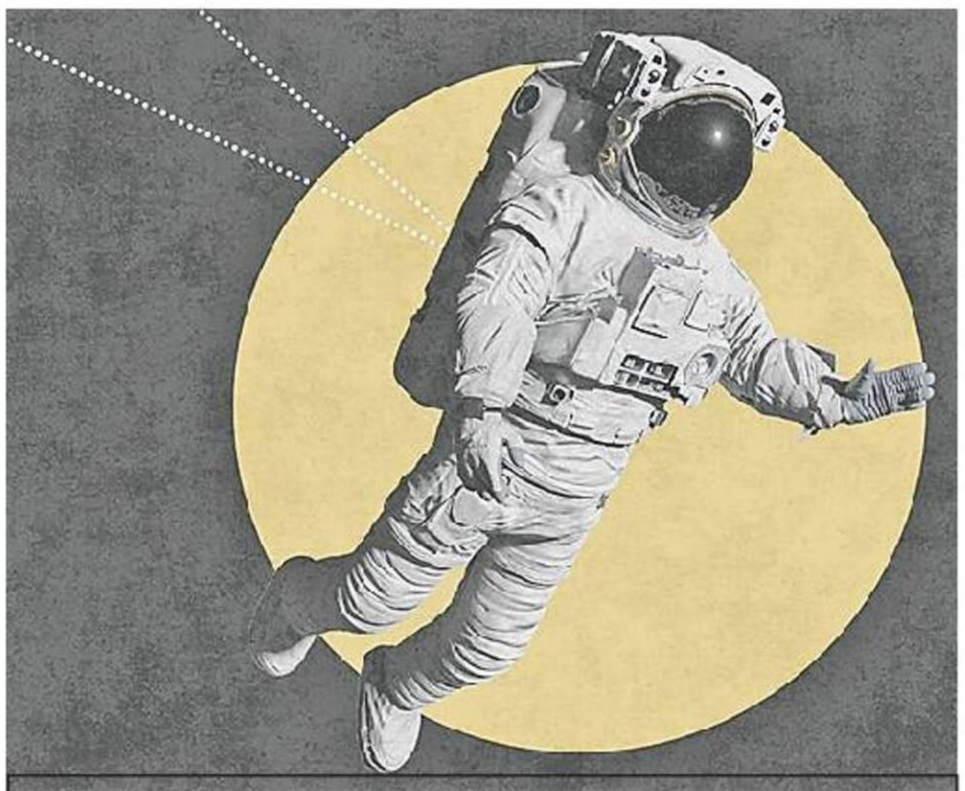
‘হয়তো ঠিকঠাকই হবে সবকিছু। আমরা টেরায় কোনো ডিম ফোটানোর পরিকল্পনা করিনি, কিন্তু যদি...’

‘টেরানদের মধ্যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের একটা বড় অংশ থাকার ভাবনাই ভালো লাগছে না। আফসোস, আমরা ডিস্ট্রিবিউশন আরও দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিতে পারিনি।’

‘চিন্তা কোরো না। আমরা কুইন-মাদারকে অনুরোধ করব, যাতে নতুন করে আরও একটা ডিম সরবরাহ করে।’

‘কিন্তু টেরানরা আমাদের ডিম দিয়ে কী করবে? ডিম ফোটার পর যা ঘটবে, সেটা শুধু ঝামেলা সৃষ্টি করবে। আমি ওদের বুঝতে পারি না। টেরানদের চিন্তাভাবনাগুলো আমাদের বোধের বাইরে। ডিম ফুটলে কী ঘটবে, ভাবতেই ভয় লাগে। আর উষ্ণ আর আর্দ্র কোনো গ্রহে ডিম ফোটার প্রক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যাবে...’

তথ্যকণা



একজন নভোচারীর বেতন কত

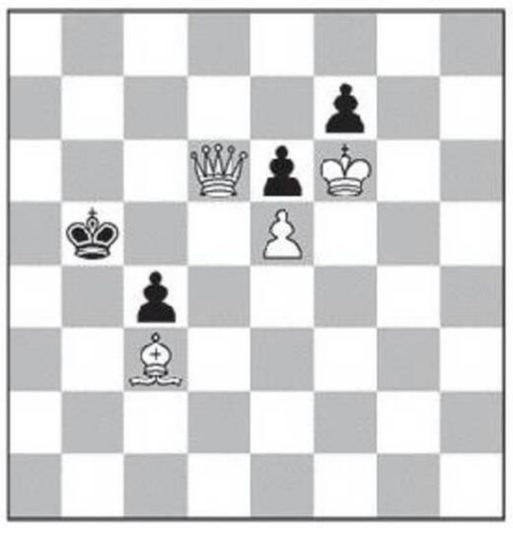
নভোচারীদের বেতন বিভিন্ন গ্রেডে হয়। এ-সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সাধারণত প্রকাশ করা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা নাসায় কর্মরত বেসামরিক নভোচারীরা ফেডারেল সরকারের বেতন স্কেলে বেতন পান। শুরুর দিকে তাঁদের বেতন হয় ১ লাখ ৪ হাজার ৮৯৮ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি টাকায় ১ কোটি ২৭ লাখ ৮৫ হাজার ২৩২ টাকার মতো। পদোন্নতি পেলে বেতন বাড়তে থাকে। সবচেয়ে অভিজ্ঞ নভোচারীরা প্রায় ১ লাখ ৬১ হাজার ১৪১ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বেতন পান। এটা বাংলাদেশের হিসাবে প্রায় ১ কোটি ৯৬ লাখ ৬০ হাজার ৭৩২ টাকা। ইউরোপীয় নভোচারীদের বেতনও মোটামুটি একই রকম। তবে রুশ নভোচারীরা মহাকাশে থাকার সময় বেশি বেতন পান। কিন্তু পৃথিবীতে প্রশিক্ষণের সময় তাঁদের বেতন সাধারণত কম থাকে।

গ্রন্থনা : আসহাবিল ইয়ামিন, শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ
সূত্র : *হাউ ইট ওয়ার্কস*

দুই চালে মাত ১০৫

এখানে দুটি দাবার ধাঁধা দেওয়া আছে। ধাঁধাগুলো দুই চালে মাত করতে হবে। সঠিক সমাধানদাতা তিনজনের জন্য রকমারি ডটকমের সৌজন্যে পুরস্কার হিসেবে রয়েছে ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর। খামের ওপর অবশ্যই **‘দুই চালে মাত ১০৫’** লিখবেন। উত্তরের সঙ্গে আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন।

ধাঁধা ১



ধাঁধা ২



দুই চালে মাত ১০৪-এর উত্তর

ধাঁধা ১ 1.Kf6 Kg8 2.Qg7#

ধাঁধা ২ 1...Kf7 2.Kh7 Qxh5#



ধাঁধা ১



ধাঁধা ২

দুই চালে মাত ১০৪-এর বিজয়ী

সিহাব ইসলাম তানিম, ইউনাইটেড সিটি, ঢাকা

কৌশিক ভৌমিক, দক্ষিণ বরগাছা, নাটোর সদর

মাহিমা তাবাসসুম, কলেজ রোড, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বইপত্র

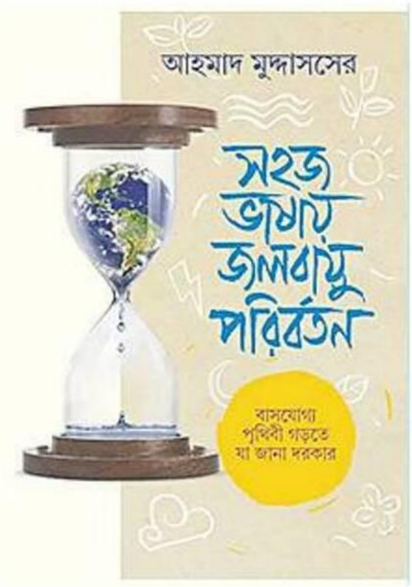
বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তে চাইলে

ধরুন, আপনার ঘরে আগুন লেগেছে। আপনি নিশ্চয়ই বসে বসে অন্য সব কাজ শেষ করে তারপর ধীরেসুস্থে আগুন নেভাবেন না। এ রকম একটা কথাই বলেছেন এক কিশোরী। গ্রেটা থুনবার্গ। সেটা ২০১৮ সালের কথা। সেই কিশোরীর আন্দোলনটি আজ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেক কিশোর-তরুণ এর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। সবাই একমত—পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে। আমাদের কিছু করা প্রয়োজন।

কিন্তু আমরা কী করব? বড় বড় প্রতিষ্ঠান নাহয় কার্বন নিঃসরণ কমাতে পারে, দেশগুলো উদ্যোগ নিতে পারে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে। কিন্তু কিশোর-তরুণেরা বা ব্যক্তিমানুষ কী করবে? প্রথম কাজ হলো জানা। জলবায়ু পরিবর্তন আসলে কী? এটা আসলে কতটা মারাত্মক?

আহমাদ মুদ্দাসসেরের লেখা *সহজ ভাষায় জলবায়ু পরিবর্তন* বইটি শুরু হয়েছে ঠিক এখান থেকেই। গ্রিনহাউস গ্যাস কী; আবহাওয়া আর জলবায়ুর পার্থক্য কী; জলবায়ুর ইতিহাসটা কেমন; এখন যে পরিবর্তন হচ্ছে, তা কতটা প্রাকৃতিক আর মানুষ কতটা দায়ী; এ ব্যাপারে কিছু করলে 'ভালো ভবিষ্যৎ'টা কেমন হবে—এসবই উঠে এসেছে বইটির প্রথম অধ্যায়ে।

১৩৬ পৃষ্ঠার ৮ অধ্যায়ের ছোট্ট বই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিস্তার উঠে এসেছে জলবায়ু পরিবর্তন বিজ্ঞানীরা কীভাবে বোঝেন, কীভাবে এসব পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়। কার্বন নিঃসরণ, পানি খরচ বা অপচয়, খাদ্য কত দূর পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনে এসবের প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে এ অধ্যায়ের আলোচনা। এর সূত্র ধরে তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম, 'তুমি কী করতে পারো'। আমরা যা যা করতে পারব নিজেদের উদ্যোগে, যেমন সচেতনভাবে খাওয়াদাওয়া করা, একটা টি-শার্ট কম পরা—দেখানো হয়েছে ছোট ছোট এসব কাজ কীভাবে ব্যাপক পরিসরে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।



সহজ ভাষায় জলবায়ু পরিবর্তন

আহমাদ মুদ্দাসসের

প্রকাশক : আদর্শ
প্রথম প্রকাশ : ২০২৩
প্রচ্ছদ : সব্যসাচী মিস্ত্রী
পৃষ্ঠা : ১৩৬
দাম : ৩৪০ টাকা

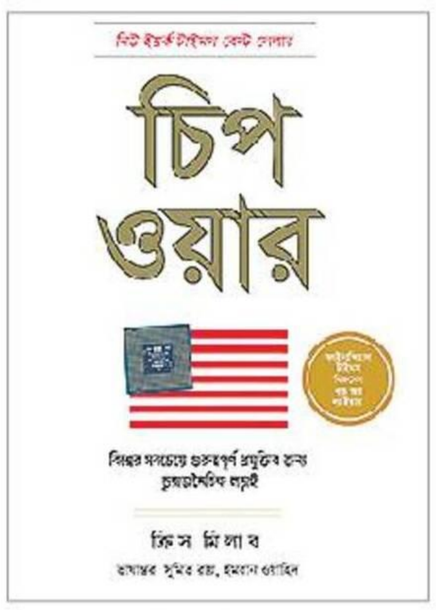
চতুর্থ অধ্যায়টি বেশ ইন্টারেস্টিং। জলবায়ু পরিবর্তনের কথা শুনলে অনেকে ভাবেন, এগুলো আসলে সত্যি নয়। এই অধ্যায়ে তাই দুটি কেস স্টাডি আছে। এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন যেমন দেখানো হয়েছে, ইতিবাচক উদ্যোগ কীভাবে নেওয়া যায়, রয়েছে সে আলোচনাও।

পঞ্চম অধ্যায়টি বাংলাদেশের কথা। লেখক নিজে ২০০৭ সালে সিডরের পর গিয়েছিলেন বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জের ফুলহাতা গ্রামে। নিজের চোখে দেখেছেন জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব। শুধু তা-ই নয়, সেখানকার মেয়েশিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করেছেন, তাদের গণিত, বিজ্ঞান ও প্রোগ্রামিং শেখানোর প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন আর্থিকভাবে কেমন পঙ্গুত্ব চাপিয়ে দেয় মানুষের ওপর। এরপর একে একে সবুজ, অর্থাৎ পরিবেশবান্ধব জ্বালানি; জলবায়ু শরণার্থীদের কথা ইত্যাদি নিয়ে এ অধ্যায়। একদম শেষ অধ্যায়টি অনুপ্রেরণার, পথ দেখানোর। এ অধ্যায়ে জানা যাবে শুরুতে বলা সেই কিশোরী—গ্রেটার কথা। জানা যাবে বাংলাদেশে যাঁরা সচেতনতা বাড়াতে কাজ করছেন, তাঁদের কথা।

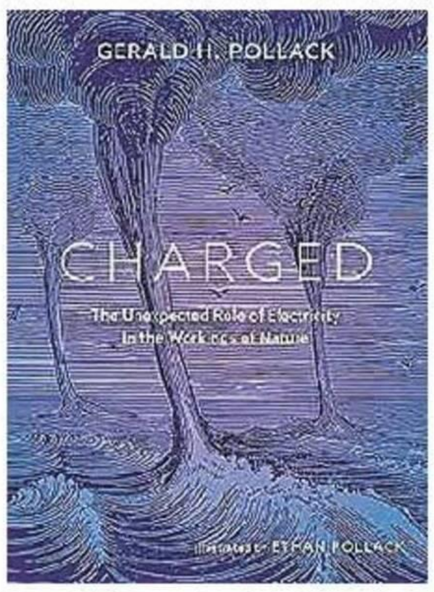
বইটি সবারই পড়া প্রয়োজন। বই বা লেখকের বিশেষ কৃতিত্বের জন্য নয়; বিষয়টির গুরুত্বের জন্যই এ নিয়ে জানা প্রয়োজন। লেখকের কৃতিত্ব সেগুলো সহজ ও বাস্তবভাবে তুলে ধরায়—এটুকু স্বীকার না করে উপায় নেই। বইটির ভূমিকায় মুনির হাসানের বক্তব্য থেকেই এর গুরুত্ব বোঝা যায়।

গ্রন্থনা : মুনিয়া মানতাসা

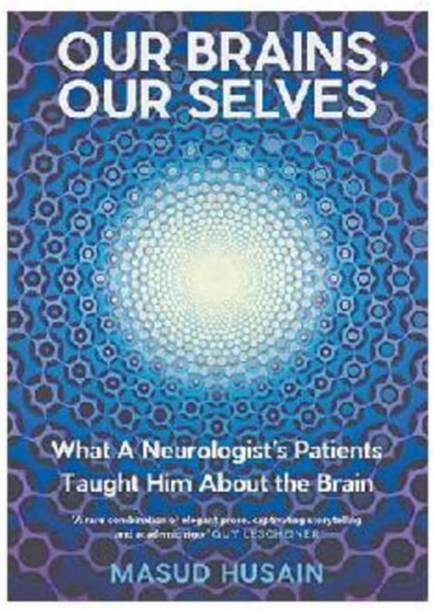
নতুন বই



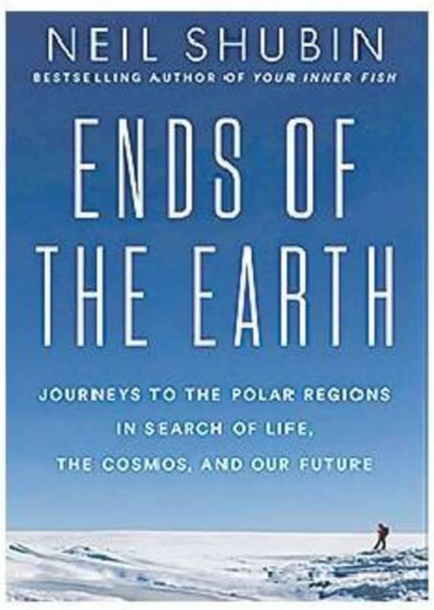
চিপ ওয়ার
ক্রিস মিলার
অনুবাদ : সুমিত রায়, ইমরান ওয়াহিদ
প্রকাশক : পুঁথি
পৃষ্ঠা : ৪৯৪
দাম : ৭৮৬ টাকা
মোবাইল, কম্পিউটারসহ সব ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রেই ব্যবহৃত হয় ইলেকট্রনিক চিপ। সেই চিপ নিয়ে ভূ-রাজনৈতিক লড়াই...



চার্জড
জেরাল্ড পোলাক
প্রকাশক : এবনার অ্যান্ড সনস
পৃষ্ঠা : ৪৩৪
দাম : ২৯ পাউন্ড
মহাবিশ্বের জটিল সব কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, তড়িৎ-চৌম্বক বল ও চার্জিত কণার অবিশ্বাস্য প্রভাব ও রহস্য...



আওয়ার ব্রেন, আওয়ার সেলভস
মাসুদ হুসাইন
প্রকাশক : ক্যানোগেট বুকস
পৃষ্ঠা : ২৮৮
দাম : ১৫ পাউন্ড
আমাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে কেমন করে? কীভাবে আপনি 'আপনি' হয়ে ওঠেন? মস্তিষ্কের ভেতরের অমীমাংসিত রহস্যের সঙ্গে এক মনস্তত্ত্ববিদের বোঝাপড়া...



এন্ডস অব দ্য আর্থ
নিল শুবিন
প্রকাশক : ডাটন (পেঙ্গুইন)
পৃষ্ঠা : ২৮৮
দাম : ৩২ ডলার
পৃথিবীর শেষ প্রান্তে শুভ্র বরফের রাজ্য। সেই রাজ্যের কোণে কোণে কত রোমাঞ্চ, কত বিস্ময়! বরফরাজ্যের অজানা কাহিনি, ইতিহাস ও জলবায়ু পরিবর্তনে শীতল বরফের উষ্ণ হয়ে ওঠার পরিণতি...

কী ও কেন?

উল্কাপাতে গোলাকার গর্ত তৈরি হয় কেন

আব্দুল কাইয়ুম

আঁকা : **অনিন্দ্য মুন্তাসির**



কিন্তু উল্কা সাধারণত প্রচণ্ড গতিশক্তি নিয়ে মাটিতে আঘাত হানে এবং বেশ কিছুটা ভেতরে ঢুকে পড়ে। এ সময় উল্কাপিণ্ডের ভেতরেই বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে।

এ বিস্ফোরণের ফলে উল্কাপিণ্ডের ভেতরের বিভিন্ন উপাদান সবেগে চারদিকে ছিটকে পড়ে। ফলে চারপাশে যে গর্ত সৃষ্টি হয়, সেটা অনেকটা বিশাল কড়াইয়ের মতো গোলাকার হয়।

অবশ্য উল্কাপিণ্ড মাটিতে আঘাত হানার সময় যদি মাটির প্রায় সমান্তরালে পড়ে, তাহলে সৃষ্ট গহ্বর গোলাকার হবে না। একটি লম্বা গভীর খালের মতো গর্ত হয়।

একটু বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে যদি বলেন স্যার, আমাদের এখানে বিপর্যয়কর কিছু ঘটতে পারে কি না?

বিভিন্ন এলাকায় বিপর্যয় ঘটে...

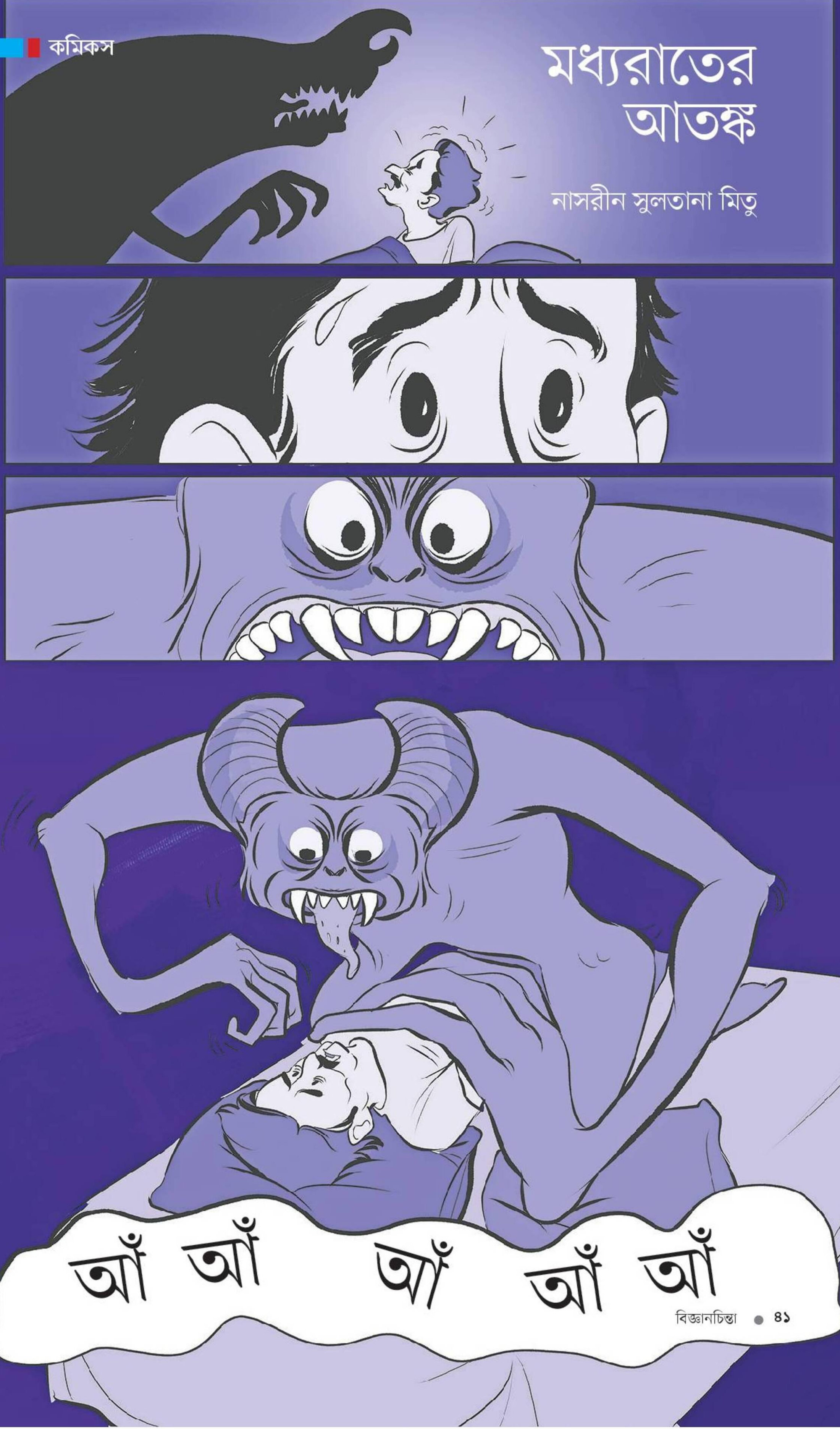
সব দেশেই কি অভিশপ্ত বিপর্যয় ঘটে?

আ! আমাদের এখানেও যেন তেমন কিছু না হয়...তাহলেই বাঁচি!!!

না, সে রকম কিছু বলা যায় না। তবে প্রতিদিন পৃথিবীতে অসংখ্য উল্কাপাত ঘটে। এর অনেকগুলো অবশ্য মাটিতে পড়ার আগেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বাতাসের সংস্পর্শে এসে ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে প্রায়ই নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু অনেক উল্কাপিণ্ড সজোরে পৃথিবীর মাটিতে আঘাত হানে এবং বেশ গভীর গোলাকার গহ্বর সৃষ্টি হয়। অনেক এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি কমই হয়।

মধ্যরাতের আতঙ্ক

নাসরীন সুলতানা মিতু




টিং টং
টিং টং
মামা? তুমি এই কাকভোরে? ব্যাপার কী?
না মানে...একটু ঘুমাব তোদের বাসায়...
তোর এই বোবায় ধরা রোগ আবার কবে ধরল? খেয়েদেয়ে ঘুম দে, যা!
আচ্ছা আপা...
মামি তিন দিনের জন্য কনফারেন্সে গেছে, আর এতেই তোমার এই অবস্থা?
চুপ করবি তোরা?
বনি ভাইয়া, এই বোবায় ধরা রোগ কেন হয়, জানিস?
বোবায় ধরার সায়েন্টিফিক নাম স্লিপ প্যারালাইসিস...
একে স্লিপ প্যারালাইসিস কেন বলে?
কারণ, এই সময়ে শরীরের অবস্থা হয় অনেকটা প্যারালাইজড রোগীর মতো। সজাগ থাকলেও শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এমনকি হাত-পা নাড়ানোর শক্তিও থাকে না...
এর বেশি আমিও জানি না। মামিকে জিজ্ঞেস করিস। উনি হয়তো জানবেন।

পরদিন

একি মামি! এক দিন আগেই চলে এলে?

তোর মামার দশা শুনে আর দেরি করলাম না! এয়ারপোর্ট থেকে সোজা তোদের বাসায় এলাম।

তোমার এই বোবায় ধরা কেস তো এত বছরে দেখিনি। হঠাৎ হলো কী?

আমি কীভাবে বলব? ঘুমের মধ্যে মনে হলো ভয়ানক এক পিশাচ আমার বুকের ওপর চেপে বসেছে, গলা চেপে ধরছে আমার...

বোবায় ধরা বা স্লিপ প্যারালাইসিস হচ্ছে ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা ঘটনা। এটা ঘটে ঘুমের একটা পর্যায়ে, যেটাকে বলে রেম (REM) বা 'র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট'। আমরা যত স্বপ্ন দেখি, সবই ঘুমের এই পর্যায়ে। এই সময়ে স্বপ্ন দেখে আমরা উল্টাপাল্টা কিছু যাতে না ঘটিয়ে ফেলি, সে জন্য মস্তিষ্ক শরীরের পেশিগুলোকে অসাড় করে রাখে।

স্লিপ প্যারালাইসিসের সময়ে যেটা ঘটে, সেটা হলো ঘুমের এই পর্যায়ে হুট করে ঘুম ভেঙে মানুষ জেগে যায়। কিন্তু মস্তিষ্ক জেগে গেলেও শরীরের পেশিগুলোতে সাড়া ফিরতে কিছুক্ষণ সময় লাগে। জেগে আছ অথচ শরীর নাড়াতে পারছ না, কথা বলতে পারছ না—এই ব্যাপারটাই তো যথেষ্ট ভীতিকর! তখন এ রকম দম আটকে আসা, বুকের ওপর চাপ লাগার মতো অনুভূতি হয়!

কিন্তু তোমার কথামতো মস্তিষ্ক জেগে থাকলে...ওই পিশাচকে যে দেখলাম...তাহলে কি ওটা সত্যি??

আরে ধ্যাত! ওইটা হ্যালুসিনেশন। যেহেতু ওই সময়ে কোনো রকম শারীরিক নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে না, সেটার ব্যাখ্যা হিসেবে মস্তিষ্ক এ রকম অদ্ভুতুড়ে ভিজ্যুয়াল চোখের সামনে দাঁড় করাতে পারে...

অনেকটা জেগে দুঃস্বপ্ন দেখার মতো আরকি...


সেদিন রাতে
কী ভাবছ? ঘুমাও না কেন?
ভাবছিলাম এই বোবায় ধরার কারণটা কী? কেন হয় এটা?
এটা বলা খুব মুশকিল। সত্যি বলতে, বিজ্ঞানীরা এখনো নিশ্চিত নন স্লিপ প্যারালাইসিস কেন ঘটে।
পুরো ঘটনাই তো স্নায়ুজনিত। কিছু ক্ষেত্রে মানসিক সমস্যা, স্নায়বিক জটিলতার সঙ্গে এর সম্পর্ক পাওয়া গেছে। আবার এসব সমস্যা ছাড়াও ঘুম কম হলে, মানসিক চাপ বেশি হলে বা ঘুমের শিডিউল উল্টাপাল্টা হলেও এটা ঘটতে পারে।
কাজেই ঘুমের শিডিউল উল্টাপাল্টা না করে এখন ঘুমাও!
বেশ কিছুক্ষণ পর
আঁ আঁ
টুটি তুই?
মিয়াঁও!
হা হা হা! এই তোমার বোবা??



চন্দ্রজয়ী প্রথম নারী (শেষ পর্ব)

ব্রাড গান ও স্টিভেন লিস্ট | ভাষান্তর : কাজী আকাশ
আঁকা : ব্রেন্ট ডোনোহোর ও কেইটলিন রিড

হেই, কী করছ? ঝুলে আছ?

কেমন লাগছে ঝুলে থাকতে? আমায় তো সব সময় এমন ঝুলিয়ে রাখো।

আমার পেট কিন্তু এমন ঠাট্টারসিকতায় ভরা! হাঁ হাঁ।

চমৎকার

হেই, এটা দেখো আমাকে সিলের মতো লাগছে।

এখন জেট প্যাক থাকলে ভালো হতো, তাই না?

আর খোঁচা দিয়ো না।

জানো, ড্যানের লাভা টানেলটা খুব ভালো লাগছে।

ক্যালি। সাবধান, আমরা অনেক...অনেক...

ওকে ওখানেই রেখে আমরা হ্যাবিট্যাটে ফিরে যেতে পারি।

আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি, আরটি।

সেটাই তো চাই।

আরটি? আরটি, কী হচ্ছে?!

লুনার আউটপোস্ট...কিছু একটা হচ্ছে। আমি থেমে গেছি, নামতে পারছি না।

আমি শুধু...ড্যান? তুমি আছ? আমি প্রায় অর্ধেক নেমেছি, কিন্তু কেবল আটকে গেছে। কিছু বুঝতে পারছি না...ড্যান?

হ্যালো?! মিশন কন্ট্রোল! আমি রড্রিগেজ বলছি! শুনতে পাচ্ছ?! লুনার আউটপোস্ট? ড্যান?!

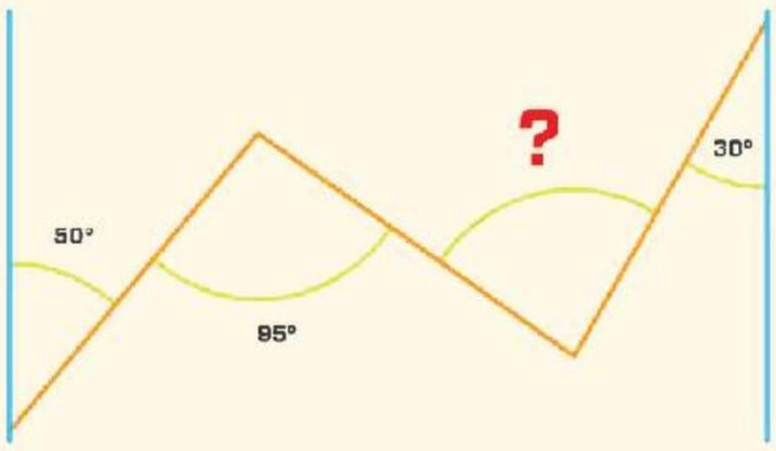
হ্যালো? কেউ আছ?

শেষ

বুদ্ধির ব্যায়াম

কাজী আকাশ

১. ছবিতে দুটি সমান্তরাল নীল রেখার মাঝখানে কিছু কোণ দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি কোণের মান দেওয়া আছে : ৫০°, ৯৫° ও ৩০°। এখন বলো তো, প্রশ্নচিহ্নিত কোণের মান কত?



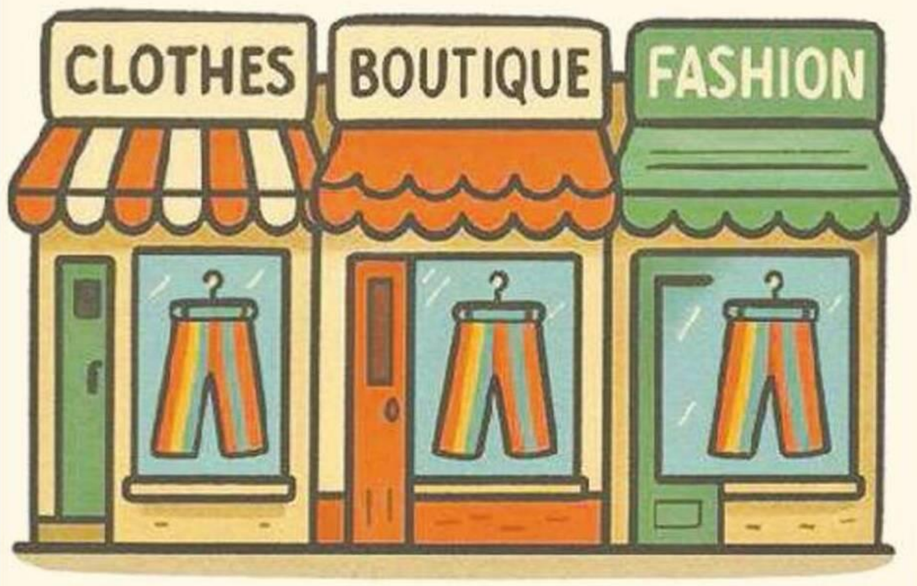
২. যুক্তি দিয়ে বলো তো, প্রশ্নচিহ্নিত স্থানে কত বসবে?

1 2 9 44 ? 1854

৩. জসিম, জামাল ও জয়ের একই বাজারে তিনটি দোকান আছে। তারা প্রত্যেকে মোটামুটি একই রকম প্যান্ট বিক্রি করে। জসিম প্রথমে প্যান্টের দাম বলে ৪৮০ টাকা। এরপর সে প্যান্টে ২০ শতাংশ ছাড় দেয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে জানায়, এত ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে না। তাই প্যান্টের ডিসকাউন্ট দেওয়া দামটি ১৭ শতাংশ বাড়ায়। তখন ক্রেতা প্যান্ট নিতে না চাইলে জসিম আবার দাম ২৩ শতাংশ কমিয়ে দেয়।

প্রায় একই ঘটনা ঘটে জামালের দোকানে। সে প্যান্টের দাম বলে ৫৭০ টাকা। প্রথমে সেখান থেকে ২০ শতাংশ কমায়, তারপর আবার ১৫ শতাংশ কমিয়ে দেয়। কিন্তু পরে মত পরিবর্তন করে দাম বাড়ায় ১০ শতাংশ। সবশেষে জামাল আবার ১৯ শতাংশ দাম কমায়।

আর জয় প্যান্টের দাম শুরু করে ৬৫০ টাকা দিয়ে। সে প্রথমে ৪০ শতাংশ কমিয়ে তারপর দুবার ১০ শতাংশ করে বাড়ায় এবং সবশেষে ৩০ শতাংশ কমিয়ে দেয়। এখন প্রশ্ন হলো, এই তিনজনের মধ্যে কে এখন সবচেয়ে কম দামে প্যান্ট বিক্রি করছে?



গত সংখ্যার উত্তর

১. ২০
২. যোগফল ১১
৩. ৭৮০ লিটার

গত সংখ্যার বিজয়ী

কে এম আবুল বাশার, চৌড়হাস, কুষ্টিয়া
লাবিবা রহমান, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
আসমা বেগ, বাঘা, রাজশাহী

সমাধান পাঠিয়ে জিতে নিন পুরস্কার!

একটি কাগজে বড় করে লিখুন 'বুদ্ধির ব্যায়াম', তারপর উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন। খামের ওপর বড় করে লিখতে হবে 'বুদ্ধির ব্যায়াম', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে দৈবচয়নে তিনজন পাবেন বিশেষ পুরস্কার! উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

উত্তর পাঠান : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।



জামাল স্যারের মহাবিশ্ব
প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলামের বৈজ্ঞানিক জীবন
প্রদীপ দেব
জামাল নজরুল ইসলামকে নিয়ে আগ্রহ-উদ্দীপনা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে তাঁর মৃত্যুর পরে। এ বইয়ে তাঁর বিজ্ঞান-গবেষণা সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে।
৩৭০ টাকা
প্রথমা প্রকাশন
কারওয়ান বাজার ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭
শাহবাগ ০১৯৫৫৫৫২১৭৬
শেফ'স টেবিল ০১৭৩০০০০৬০০
বাংলাবাজার ০১৭৩০০০০৬৪৮
সিলেট ০১৭০৮৪৩৫৫৭৯
ঘরে বসে বই পেতে www.prothoma.com ০১৭৩০০০০৬১৯

‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং সংশ্লিষ্ট মৌলিক প্রযুক্তিতে দক্ষ হলে আমরা এগিয়ে যেতে পারব’

—মশিউর রহমান
ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজার, ওমরন হেলথকেয়ার, সিঙ্গাপুর



মশিউর রহমান সিঙ্গাপুরের ওমরন হেলথকেয়ারে কর্মরত। মোবাইল অ্যাপ, ওয়্যারেবল ডিভাইস, ক্লাউড সলিউশনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষকে উন্নত মানের স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। এই প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী অনার্স ও মাস্টার্স করেছেন জাপানের তোয়োহাশি ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি থেকে তড়িৎকৌশলে। এরপর একই দেশের দ্য গ্র্যাজুয়েট ইউনিভার্সিটি ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ থেকে, পদার্থবিদ্যায় পিএইচডি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল ইউনিভার্সিটি থেকে সম্পন্ন করেছেন পোস্টডক্টরেট। এ ছাড়া তিনি দীর্ঘদিন ‘বিজ্ঞানী ডট অর্গ’ নামের একটি বিজ্ঞান ব্লগ পরিচালনা করছেন।

বিজ্ঞানচিন্তা : কেমন আছেন?

মশিউর রহমান : ভালো আছি, কিছুদিন আগে পঞ্চাশে পা দিলাম। জীবনের এক নতুন অধ্যায়ে পা দিচ্ছি বলা যায়। ছোটখাটো জিনিসকে নতুন করে পর্যবেক্ষণ করছি, জীবনের এই সৌন্দর্যকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছি এবং উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি। বিজ্ঞানচিন্তার ভক্ত আমি, তাই এভাবে বিজ্ঞানচিন্তার পাঠকদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারা আমার জন্য সৌভাগ্যের।

বিজ্ঞানচিন্তা : আপনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করেন। শুরুতেই জানতে চাইব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে? আপনার কী মনে হয়?

মশিউর রহমান : মানুষের সঙ্গে তুলনা করা একটু কঠিন। কেননা মানুষ জৈবিক। তাই একদিকে তার যেমন অনেক দক্ষতা আছে, আবার কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। তবে এটি অনস্বীকার্য যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিভিন্নভাবে আমাদের প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিপ্লব বয়ে আনবে। সহজে অনেক কিছু করা সম্ভব হবে, আগে যা করতে অনেক সময় লাগত। মনে করা যাক, আগে আমরা অ্যাবাকাস বা গণনাযন্ত্র ব্যবহার করে বড় সংখ্যার গণনাগুলো করতাম। এখন কিন্তু ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে তা দ্রুত সেরে ফেলি। তেমনিভাবে আগে বিভিন্ন তথ্য ও রেফারেন্স সংগ্রহ এবং সেগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য অনেক সময় লাগত, যা আমরা এখন দ্রুত করে ফেলতে পারছি।

মূল প্রশ্নে ফিরে যাই। 'বুদ্ধিমত্তা' শব্দটি বড্ড গোলমেলে। এটিকে সহজে পরিমাপ করার উপায় আমাদের জানা নেই। তাই তুলনা করে আমরা বলতে পারব না মানুষের চেয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বেশি বুদ্ধিমান কি না।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের প্রায় কাছাকাছি বুদ্ধিমান হয়ে যাওয়ার এ সময়কে বিজ্ঞানীরা বলছেন, 'AGI' বা 'Artificial General Intelligence' (কৃত্রিম সাধারণ বুদ্ধিমত্তা)। এটি একটি রোবট বা কম্পিউটার সিস্টেমকে বোঝানো হয়, যা মানুষের মতো চিন্তা করতে, বুঝতে, শিখতে ও বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম শুধু একটি নির্দিষ্ট কাজেই নয়; বহুমুখী কাজে। আমরা বর্তমানে যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি, তাকে 'Narrow AI' বা সীমিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা যায়। কেননা এগুলো কেবল একটি নির্দিষ্ট বা সীমিত কাজ করতে পারে। এটি মানুষের মতো চিন্তা করতে পারে না, নিজে থেকে সিদ্ধান্তও নিতে পারে না। কেবল যেটি শেখানো হয়েছে, সেটিই করে। আমার ধারণা, এজিআই সম্ভবত ২০৩০ সালে হবে। কেননা এর জন্য বেশ কিছু হার্ডওয়্যার ও অ্যালগরিদমের উন্নয়নের প্রয়োজন হবে, যার জন্য একটু সময় লাগবে।

বিজ্ঞানচিন্তা : আপনি মূলত স্বাস্থ্য খাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করেন। মোবাইল অ্যাপ, ওয়্যারেবল ডিভাইস, ক্লাউড সলিউশনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছেন। এগুলো স্বাস্থ্য খাতে কতটা পরিবর্তন এনেছে? মানুষের এক্সপেরিয়েন্স কতটা উন্নত হচ্ছে, কত ভালোভাবে সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে?

মশিউর রহমান : আমি মূলত কাজ করি স্বাস্থ্য খাতে বিভিন্ন ধরনের ডেটা বা তথ্য নিয়ে। মোবাইল অ্যাপ, ওয়্যারেবল ডিভাইস, ক্লাউড সিস্টেমগুলোয় প্রচুর তথ্য থাকে এবং তা বিভিন্নভাবে আমাদের উপকারে আসে। আমার মূল কাজ হলো সেই তথ্যগুলোকে কীভাবে সহজে ব্যবহারকারীর কাছে উপস্থাপন করা যায়। যেহেতু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই তথ্য ও সংখ্যা নিয়ে খেলা করা যায়, তাই এটি প্রয়োগে কাজগুলো অনেক সহজ ও বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছে। আমার মূল কাজ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারিক প্রয়োগ।

আমি বর্তমানে ওমরন হেলথকেয়ার সিঙ্গাপুরে কাজ করছি; যেখানে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সিস্টেম আমরা তৈরি করছি, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে তার উচ্চ রক্তচাপের রিপোর্ট তৈরি করে দিচ্ছে। আগে আমরা যে সিস্টেম তৈরি করেছিলাম, তাতে শুধু রক্তচাপের সংখ্যাগুলো দেখা যেত। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে সংখ্যাগুলো বোঝা একটু কঠিন। আমরা অনেক চেষ্টা করেছিলাম সেই সংখ্যাগুলো সহজে বোঝার জন্য চার্ট তৈরি করে দিতে; কিন্তু তারপরও তা বোঝাটা কঠিন। পরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা ব্যবহারকারীদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে সহজ ভাষায় সেই সংখ্যাগুলোকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির কল্যাণেই ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে।

এআই খুব দ্রুত ও নির্ভুলভাবে এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআইয়ের মতো চিত্র বিশ্লেষণ করতে পারে। এমনকি এমন কিছু সূক্ষ্ম পরিবর্তন খুঁজে বের করতে পারে, যা অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন স্তন ক্যানসারের প্রাথমিক লক্ষণ ৯০ শতাংশের বেশি নির্ভুলভাবে ধরতে পারে।

বিজ্ঞানচিন্তা : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্বাস্থ্য খাতে ভবিষ্যতে কেমন পরিবর্তন আনবে, কতটা বদলে দেবে?

মশিউর রহমান : প্রথমেই উল্লেখ করেছি, বর্তমানে আমরা যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করছি, সেগুলো সীমিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা; যাকে ইংরেজিতে 'Narrow AI' বলছে। তবে এজিআই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে স্বাস্থ্যক্ষেত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আসবে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কোনো যন্ত্রপাতি ও ওষুধ বাজারে আনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এফডিএ সংস্থার ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। ২০১৫ সালের আগে মাত্র সাতটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অ্যালগরিদম বা সফটওয়্যার এমন ছাড়পত্র পেয়েছিল। এরপর প্রতিবছর প্রায় ১০০টি এবং বর্তমানে প্রায় ২০০টি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সিস্টেম স্বাস্থ্য খাতে প্রয়োগের অনুমতি পাচ্ছে। অর্থাৎ হাসপাতাল ও চিকিৎসকেরা নির্দ্বিধায় সেগুলো ব্যবহার করছেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রোগীর জিনতত্ত্ব, জীবনধারা ও পূর্ববর্তী রোগের তথ্য বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিভিত্তিক চিকিৎসা-পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে। এর ফলে ওষুধের সঠিক ডোজ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার পূর্বাভাস এবং দ্রুত সুস্থতার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। আগামী দিনে রোগীকে প্রতিনিয়ত হাসপাতালে গিয়ে আর ভিড় করতে হবে না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত স্মার্ট ডিভাইস, যেমন স্মার্ট ওয়াচ, স্মার্ট রক্তচাপ মনিটর, প্রতিদিনের স্বাস্থ্যের তথ্য সংগ্রহ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিকিৎসক বা হাসপাতালের কাছে পাঠাবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে আগে থেকেই বিপদের সংকেত দিতে পারবে। রোবোটিক সার্জারিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় জটিল সার্জারি আরও নির্ভুলভাবে করা সম্ভব হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রিয়েল টাইমে অপারেশনের সময় তথ্য বিশ্লেষণ করে সার্জনকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। ফলে ঝুঁকি কমবে এবং রোগমুক্তির সময় কমে যাবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্বাস্থ্যসেবার চেহারাটাই পাল্টে দিচ্ছে। ভবিষ্যতে রোগীকে শুধু অসুস্থ হলে চিকিৎসকের কাছে ছুটতে হবে না; বরং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আগেভাগেই সতর্ক করবে, সুস্থ থাকার জন্য পথনির্দেশ দেবে এবং প্রয়োজনে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।

বিজ্ঞানচিন্তা : এবার আপনার গল্প শুনতে চাই। আপনার ছোটবেলা, শৈশব-কৈশোর, জাপানে পড়াশোনার গল্পটা সংক্ষেপে বলুন।

মশিউর রহমান : আমি বড় হয়েছি ঢাকার মোহাম্মদপুরে। নব্বইয়ের দশকে আমাদের মধ্যবিত্তের জীবন ছিল খুবই সাদামাটা অথচ অপূর্ব সুন্দর সময়ে ভরা। পাড়ায় খেলাধুলা, বন্ধুরা মিলে আড্ডা মারা ইত্যাদিতে সময়টা ছিল সত্যিই সুন্দর। পাশের বাড়ির আপুর বিয়ে হচ্ছে, আমরা সবাই মিলে সিঁড়িঘরে আলপনা আঁকছি, ক্যাসেটে বাংলা ব্যান্ডের গান বাজছে, আন্টিরা গরম শিঙাড়া ভেজে দিচ্ছেন, ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছি। বিদ্যুৎ চলে গেছে, সবাই সঙ্গে সঙ্গে হুররে শব্দে খুশির জোয়ার, পড়ার বই বন্ধ করে বন্ধুরা মিলে পাড়ায় হাঁটতে বেরিয়েছি—সে এক অদ্ভুত সময় ছিল নব্বইয়ের সময়টা।

এরপর ক্যাডেট কলেজে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে চেনা। ইলেকট্রনিকসের যন্ত্রপাতি নিয়েই আমি ডুবে থাকতাম। এরপর স্কলারশিপ নিয়ে চলে গেলাম জাপানে। জাপানে যাওয়ার পর নতুন ভাষা শিখতে একটু অসুবিধা হয়েছিল বৈকি। তবে পাশে পেয়েছিলাম আমার চমৎকার তিন বন্ধু—মাহমুদুল কবির, এহসানুল ইসলাম ও সর্বাণু দাসকে। তাদের পাশে পেয়ে হোমসিক কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। এরপর স্নাতক ও মাস্টার্স শেষ করলাম তোয়োহাশি ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজিতে তড়িৎকৌশলে। সেই যে ছেলেবেলার ইলেকট্রনিকসের নেশাটা ছিল, তাই এ বিষয় নিয়ে কাজ করতে খুব ভালো লাগত। ধীরে ধীরে আমি সনাতনি ইঞ্জিনিয়ারিং নয়, সেটিকে কীভাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, তা নিয়েই কাজ শুরু করলাম।

জাপানে আমার শিক্ষাজীবন ছিল একটু অন্য রকম। জাপান সরকার বিদেশিদের জন্য অনেক রকমের বৃত্তি দিলেও আমরা যারা স্নাতক পর্যায়ে বৃত্তি নিয়ে যেতাম, তাদের থাকার ব্যবস্থা হতো সাধারণ জাপানিজদের হোস্টেলগুলোয়। আশপাশের জাপানিজ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশে আমি জাপানকে আবিষ্কার করেছি খুব কাছ থেকে। তাদের জীবনযাত্রা, জীবনবোধ একেবারে তাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে শিখেছি। তাই তাদের সংস্কৃতি ও জীবনবোধ আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। একাকিত্ব কাটানোর জন্য পেনসিল, স্কেচের খাতা নিয়ে সাইকেলে বেরিয়ে যেতাম অনেক দূরে। তবে প্রতিবছরই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন করতাম বাংলাদেশের অনুষ্ঠান ও মেলা। আয়োজক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে সংগঠক হিসেবে অনেক গুণ রপ্ত করেছিলাম, যা পরবর্তী সময়ে আমার পেশা ও শিক্ষকতা জীবনে সাহায্য করে।

বিজ্ঞানচিন্তা : আপনার পড়াশোনা এবং কর্মক্ষেত্রেও ব্যাপক বৈচিত্র্য। তড়িৎকৌশলে অনার্স-মাস্টার্স করে পিএইচডি করলেন পদার্থবিজ্ঞানে, আবার কাজ করছেন কম্পিউটারবিজ্ঞানে। ডিএনএ, মস্তিষ্ক নিয়েও কাজ করেছেন—এ অভিজ্ঞতা কেমন? এ বৈচিত্র্যের পেছনে কী চিন্তা কাজ করেছে?

মশিউর রহমান : এ বৈচিত্র্যের পেছনে সম্ভবত কাজ করেছেন আমার বাবা। আমার বাবা মূলত রসায়নবিদ। কিন্তু আমি ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি, তিনি তাঁর দক্ষতা প্রয়োগ করেছেন দেশলাই, সার কারখানা, সাবান, সিরামিক, প্লাস্টিকের যন্ত্রপাতি তৈরিসহ অনেক রকমের ক্ষেত্রে। তাঁর এই বৈচিত্র্যই সম্ভবত আমাকেও প্রলুব্ধ করেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করতে। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আমিও প্রযুক্তিজ্ঞান প্রয়োগ করেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এ ছাড়া পিএইচডির সময়ে আমার মেন্টর জাপানিজ প্রফেসর উরিসু ও মাস্টার্সের প্রফেসর উচিদার প্রভাবও রয়েছে। তাঁদের দেখেছি ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান জৈবক্ষেত্রে, যেমন নিউরন, কোষ, ডিএনএর মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে। তাঁদের সঙ্গেই কাজ করার কারণে আমিও এভাবে প্রভাবিত হয়েছি। প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ভিন্ন হলেও প্রযুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে সব সময় আপডেট থাকার চেষ্টা করি।

বিজ্ঞানচিন্তা : বাংলাদেশে আপনি এনএসইউতে পড়িয়েছেন, বিদেশেও পিএইচডি-পোস্টডকের সময় পড়াতে হয়। বাংলাদেশের সঙ্গে কতটা পার্থক্য দেখেছেন? এ ব্যাপারে আমাদের কী করা উচিত?

মশিউর রহমান : আমি মূল যে পার্থক্য দেখেছি, তা হলো হাতে-কলমে কাজ করার। এনএসইউতে এসেই আমি আইপি টেলিফোনি ল্যাব তৈরি করেছিলাম ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে কাজ করার জন্য। হাতে-কলমে এ রকম কাজ করার মতো দক্ষ শিক্ষকদের এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসা দরকার। আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত থিওরিভিত্তিক কোর্সগুলো নেন। আমাদের যন্ত্রপাতির অভাব বলে অনেকেই অজুহাত দেখান, তবে সেটি ভুল ধারণা। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই হাতে-কলমে কাজ শেখানোর মতো বেশ কিছু শিক্ষক রয়েছেন, তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সহায়তা করা দরকার। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, তাঁদের উৎসাহিত করার চেয়ে সমালোচনা করাতেই লোকজনের আগ্রহ বেশি। 'আমরা'র চেয়ে 'আমি'-কে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই এমনটি হচ্ছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে কোম্পানিগুলোর কোলাবরেশন আরও বাড়ানো দরকার। তাহলে আমরা দক্ষ জনবল তৈরি করতে পারব এবং সেই জনবলকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্র পাব।

বিজ্ঞানচিন্তা : দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ভাষায় একটি বিজ্ঞান ব্লগ পরিচালনা করছেন আপনি। এই চিন্তাটা কীভাবে এল? অভিজ্ঞতাটা কেমন?

মশিউর রহমান : প্রবাসে থাকার কারণেই সম্ভবত দেশের জন্য কিছু করার একটা তাড়নো বোধ করতাম। পেশাগত কারণে প্রচুর বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। একদিন ড. আবেদের সঙ্গে ওনার কাজ নিয়ে গল্প করছিলাম। তখন মনে হলো, ওনার মতো একজন বড় মাপের বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথোপকথনটা শুধু আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। সেই উপলব্ধি থেকেই সাক্ষাৎকার পর্বটি শুরু হয়। একটি প্ল্যাটফর্ম দিয়ে সেই যাত্রা শুরু করি ২০০৬ সালে। যেহেতু বিজ্ঞানী ও গবেষকদের নিয়েই কাজ, তাই বিজ্ঞানী ডট অর্গ নাম দিয়েছিলাম। এখনো সেটি নিয়েই আছি। বাংলাদেশি বিজ্ঞানীরা কী নিয়ে গবেষণা করছেন, তা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে খুব সহজ ভাষায় বলার চেষ্টা করি। নবীন বিজ্ঞানীদের উৎসাহ ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি ছোটখাটো ব্যক্তিগত উদ্যোগ। তবে এখন অনেকেই আমার এই উদ্যোগের সঙ্গী বলে অনেককে পাশে নিয়ে কাজ করতে পারছি। গত ১৯ বছরে আমরা প্রায় ১৭০ জন বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার নিয়েছি।

বিজ্ঞানচিন্তা : এমন কোনো বই কি আছে, যে বই আপনি সবাইকে পড়তে বলবেন?

মশিউর রহমান : বিজ্ঞানীদের যেসব বই পড়তে বলব, তার বেশ কিছু আলোচনা 'বিজ্ঞানী ডট অর্গ' সাইটে পাবেন। তবে কিছুদিন আগে *ডাই উইথ জিরো* নামে একটি বই পড়ে খুব ভালো লেগেছে। সেই বই পড়ে উপলব্ধি হলো, জীবনের লক্ষ্য শুধু অর্থ ও সম্মান অর্জনই নয়, বরং 'পজিটিভ অভিজ্ঞতা' অর্জনের জন্য ফোকাসড থাকা উচিত। নিজের ভালো সময় কীভাবে কাটানো যায়, তা নিয়ে কাজ করা উচিত। অনেক

বইয়ের মধ্যে এই বই আমাকে খুব নাড়া দিয়েছে।

বিজ্ঞানচিন্তা : আপনি নিজে লেখালেখি করেন। এত ব্যস্ততার মধ্যে লেখালেখির পেছনে সময় দেওয়াটা নিশ্চয়ই কঠিন। এর পেছনে কি বিশেষ কোনো তাড়না কাজ করে? আপনার লেখালেখির কথা শুনতে চাই।

মশিউর রহমান : করপোরেট জগতে ইঁদুরদৌড়ের জন্য প্রতিযোগিতা না করে আমার ভাবনাগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই সময় ব্যয় করি এবং লেখালেখি করি। ছুটির দিনটি মূলত লেখালেখি করেই কাটে। তবে পাশাপাশি অনেক মানুষের সঙ্গেই আড্ডা দিই। খুব সীমাবদ্ধ সার্কেল নয়। আমি গণ্ডিটাকে বাড়িয়ে আমজনতা সবার সঙ্গে মিশে আড্ডা দিয়ে তাদের জীবনের গল্পগুলো শুনতে চাই, তাদের জীবনবোধটা বুঝতে চাই। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করে লেখার মাধ্যমে তা প্রকাশ করি। তবে সবার থেকে ভালোবাসা পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। লেখালেখির জন্য প্রযুক্তি ও সমাজের ক্ষেত্রের লোকজনের অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, তখন এই মানুষগুলোর কাছ থেকে প্রচুর সহায়তা পাই। তারা সাধারণত আমার সঙ্গে কোনো রাখঢাক ছাড়াই শেয়ার করে। আমি মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনি এবং পরবর্তী সময়ে নিজের পর্যবেক্ষণসহ তা লিখি। লেখালেখির জন্য প্রচুর বই পড়া এবং মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা—এই দুটি খুব সাহায্য করে। লেখালেখির মূল তাড়না হলো নিজের অভিজ্ঞতা ও ভাবনাগুলো শুধু নিজের মধ্যে না রেখে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এ ছাড়া লিখতে ভালোবাসি। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা লিখে যাচ্ছি, কখন সময় বয়ে গেছে টেরই পাইনি।

বিজ্ঞানচিন্তা : পুরো বিশ্বেই মানুষ এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠছে। এই গ্রাফে আপনি অনেকটা এগিয়ে আছেন, দীর্ঘদিন এ নিয়ে কাজ করছেন। আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণায় কীভাবে উন্নতি করতে পারে?

মশিউর রহমান : আগে যেহেতু তথ্য নিয়ে কাজ করার আমার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আছে, তাই নতুন করে নিজেকে আপডেট করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় দক্ষতা বাড়াচ্ছি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে কাজ করার জন্য মূলত চারটি জিনিস আমাদের প্রয়োজন—ভালো কম্পিউটিং ক্ষমতা বা লজিস্টিক, ভালো অ্যালগরিদম, ভালো তথ্য এবং সর্বোপরি দক্ষ জনবল। দুঃখের বিষয় হলো, এই চারটি জিনিসের সব কটিতেই বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা সবচেয়ে বেশি সুবিধা নিতে পারি আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে। আমাদের ভালো শিক্ষকের ও ভালো শিক্ষার রিসোর্সের (বই, তথ্য) ঘাটতি রয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে এখন আমাদের প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণ আলাদিনের প্রদীপের মতো ব্যবহার করতে পারে। পারসোনালাইজেশন শিক্ষার জন্য এটি অনেক কাজ করবে। আমার বিশ্বাস, সামনের কয়েক বছরে কোচিং সেন্টারগুলোয় ব্যবসা বন্ধ হতে পারে এই প্রযুক্তির কল্যাণে। ঘরে বসেই একজন শিক্ষার্থী সহজে নিজেকে স্কিল আপ করে তার দুর্বলতার জায়গাগুলো সমাধান করতে পারে এবং পরিশেষে নিজের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারে।

বিজ্ঞানচিন্তা : আমাদের দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে অনেক ভালো কম্পিউটার, সিপিইউ নেই; সুযোগ-সুবিধা নেই। সব মিলে আমাদের কতটা সুযোগ আছে এ ক্ষেত্র উন্নতি করার?

মশিউর রহমান : এ প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো আমাদের নেই। সেটা মেনেই আমাদের এগোতে হবে। এই প্রযুক্তির জন্য ভালো অ্যালগরিদমের খুব প্রয়োজন এবং এ ক্ষেত্রে আমাদের ছেলেমেয়েরা কাজ করতে পারে। আমাদের দেশের ছেলেরা যেহেতু থিওরিতে ভালো, তাই তারা যদি এ ধরনের অ্যালগরিদম তৈরিতে কাজ করে তবে সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ডেটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিংসহ মৌলিক প্রযুক্তি নিয়ে দক্ষতা অর্জন করলে আমরা উন্নতি করতে পারব। আর দক্ষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিজ্ঞানীদের এখন খুব চাহিদা। আমরা এ ক্ষেত্রে ফোকাস করে কাজ করতে পারি।

বিজ্ঞানচিন্তা : বিজ্ঞানচিন্তার বেশির ভাগ পাঠক কিশোর-তরুণ। তাদের জন্য এ নিয়ে আপনার পরামর্শ কী?

মশিউর রহমান : বিজ্ঞানচিন্তা আমাদের কিশোরদের বিজ্ঞানমনস্ক করতে অনেক ভূমিকা রাখছে। শিক্ষার্থীদের বলব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি একটি বড় রকমের জোয়ার নিয়ে আসবে। তাই এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ও গ্রহণ করে কীভাবে আমরা সুবিধা নিতে পারি, তা আমাদের পজিটিভভাবে নিতে হবে। এ প্রযুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৌলিক প্রযুক্তি যেমন ডেটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিং, ট্রান্সফরমার ও কোডিং শিখলে আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

একনজরে

পুরো নাম : মো. মশিউর রহমান
জন্মতারিখ ও স্থান : ১ জুন ১৯৭৫, রাজশাহী
বাবা : মো. মনসুর রহমান
মা : মাহবুবা রহমান
অবসর : ছবি তুলতে ভালোবাসি
প্রিয় বই : *স্যাপিয়েন্স : আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব হিউম্যানকাইন্ড, ইউভাল নোয়াহ হারারি*
প্রিয় লেখক : হুমায়ূন আহমেদ
প্রিয় মুভি : জাপানি সিনেমা *ওটোকো ওয়া সুরাই ইয়ো*





বিজ্ঞান উৎসব

বিজ্ঞানে বিকাশ

বিজ্ঞানচিন্তা bigganchinta.com | বিকাশ

নবীনের কেতন উড়িয়ে যাত্রা শুরু বিজ্ঞান উৎসবের

আবদুল গাফফার

গত ৩০ আগস্ট ২০২৫, শনিবার রাজধানীর মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে আয়োজিত হয় ঢাকা বিজ্ঞান উৎসব। খুদে বিজ্ঞানীদের নানা চমক এবং নানা আয়োজনে দিনটি হয়ে উঠেছিল সত্যিকারের উৎসব

ঘড়িতে তখন ঠিক সকাল ৯টা। সে মুহূর্তে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রাঙ্গণে ঢুকলে আপনি নিশ্চিত চমকে যেতেন। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে একদল শিক্ষার্থী। যত দূর চোখ যায়, খুদে বিজ্ঞানীদের স্তব্ধ সমুদ্র, থমকে আছে, যেন নবীনের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিতে চায় সব। সামনের মঞ্চে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। আরেকটি খুদে রোবট 'ওয়াল ই' মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমি বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করছি!'

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে বিশ্ব। বাংলাদেশও কি নয়? এ দেশের সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ছোঁয়া। রোবট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও শিল্পক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে। অনেকেই আবার আশঙ্কা করছেন উন্নত প্রযুক্তির আবির্ভাবে মানুষ না আবার কর্মহীন হয়ে পড়ে! ঠিক এমনই এক যুগসন্ধিক্ষণে বিজ্ঞানের মূল মর্ম শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বিজ্ঞানচিন্তা ও দেশের সবচেয়ে বড় মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান বিকাশ আয়োজন করেছে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ২০২৫।

৩০ আগস্ট, শনিবার। শরতের সকালটা হাজির বেশ স্নিগ্ধতা নিয়েই। সকালের কোমল আলো মাঝেমধ্যে বৃষ্টির আভাসও দিয়ে যাচ্ছে। তাতে শঙ্কিত আয়োজকেরা; কিন্তু বিজ্ঞানের তুর্কি তরুণদের রুখবে, বৃষ্টির সেই ধৃষ্টতা কি আছে! তাই তো সকাল আটটার আগেই রাজধানীর মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে খুদে বিজ্ঞানপ্রেমীদের জনস্রোত বইতে শুরু করে। রাজধানী তো বটেই, ঢাকা বিভাগের অন্যান্য শহরের শিক্ষার্থীদেরও পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে উৎসব প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানটায় সার বাঁধা স্টল। এগুলো সব প্রজেক্ট প্রদর্শনী ও বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ। এতগুলো স্টল, সব কানায়-কানায় পূর্ণ। শিক্ষার্থীরা মহোৎসবে, শরতের পাখির মতো কলধ্বনি করে স্টলে নিজেদের প্রজেক্ট সাজাচ্ছে, কেউবা নিচ্ছে কুইজের প্রস্তুতি।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সকাল ৯টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হলো। সেখানেই দেখা গেল ওই চমক। বিজ্ঞান উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করল রোবট 'ওয়াল ই'। এর আগে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেই সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও বিজ্ঞান উৎসবের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর বেলুন উড়িয়ে শুরু হয় উৎসবের আনুষ্ঠানিক যাত্রা। বিজ্ঞান উৎসবের ঢাকা আঞ্চলিক পর্বের ভেন্যুপ্রধান ছিলেন মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারজানা শাকিল। তিনিই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। আর উৎসবের পতাকা উত্তোলন করেন বিকাশের চিফ এক্সটারনাল অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স মেজর জেনারেল (অব.) শেখ মো. মনিরুল ইসলাম এবং বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটারবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ; ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ফিজিক্যাল সায়েন্সেস বিভাগের অধ্যাপক আরশাদ মোমেন; কার্টুনিস্ট ও রম্য পত্রিকা *উন্মাদ*-এর সম্পাদক আহসান হাবীব; বিজ্ঞানবক্তা আসিফ; বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার; *প্রথম আলো*র ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও কিশোর আলোর সম্পাদক কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক; অ্যাসোসিয়েশন ফর

এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ফারজানা আলম; বিকাশের ইভিপি ও হেড অব রেগুলেটরি অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স হুমায়ুন কবির, ভাইস প্রেসিডেন্ট সায়মা আহসান, ম্যানেজার মাহবুবুর রহমান শাকিল; বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার, সহসম্পাদক উচ্ছ্বাস তৌসিফ, কাজী আকাশসহ অনেকে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন আব্দুল কাইয়ুম। তিনি মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং বিকাশকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'কুসংস্কারমুক্ত, উৎপাদনশীল ও মননশীল জাতি গড়তে বিজ্ঞানকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়া জরুরি।' বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা জাগ্রত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ভেন্যুপ্রধান ফারজানা শাকিল বলেন, 'বিজ্ঞান উৎসবের মতো একটা বিশাল বিজ্ঞান আয়োজনের অংশ হতে পেরে আমরা গর্বিত। এই উৎসবের মাধ্যমে শিশুদের মেধা ও মনে বিজ্ঞানমনস্কতা আরও বাড়বে বলে আমি বিশ্বাস করি।'

'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পৃথিবীতে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই গতির সঙ্গে তাল মেলাতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমাদের দক্ষতা বাড়াতে হবে,' বলেন মেজর জেনারেল (অব.) শেখ মো. মনিরুল ইসলাম। তিনি আরও বলেন, 'বিকাশ একটা টেকনোলজিক্যাল ফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান। তাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক আছে। বিজ্ঞানচিন্তা দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের যৌথ পথচলার ফসল এই বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব। ভবিষ্যতেও বিজ্ঞান উৎসবের এই পথচলায় আমাদের অংশীদারত্ব অব্যাহত থাকবে।'

অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন, 'অন্ধকার কখনো অন্ধকারের বিনাশ করতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন আলো। মানবসভ্যতার অন্ধকার দূর করতে হলে বিজ্ঞানের জ্ঞান খুব জরুরি। এ জন্য শুধু বিজ্ঞানপাঠ যথেষ্ট নয়, বিজ্ঞানমনস্কতা জরুরি।'

অধ্যাপক আরশাদ মোমেন বলেন, 'বিজ্ঞান সাধনা ও পরিশ্রমের বিষয়। বিজ্ঞানী হতে গেলে শুধু পাঠ্যবই আর কয়েকটি বিজ্ঞান প্রজেক্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, বিজ্ঞানকে ধারণ করে পরিশ্রম করতে হবে।'

কার্টুনিস্ট আহসান হাবীব নিয়মিত বিজ্ঞানচিন্তা প্রকাশের জন্য বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদকমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিজ্ঞান উৎসবে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'বিজ্ঞান শিখতে হলে, বিজ্ঞানচর্চা চালিয়ে যেতে হলে বিজ্ঞানের বই পড়া জরুরি। তোমরা বেশি বেশি বই পড়ো, বিজ্ঞানচর্চা করো, হয়তো তোমাদের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসবে আগামী দিনের বড় বড় বিজ্ঞানী।'

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাশার বলেন, 'খেলাধুলার সঙ্গে বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু এখনো এ দেশের ক্রীড়াজগৎ প্রাযুক্তিক সুবিধার জন্য বাইরের দেশের ওপর নির্ভরশীল। আমি বিশ্বাস করি, আজকের উৎসবে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে ক্রীড়াজগতের বিদেশনির্ভরতা দূর করবে।'

ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং বিকাশকে ধন্যবাদ জানিয়ে কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক বলেন, 'জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতকে সমুন্নত রাখতে হলে আমাদের বিজ্ঞান ও আলোর পথে হাঁটতে হবে।'



প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে খুদে বিজ্ঞানীদের প্রজেক্ট দেখছেন অধ্যাপক আরশাদ মোমেন এবং একাডেমিক টিমের সদস্য আহমাদ মুদ্দাসসের

বিজ্ঞানবক্তা আসিফ বলেন, 'বিজ্ঞানচিন্তা দেশের স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে। বিজ্ঞান উৎসব সেই বিজ্ঞান প্রসারে বাড়তি সংযোজন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানবিষয়ক চিন্তার প্রসার ঘটানোর এই প্রয়াসকে আমি সাধুবাদ জানাই।'

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান কুইজ ও প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। এবারের বিজ্ঞান উৎসবে ১৫০-এর বেশি প্রজেক্ট নিয়ে এসেছে খুদে শিক্ষার্থীরা। বিজ্ঞানচিন্তার একাডেমিক টিম ও বিচারকেরা এসব প্রজেক্ট দেখে বিজয়ী বাছাই করেন। আর বিজ্ঞান কুইজে সাত শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়। সব মিলিয়ে ঢাকা বিভাগের ১২০টি স্কুলের সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ঢাকা বিজ্ঞান উৎসব হয়ে ওঠে খুদে বিজ্ঞানীদের বড় উৎসব।

কুইজ শেষে বেলা ১১টায় মূল মঞ্চে শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল চমকপ্রদ সব আয়োজন। এ সময় বিজ্ঞান ম্যাজিক দেখান জাদুশিল্পী রাজীব বসাক। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব। তারপর শিক্ষার্থীদের একের পর এক প্রশ্নে জমে ওঠে প্রশ্নোত্তর পর্ব। এসব প্রশ্নের উত্তর দেন মোহাম্মদ কায়কোবাদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক বি এম মইনুল হোসেন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটারবিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. খলিলুর রহমান, লেখক ও চিকিৎসক তানজিনা হোসেন এবং বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও চিকিৎসক সৌমিত্র চক্রবর্তী। পর্বটি সঞ্চালনা করেন বিজ্ঞানচিন্তার একাডেমিক দলের সদস্য শিবলী বিন সারওয়ার। আর পুরো অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন রুকাইয়া জহির।

এরপর বেলা একটায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ঢাকা আঞ্চলিক উৎসব। এ পর্ব সঞ্চালনা করেন শিবলী বিন সারওয়ার ও বিজ্ঞানচিন্তার সহসম্পাদক উচ্ছ্বাস তৌসিফ। এ সময় প্রশ্নোত্তর পর্বের অতিথিদের সঙ্গে যোগ দেন বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, ভেন্যুপ্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারজানা শাকিল এবং বিকাশ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির। এ পর্বে নিম্নমাধ্যমিক কুইজে সেরাদের সেরার স্থান জয় করে নিয়েছে ঢাকার গবর্নমেন্ট সায়েন্স হাইস্কুলের



● উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রোবট 'ওয়াল. ই'র সঙ্গে অতিথিরা



● উদ্বোধনী বক্তৃতা পর্বে বিজ্ঞানচিন্তার সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম, বিকাশের চিফ এক্সটারনাল অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার মেজর জেনারেল শেখ মো. মনিরুল ইসলাম (অব.), ভেন্যুপ্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারজানা শাকিল, অধ্যাপক আরশাদ মোমেন, কার্টুনিস্ট আহসান হাবীব, কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক, সাবেক ক্রিকেটার হাবিবুল বাশার, বিজ্ঞানবক্তা আসিফ ও অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ



● ব্র্যাক মঙ্গলতরি নিয়ে এসেছিল তাদের মার্স রোভার



● মঞ্চ মাতাচ্ছেন মেহরাব



● কুইজ পর্বে পরীক্ষা দিচ্ছে শিক্ষার্থীদের একাংশ





● মঞ্চ মাতাচ্ছেন তৌসিফ (বাঁয়ে ওপরে), জাদুর ঝাঁপি খুলে বসেছেন জাদুশিল্পী রাজীব বসাক (বাঁয়ে নিচে) এবং বেলুন উড়িয়ে উৎসবের সূচনা করছেন অতিথি ও নবীন বিজ্ঞানীরা







● প্রশ্ন আছে অনেক! ওপরে বাঁয়ে প্রশ্ন করতে হাত তুলেছে শিক্ষার্থীরা। ডানে এক শিক্ষার্থীকে দেখা যাচ্ছে প্রশ্ন করতে। মঞ্চে প্রশ্নোত্তর পর্বের অতিথিরা : অধ্যাপক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী, অধ্যাপক সৌমিত্র চক্রবর্তী, চিকিৎসক তানজিনা হোসেন, অধ্যাপক খলিলুর রহমান, অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ, অধ্যাপক বি এম মনিরুল ইসলাম, বিকাশ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির এবং বিজ্ঞানবক্তা আসিফ

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইবনুল ইশরাফ সাম্য, আর মাধ্যমিক কুইজে সেরাদের সেরা হয়েছে সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী তাহমিদ আল আসাদ।

প্রজেক্টে সেরাদের সেরা হয়েছে সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী রায়িন আর রাদ। ক্লাইমাকোর নামে তার প্রজেক্টটি ছিল একটি সম্পূর্ণ ফাংশনাল মোবাইল অ্যাপ। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে এটি ভূমিকা রাখবে। তবে এ ক্ষেত্রে বিজয়ী নির্ধারণে শুধু প্রজেক্টের বিষয়বস্তু বা প্রজেক্টটি নয়, বড় ভূমিকা রেখেছে এর পেছনের কোডিং থেকে শুরু করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপারে রায়িনের জ্ঞান। প্রতিটি জিনিস সে বুঝে করেছে, আর এর ওপরই জোর দিয়েছেন বিচারকেরা।

সব মিলিয়ে নিম্নমাধ্যমিকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় ১৭ জনকে, মাধ্যমিকে ১৫ এবং ১৭টি বিজ্ঞান প্রজেক্টে মোট ৪১ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এই বিজয়ী শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান উৎসবের জাতীয় পর্বে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে।

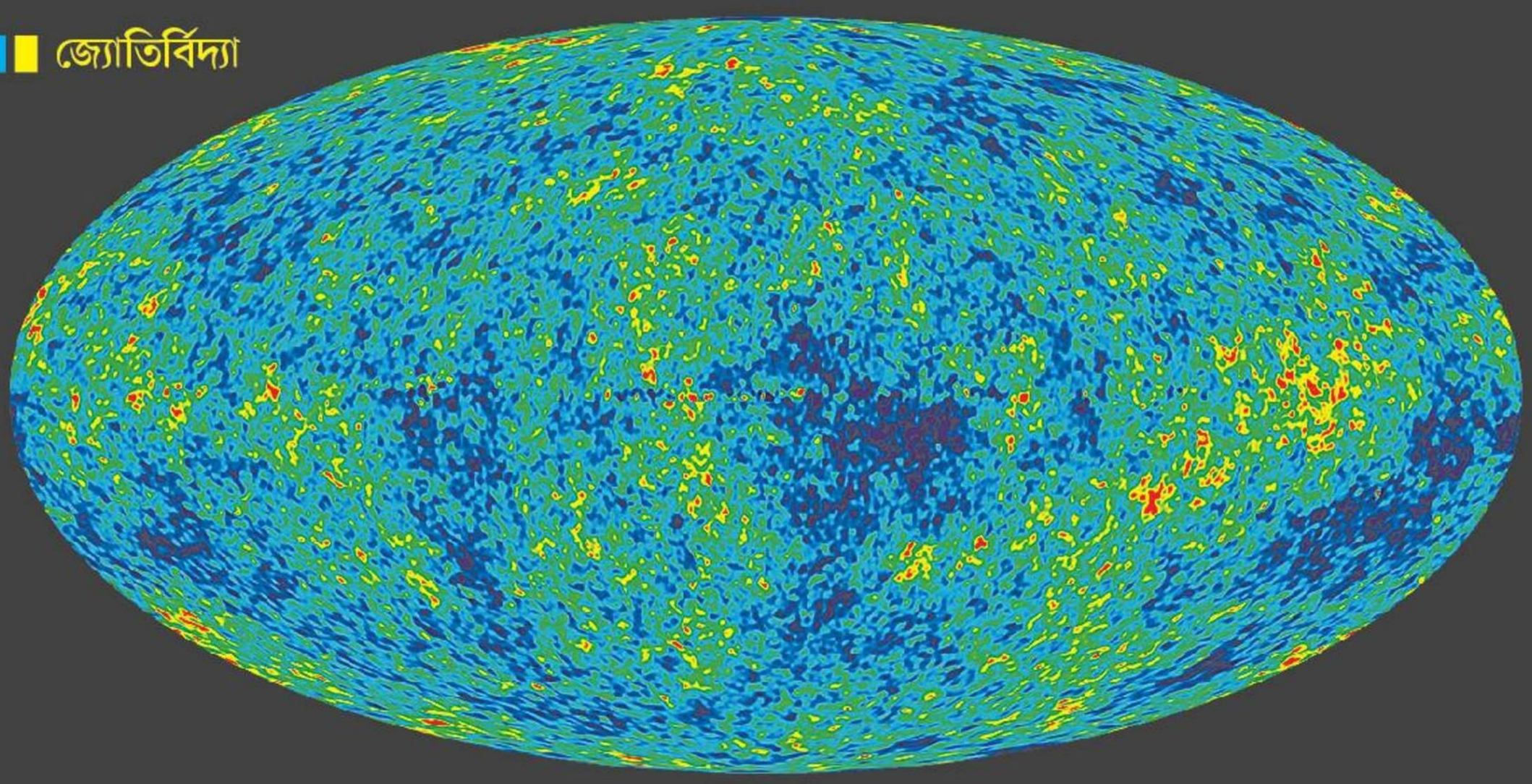
ঢাকা, রংপুর ও রাজশাহী ছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে অনুষ্ঠিত হবে বিজ্ঞান উৎসবের আঞ্চলিক পর্ব। রংপুরে ১২ সেপ্টেম্বর ও রাজশাহীতে ১৩ সেপ্টেম্বর আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসব আয়োজিত হয়। এরপরে যথাক্রমে ১৯ সেপ্টেম্বর খুলনা, ২০ সেপ্টেম্বর বরিশাল, ২৬ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম এবং ২৭ সেপ্টেম্বর সিলেটে আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসব আয়োজিত হবে। সবশেষে জাতীয় পর্বের মাধ্যমে শেষ হবে এ আয়োজন।

উৎসবে ষষ্ঠ-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রজেক্ট প্রদর্শনী ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে একটি ক্যাটাগরি ও কুইজ প্রতিযোগিতায় দুটি ক্যাটাগরি রয়েছে। কুইজে নিম্নমাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নিচ্ছে ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা, আর মাধ্যমিক ক্যাটাগরিতে অংশ নিচ্ছে নবম-দশম শ্রেণি ও চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা। শুধু নিবন্ধনকারী শিক্ষার্থীরাই এসব প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।

এবারের ঢাকা আঞ্চলিক বিজ্ঞান উৎসবের হেলথকেয়ার পার্টনার হিসেবে সার্বক্ষণিক প্রতিযোগী ও অভিভাবকদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্ন্যাকস পার্টনার ড্যান ফুডস লিমিটেড এবং সহযোগিতায় ছিল বন্ধুসভা। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে ছিল আদর্শ, অনুপম প্রকাশনী, জ্ঞানকোষ, প্রথমা প্রকাশন, ব্র্যাক মঙ্গলতরি এবং টিম অ্যাটলাসের স্টল।

বিজ্ঞান উৎসবের আরও খবর জানতে চোখ রাখুন bigganchinta.com-এ, বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসব ও বিজ্ঞানচিন্তার ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে এবং *প্রথম আলোয়*।

* বিজ্ঞান উৎসবের সব ধরনের নিউজ ও আপডেট পেতে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন



সিএমবি ফোটনের আসল উৎস কী

দীপেন ভট্টাচার্য

বিগ ব্যাংয়ের প্রায় ৩ লাখ ৮০ হাজার বছর পর ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলে হাইড্রোজেন পরমাণু গঠন করে। এর ফলে ইলেকট্রনের বাধা থেকে মুক্তি পায় ফোটন, ছড়িয়ে পড়ে মহাবিশ্বজুড়ে। মহাবিশ্বের সেই প্রথম আলো, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে, মহাবিশ্বের একদম প্রথম সময়ের তাপ বিকিরণের অবশিষ্ট আলোই হলো সিমবি। এই সিমবি ফোটনগুলোর উৎস কী?

কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ডকে আমরা ছোট করে বলি সিএমবি (CMB)। বাংলায় মহাজাগতিক মাইক্রোওয়েভ পটভূমি বলা যায়। সিএমবি হলো মহাবিশ্বের একদম প্রথম সময়ের তাপ বিকিরণের অবশিষ্ট আলো। বিগ ব্যাংয়ের প্রায় ৩ লাখ ৮০ হাজার বছর পর তাপমাত্রা যখন ৩ হাজার কেলভিনে নেমে এল, তখন ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলে নিউট্রাল হাইড্রোজেন পরমাণু গঠন করে। এর ফলে ইলেকট্রন আর মুক্ত থাকে না এবং ইলেকট্রন থেকে ফোটন আর বিচ্ছুরিত হতে পারে না। ফলে সেই আদি ঘন হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম গ্যাসের মধ্যে ফোটন অবাধে চলতে পারে। সেসব ফোটনই আজ ১৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন বছর পর মহাবিশ্বের দূর প্রান্ত থেকে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গে পরিণত হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে। আর দূর প্রান্তের গ্যালাক্সিদের কাছেও 'আমাদের এলাকার' সিএমবি সবে পৌঁছাচ্ছে, যদিও আমাদের এলাকা বলতে নির্দিষ্ট কিছু নেই।

কিন্তু এই যে সিএমবি, সেগুলোর আদি উৎস কী; অর্থাৎ সেসব ফোটন কখন সৃষ্টি হয়েছে?

এর উত্তর পেতে আমাদের ফিরে যেতে হবে মহাবিশ্বের একদম আদিলগ্নে—বিগ ব্যাংয়ের সময়ে, কিন্তু 'বিগ ব্যাং' মহাবিশ্বের সূচনা ছিল না। একেবারে শুরুতে কী ছিল, সেটা অবশ্যই অনিশ্চিত, কিন্তু বর্তমানের অনেক বৈজ্ঞানিক মডেল অনুসারে, মহাবিশ্বের শুরু ছিল 'কিছু না'-এর মধ্যে একটা কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের ফলে স্থান ও সময়ের সৃষ্টি এবং একই সঙ্গে একটি স্ক্যালার ক্ষেত্রের (যাকে বলা হয় ইনফ্ল্যাটন ক্ষেত্র) জন্ম। আর বিগ ব্যাংয়ের প্রচণ্ড ঘন ও উত্তপ্ত অবস্থার জন্য আমাদের একটু অল্প সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যখন সেই ইনফ্ল্যাটন ক্ষেত্রের স্থিতিশক্তি এক সময়ে একটি এক্সপোনেনশিয়াল প্রসারণ ঘটায়। একে আমরা বলি ইনফ্লেশন বা অতিস্ফীতি। এই অতিস্ফীতির শেষ পর্যায়ে পুনঃউষ্ণায়ন নামে একটি সময়ে কণা, বিকিরণ ও তাপ সৃষ্টি হয়। এই অতিস্ফীতি এবং উষ্ণায়নই হলো বিগ ব্যাং।

অনেক অতিস্ফীতি মডেলের মতে, ইনফ্লেশনের সূচনা ঘটে গ্র্যান্ড ইউনিফায়েড থিওরি বা গাট-এর (GUT) প্রতিসাম্য ভাঙন থেকে, মহাবিশ্বের সূচনার 10^{-36} সেকেন্ড পর। বিজ্ঞানীরা

মনে করছেন, এই সময়ে যখন শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়া দুর্বল এবং তড়িৎ-চুম্বকীয়; অর্থাৎ তড়িৎ-দুর্বল মিথস্ক্রিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায়, তখন থেকেই ইনফ্ল্যাটন ক্ষেত্র তার প্রসারণ শুরু করে। এই পর্যায়ে তাপমাত্রা ছিল প্রায় 10^{16} গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট (GeV) বা প্রায় 10^{29} কেলভিন। তুলনায় বলা যায়, একটি দৃশ্যমান ফোটনের শক্তি এক ইলেকট্রন ভোল্টের মতো।

এই মডেল অনুযায়ী, অতিস্ফীতির এই সময় ছিল খুব অল্প। মাত্র -10^{-36} সেকেন্ড থেকে 10^{-32} সেকেন্ড পর্যন্ত। এই সময়ে মহাবিশ্বের আকার বেড়ে যায় প্রায় e^{60} গুণ; অর্থাৎ প্রায় 10^{26} গুণ। আলো 10^{-36} সেকেন্ডের মধ্যে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে—যাকে আমরা মহাবিশ্বের ক্যাজুয়াল হরাইজন বলি, সেটা 3×10^{-28} মিটার হলে, মাত্র 10^{-32} সেকেন্ডের মধ্যে সেটি বেড়ে হয়ে যাবে 3 সেন্টিমিটারের মতো! অর্থাৎ ওইটুকু সময়ের মধ্যে মহাবিশ্বের ব্যাস এক লাখ কোটি কোটি কোটি গুণ বেড়েছিল। 3×10^{-28} মিটার সংখ্যাটা কোথা থেকে এল? আলোর গতিতে প্রায় শূন্য থেকে মহাবিশ্ব 10^{-34} সেকেন্ডে $(10^{-36} \times 3 \times 10^{8}) = 3 \times 10^{-28}$ মিটার ব্যাস অর্জন করবে।

যখন ইনফ্ল্যাটন ক্ষেত্র তার স্থিতশক্তি হারিয়ে ফেলতে থাকে, তখন অতিস্ফীতি শেষ হয়। এই অবক্ষয়ের (Decay) মাধ্যমেই পুনঃউষ্ণায়ন হয়; অর্থাৎ মহাবিশ্বে প্রথমবারের মতো তাপীয় (Thermal) কণা এবং বিকিরণ তৈরি হয়। অতিস্ফীতির আগে কোনো তাপীয় প্লাজমা ছিল না এবং কণা বলতে যা বোঝায়—যেমন ঘনভাবে ছড়িয়ে থাকা, পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়া ও সমভাবে তাপমাত্রা বণ্টন হওয়া—এমন অবস্থা তখন ছিল না। কাজেই উষ্ণায়নের সময়ই শুধু তাপমাত্রার ধারণা অর্থবহ হয়। কারণ, তখন মহাবিশ্বে বিপুলসংখ্যক কণা এবং বিকিরণ একটি তাপীয় সাম্যাবস্থা (Thermal equilibrium) তৈরি করে। উষ্ণায়নের সময় মহাবিশ্বের তাপমাত্রা ছিল প্রায় 10^{15} GeV বা 10^{28} কেলভিন। এই সময় তৈরি হয় : কোয়ার্ক ও প্রতিকোয়ার্ক, লেপটন ও প্রতিলেপটন, গ্লুয়ন, হিগস এবং W, Z, B নামে বিভিন্ন গেজ বোসন।

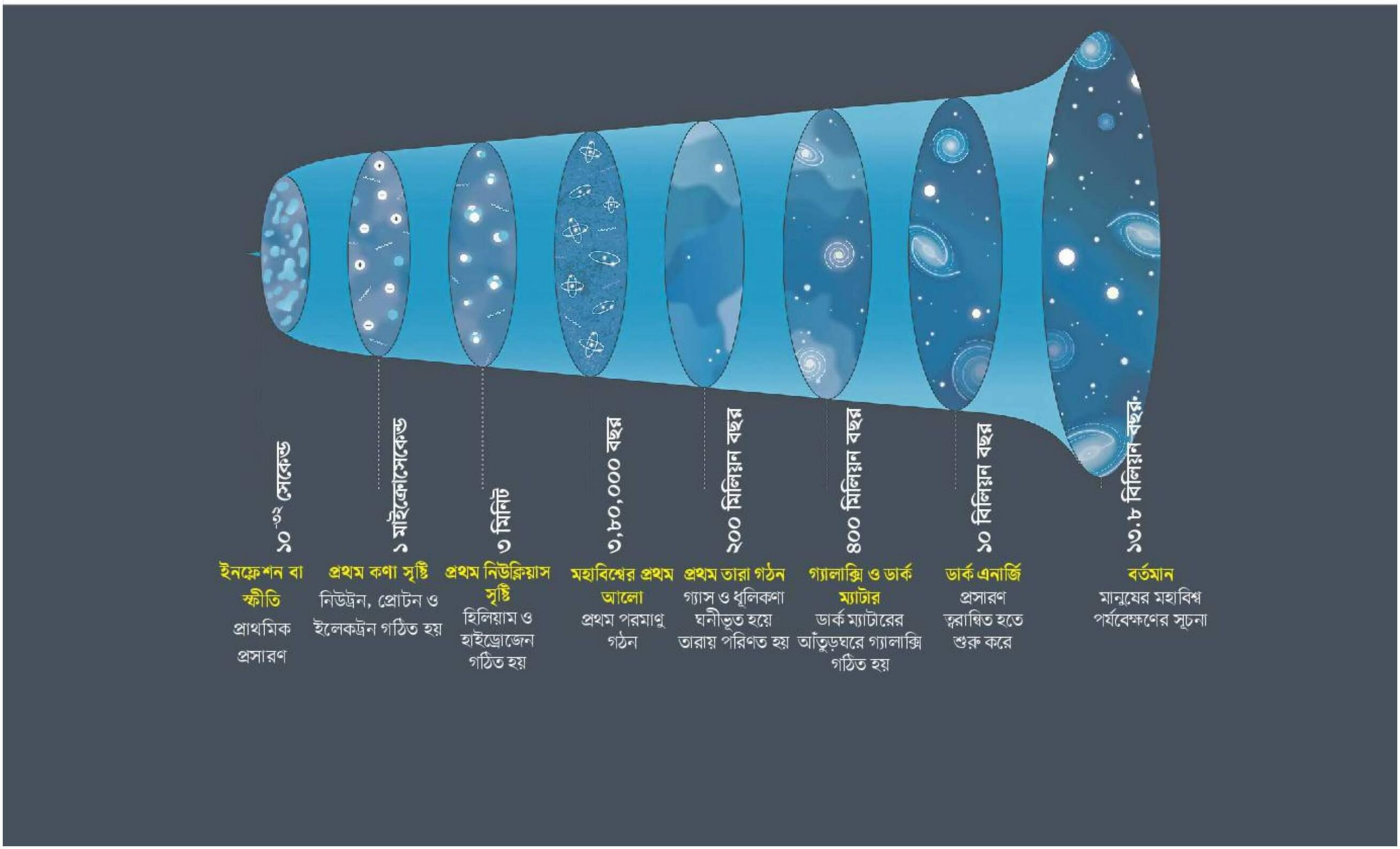
উষ্ণায়নের পর মহাবিশ্ব ভরে যায় কণা ও প্রতিকণায়। কিন্তু আজ আমরা যে মহাবিশ্ব দেখি, তাতে প্রতিপদার্থের (Anti-matter) পরিমাণ খুব অল্প। তাহলে প্রতিপদার্থ কোথায় গেল? এই যে অসাম্য (Asymmetry); অর্থাৎ প্রতিপদার্থের স্বল্পতা, তার পেছনে থাকতে হবে কোনো প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে ব্যারিওজেনেসিস, এবং এটি ঘটে 10^{-32} সেকেন্ড থেকে 10^{-6} সেকেন্ড সময়ের মধ্যে। ব্যারিওজেনেসিসের ফলে মহাবিশ্বে পদার্থের পরিমাণ প্রতিপদার্থ থেকে একটু বেশি হয়। প্রতি 10^{9} জোড়া কোয়ার্ক ও প্রতিকোয়ার্কের পারস্পরিক বিনাশের পরও ১টি ব্যারিয়ন; অর্থাৎ তিনটি কোয়ার্কের সমষ্টি বেঁচে থাকে; অর্থাৎ সব প্রতিপদার্থ ধ্বংস হয়ে কিছু পদার্থ থেকে যায়।

তারপর আসে তড়িৎ-দুর্বল প্রতিসাম্য ভাঙন, যার ফলে হিগসপ্রক্রিয়া সক্রিয় হয় এবং W ও Z গেজ বোসন ভর পায়। এটি ঘটে প্রায় 10^{2} GeV ($\sim 10^{15}$ K) তাপমাত্রায়, যখন মহাবিশ্বের বয়স ছিল মাত্র 10^{-12} সেকেন্ড। এ সময়ে B^{0} ও W^{3} ক্ষেত্র একত্রে মিশে নির্দিষ্ট গেজ বোসন রূপে ফোটনের পরিচয় নির্ধারণ করে; অর্থাৎ 'ফোটন' তখন স্পষ্টভাবে আলাদা হয়, যদিও বিকিরণ হিসেবে ফোটনধর্মী কণা আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল।

আর সৃষ্টির 10^{-6} সেকেন্ড পর তাপমাত্রা যখন ২০০ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট বা 0.2 GeV অথবা 10^{12} কেলভিনে নেমে আসে, দুটি কোয়ার্ক মিলে তৈরি করে মেসন আর তিনটি কোয়ার্ক মিলে তৈরি করে ব্যারিয়ন। ব্যারিয়ন আর মেসনকে একত্রে হ্যাড্রন বলে। এই যে 'হ্যাড্রোনাইজেশন পর্ব', এটা শুরু হয় 10^{-6} সেকেন্ডে এবং শেষ হয় 10^{-5} সেকেন্ডের মধ্যে।

আমরা অনেক সময় ভাবি, এই সময়জুড়ে কোয়ার্ক ও অ্যান্টিকোয়ার্কের মধ্যে যে পারস্পরিক ধ্বংস, তার ফলে যে ফোটনের উৎপত্তি, সেটাই আজ আমরা সিএমবি হিসেবে দেখি। দেখা যাক এটা সত্য কি না। 10^{-36} থেকে 10^{-32} সেকেন্ড—এটা হলো অতিস্ফীতির সময়। এই সময়ে মহাবিশ্ব ছিল একদম কণাশূন্য। না কোনো কোয়ার্ক, না কোনো প্রতিকোয়ার্ক। তাই এখানে কোয়ার্ক-প্রতিকোয়ার্ক পাস্পরিক বিনাশের প্রশ্নই ওঠে না।

দ্বিতীয় সময়টা হলো 10^{-32} থেকে 10^{-12} সেকেন্ড। এখন উষ্ণায়নের পর মহাবিশ্ব অনেক গরম, তাপীয় কণা জন্ম নিচ্ছে। এখন অনেক কোয়ার্ক-প্রতিকোয়ার্ক জুটি সৃষ্টি হচ্ছে, আর তারা ধ্বংস হয়ে তৈরি করছে। শক্তিশালী মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুয়ন এবং



তড়িৎ-দুর্বল গেজ ক্ষেত্র দিয়ে B^0 এবং W^3, কিন্তু ফোটন এখনো তৈরি হয়নি। কারণ, এখনো তড়িৎ-দুর্বল প্রতিসাম্য ভাঙেনি।

তৃতীয় সময়টা হলো 10^{-12} থেকে 10^{-6} সেকেন্ড, তখন তড়িৎ-দুর্বল প্রতিসাম্য ভেঙে গেছে। W^3 এবং B^0 ফিল্ড মিলিয়ে তৈরি হয়েছে ফোটন—আমাদের পরিচিত আলোবাহী কণা।

এই সময় থেকে কোয়ার্ক-প্রতিকোয়ার্ক জুটি পরস্পরকে ধ্বংস করে সৃষ্টি করেছে ফোটন। কিন্তু সেই ফোটনের শক্তি অনেক বেশি, GeV মতো। প্রাথমিক সময়ের সেই ফোটনগুলোর শক্তি এত উচ্চ ছিল যে তারা তাপীয় ভারসাম্যে পৌঁছাতে পারেনি। বারবার জোড়া সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় তারা আবার কোয়ার্ক-প্রতিকোয়ার্কে রূপান্তরিত হতো; অর্থাৎ সেসব প্রাথমিক ফোটন স্বাধীন কণা হিসেবে টিকে থাকার সুযোগ পেত না। তাই বলা যায়, সিএমবি ফোটনে কোয়ার্ক-প্রতিকোয়ার্ক ধ্বংসের অবদান থাকলেও সেটা প্রধান নয়। তাহলে সেটা কী? সেটা হলো ইলেকট্রন-পজিট্রনের পারস্পরিক বিনাশ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মহাবিশ্ব প্রসারিত ও ঠান্ডা হতে থাকে এবং যখন তাপমাত্রা ইলেকট্রনের স্থিতভরের নিচে নেমে আসে; অর্থাৎ প্রায় 0.5 MeV, তখন থেকেই ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়ার পারস্পরিক ধ্বংসের হার বাড়তে থাকে এবং এর বিপরীতে নতুন ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়া সৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। ইলেকট্রন-পজিট্রন ধ্বংস থেকে যে ফোটনগুলো সৃষ্টি হয়, সেগুলো অন্য মুক্ত ইলেকট্রন বা প্রোটন-নিউট্রনের সঙ্গে বারবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষগুলো থমসন বা কম্পটন স্ক্যাটারিংয়ের মাধ্যমে ঘটে। এখানে বলে রাখি, এই সময় পজিট্রনের সংখ্যা ইলেকট্রনের তুলনায় সামান্য কম ছিল; কারণ, ব্যারিওজেনেসিসের মতোই লেপটোজেনেসিসের ফলে একটু সামান্য ইলেকট্রন-অধিক্য মহাবিশ্বে দেখা গিয়েছিল। ঠিক যেমন প্রতিকোয়ার্কের তুলনায় সামান্য বেশি কোয়ার্ক টিকে ছিল, তেমনই পজিট্রনের তুলনায় ইলেকট্রন সামান্য বেশি ছিল। এই সামান্য অসমতাই পরবর্তী সময়ে মহাবিশ্বের দৃশ্যমান পদার্থ এবং ফোটন ঘনত্ব নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা রাখে। ইলেকট্রন-পজিট্রন পারস্পরিক ধ্বংসপ্রক্রিয়া ১ সেকেন্ডে শুরু হয় এবং ১০ সেকেন্ডের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। কারণ, তখন আর পজিট্রন থাকে না, বাড়তি ইলেকট্রনগুলো থেকে যায়। মহাবিশ্ব এই সময়ে বিকিরণ দিয়ে ভরা। এসব নতুন ফোটন এখন নানা বিক্রিয়ার ফলে তাদের শক্তি হারাতে থাকবে এবং তাপীয় ভারসাম্যের দিকে এগোবে। এরপর মহাবিশ্বে সেই সময়ে নতুন করে উচ্চ শক্তির ফোটনের উৎপত্তি হয়নি। তাই এই ইলেকট্রন-পজিট্রন পারস্পরিক ধ্বংসের ফোটনগুলোই ছিল সিএমবির তাপীয় ফোটনের জন্য শেষ ও সবচেয়ে দৃশ্যমান অবদান। এসব ফোটন পুরোপুরি তাপীয় ভারসাম্য অর্জন করে পরবর্তী সময়ে নিউট্রাল হাইড্রোজেন গঠন হলে মুক্ত হয়ে সিএমবির আকারে আমাদের চোখে পড়ে।

ফোটনদের তাপীয় ভারসাম্য মূলত হয় ইলেকট্রন এবং অন্যান্য কণার সঙ্গে সংঘর্ষে। এর ফলে তাদের শক্তি ক্রমাগত কমতে থাকে এবং তারা আর তাদের মূল উৎসের তথ্য বহন করে না; বরং শুধুই তাপীয় গ্যাসের চরিত্র অনুযায়ী আচরণ করে, ইলেকট্রন গ্যাসের নির্দিষ্ট গড় তাপমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শক্তিতে সে উপনীত হয়। এটা অনেকটা ঠান্ডা ভাতের সঙ্গে গরম ডালের মিশ্রণ যেমন তাপীয় বণ্টনে একটা মিশ্র ফলাফল দেয়, এখানে গরম ডালকে আপনি ফোটন গ্যাস বলে ধরে নিতে পারেন। এই তাপীয় ভারসাম্যের ফলেই আমরা CMB-তে একটি নিখুঁত কৃষ্ণবস্তু (Blackbody) বর্ণালি দেখতে পাই। কারণ, সেই ফোটনগুলো উষ্ণায়ন, কণার ধ্বংস বা অন্য উৎস থেকে এলেও, সেই উৎসের সংকেত বহন করে না।

সময় (সেকেন্ড)	পর্যায়ের নাম	কী ঘটেছে
$10^{-36} - 10^{-32}$	অতিস্ফীতি (Inflation)	ইনফ্ল্যাটন ক্ষেত্রের কারণে মহাবিশ্বের আকার e^{60} গুণ বৃদ্ধি; মহাবিশ্ব প্রায় কণাশূন্য, কোনো কোয়ার্ক বা প্রতিকোয়ার্ক নেই।
10^{-32} (মডেল নির্ভর)	পুনঃউষ্ণায়ন (Reheating)	ইনফ্ল্যাটন ক্ষেত্রের অবক্ষয় থেকে প্রথম তাপীয় কণা ও বিকিরণ তৈরি; কোয়ার্ক, প্রতিকোয়ার্ক, লেপটন, প্রতিলেপটন, গ্লুয়ন, হিগস, W, Z, B গেজ বোসন উৎপত্তি।
$10^{-32} - 10^{-6}$	ব্যারিওজেনেসিস	পদার্থ-প্রতিপদার্থ অসমতা গড়ে ওঠা; প্রতি 10^9 জোড়া কোয়ার্ক-প্রতিকোয়ার্ক ধ্বংসের পর ১টি ব্যারিয়ন টিকে থাকা।
10^{-12}	তড়িৎ-দুর্বল প্রতিসাম্য ভাঙন	হিগস প্রক্রিয়া সক্রিয়; W^3 এবং B^0 ক্ষেত্র মিশে ফোটন গঠন; আলোবাহী কণার স্পষ্ট উদ্ভব।
$10^{-12} - 10^{-6}$	প্রাথমিক ফোটন উৎপাদন	কোয়ার্ক-প্রতিকোয়ার্ক ধ্বংসে ফোটন তৈরি, কিন্তু GeV-শ্রেণির ফোটন তাপীয় ভারসাম্যে পৌঁছাতে না পেরে আবার জোড়া-সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বিলীন।
$10^{-6} - 10^{-5}$	হ্যাড্রোনাইজেশন	কোয়ার্ক মিলে মেসন ও ব্যারিয়ন গঠন; হ্যাড্রন পর্যায়ের সূচনা ও সমাপ্তি।
1 - 10	ইলেকট্রন-পজিট্রন বিনাশ (Annihilation)	তাপমাত্রা 0.5 MeV-এ নেমে এলে ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়া ধ্বংস; প্রচুর ফোটন তৈরি হয়, যা তাপীয় ভারসাম্যে পৌঁছায়; সেগুলো CMB-এর প্রধান তাপীয় ফোটন হিসেবে অবশিষ্ট থাকে।
3.8×10^{-5} বছর	পুনঃসংযোজন (Recombination)	ইলেকট্রন ও প্রোটন মিলে নিউট্রাল হাইড্রোজেন গঠন; ফোটন মুক্ত হয়ে আজকের CMB হিসেবে দৃশ্যমান।

লেখক : অধ্যাপক ও জ্যোতিঃপদার্থবিদ, মোরেনোভ্যালি কলেজ,
ক্যালিফোর্নিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

ধাঁধা

বাগান-রহস্য

আইনস্টাইনের ধাঁধা বা আইনস্টাইনস রিডল। বলা হয়, মাত্র ২ শতাংশ মানুষ এ ধরনের ধাঁধার উত্তর দিতে পারেন। বাকি ৯৮ শতাংশই ভুল করেন। আপনি কোন দলে? ভালো কথা, মাথা খাটিয়ে সমাধান করতে পারলে রয়েছে বিশেষ পুরস্কার। তাহলে হয়ে যাক!

ঢাকার একটি নিরিবিলি আবাসিক এলাকায় পাশাপাশি পাঁচটি বাড়ি। বাড়িগুলোর নম্বর ১০১ থেকে ১০৫। এ পাঁচ বাড়ির মালিকদের প্রত্যেকের বাগান করার শখ। তবে তাঁদের প্রত্যেকের পছন্দের ফুল, বাগানের সরঞ্জাম ও পোষা প্রাণী ভিন্ন। তাঁরা সবাই মিলে ঠিক করেছেন, এলাকার বর্ষসেরা বাগানমালিক প্রতিযোগিতা করবেন। সমস্যা হলো, বিচারক আসার আগে সব তথ্য কেমন যেন জট পাকিয়ে গেছে। আপনার কাজ হলো নিচের সূত্রগুলো ব্যবহার করে এই জট ছাড়ানো। খুঁজে বের করতে হবে, কোন বাড়িতে কে থাকেন, কার বাগানে কোন ফুল ফোটে, তিনি কোন সরঞ্জাম ব্যবহার করেন এবং কোন প্রাণীটি পোষেন। প্রথমে তথ্যগুলো দেখে নেওয়া যাক—

১. সেলিম সাহেব থাকেন ১০৩ নম্বর বাড়িতে।

২. যিনি গোলাপের বাগান করেন, তিনি গাছের ডালপালা ছাঁটার জন্য কাঁচি ব্যবহার করেন।

৩. করিম সাহেবের বাড়িটি একেবারে প্রথমে।

৪. একেবারে শেষ বাড়ির মালিক হলেন রহিম সাহেব এবং তিনি একটি কুকুর পোষেন।

৫. বশির সাহেবের পোষা প্রাণীটি মানুষের মতো কথা বলতে পারে।

৬. যিনি বাগানের কাজে নিড়ানি ব্যবহার করেন, তাঁর বাড়িতে একটি মাছের অ্যাকুয়ারিয়াম আছে।



৭. যাঁর বাড়িতে বেলি ফুলের গাছ, তিনি গাছে পানি দেওয়ার জন্য ঝরনা ব্যবহার করেন। তাঁর বাড়িটি করিম সাহেবের বাড়ির ঠিক পাশেই।

৮. কোদাল ব্যবহারকারী মানুষটি একটি খরগোশ পোষেন।

৯. গন্ধরাজ ফুলের বাগানটি কুকুরের মালিকের।

১০. সেলিম সাহেব তাঁর বাগানে গোলাপ ফুটিয়েই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান।

এখন খুঁজে বের করুন, জবা ফুলের বাগান আছে কার?

এই ধাঁধা ধাপে ধাপে সমাধান করা খুব সহজ। চাইলে নিচের ছকের মতো একটা ছক বানিয়েও নিতে পারেন।

বাড়ির নম্বর : ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪ ও ১০৫
মালিকের নাম : সেলিম, করিম, বশির, রহিম ও জামিল
ফুলের নাম : গোলাপ, বেলি, শিউলি, গন্ধরাজ, জবা
সরঞ্জামের নাম : কাঁচি, ঝরনা, নিড়ানি, বেলচা ও কোদাল
পোষা প্রাণী : মাছ, বিড়াল, কুকুর, খরগোশ ও টিয়া

বৈশিষ্ট্য	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
মালিকের নাম					
ফুলের নাম					
সরঞ্জামের নাম					
পোষা প্রাণী					

আইনস্টাইনের ধাঁধার গত সংখ্যার বিজয়ী

আহনাফ ইসলাম রৌদ্র, হাফরাস্তা, নাটোর
নানজিব ফাহিম, কদমতলী, ঢাকা
ইফাদ আমীন, রাজেন্দ্রপুর, ঢাকা

সমাধান পাঠিয়ে জিতে নিন পুরস্কার!

একটি কাগজে বড় করে লিখুন 'আইনস্টাইনের ধাঁধা', তারপর উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন। খামের ওপর বড় করে লিখতে হবে 'আইনস্টাইনের ধাঁধা', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে দৈবচয়নে তিনজন পাবেন বিশেষ পুরস্কার! উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

উত্তর পাঠান : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।



৳ ৩০০

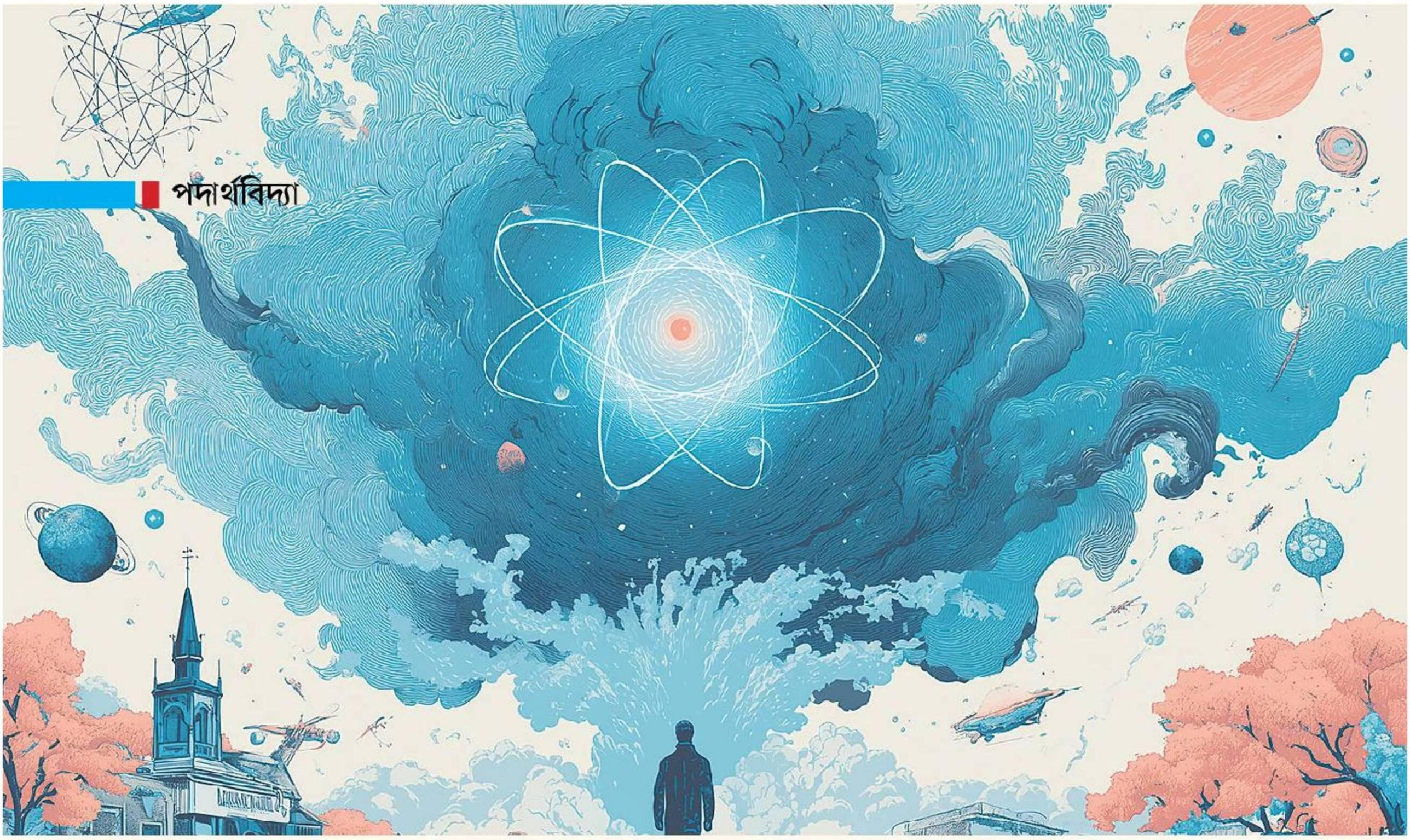
ঝটপট গণিত
সহজ কলাকৌশল
কাজী আকাশ

বইটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যাতে ৩০ দিনে সবাই শেষ করতে পারেন। এক মাস পরে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের সমাধান করা যাবে নিমেষে।

ঘরে বসে বই পেতে www.prothoma.com ০১৭৩০০০০৬১৯

প্রথমা প্রকাশন

কারওয়ান বাজার ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭
শাহবাগ ০১৯৫৫৫৫২১৭৬
শেফ'স টেবিল ০১৭৩০০০০৬০০
বাংলাবাজার ০১৭৩০০০০৬৪৮
সিলেট ০১৭০৮৪৩৫৫৭৯



প্রহেলিকাময় কোয়ান্টাম তত্ত্ব

প্রদীপ দেব

‘কোয়ান্টাম জগৎ বলে আসলে কিছু নেই। কোয়ান্টাম দশার অস্তিত্ব আছে শুধু আমার মাথার ভেতর, যা দিয়ে আমি অঙ্ক করি। কোয়ান্টাম অবস্থা বড়জোর কিছু তথ্যের বর্ণনা দেয়। বাস্তব জগতের সঙ্গে তাদের খুব একটা মিল নেই।’ কথাগুলো শুনে মনে হতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী কোয়ান্টাম মেকানিকসের দুর্বোধ্যতায় বিরক্ত ও ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। কিন্তু আমাদের অবাক করে দিয়ে সম্প্রতি কোয়ান্টাম মেকানিকস সম্পর্কে এ কথা বলেছেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানী আন্তন সাইলিঙ্গার (Anton Zeilinger), যিনি ২০২২ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কোয়ান্টাম মেকানিকসের নীতির পরীক্ষণ প্রমাণের জন্য।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সবচেয়ে সফল তত্ত্বগুলোর অন্যতম এই কোয়ান্টামতত্ত্ব। আধুনিক প্রযুক্তির বেশির ভাগই কম্পিউটারের চিপ থেকে শুরু করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রাণরক্ষাকারী জটিল যন্ত্রপাতির সবকিছুতেই কোয়ান্টামতত্ত্ব কাজে লাগছে। আমাদের শরীরের অতিসূক্ষ্ম কোষের জটিল কাজকর্ম ব্যাখ্যা হোক, কিংবা হোক মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন—সবকিছুতেই সফলভাবে কাজ করছে কোয়ান্টামতত্ত্ব। এমন এক কার্যকর তত্ত্বের বাস্তব কোনো জগৎ নেই বলার অর্থ কি পুরো কোয়ান্টামতত্ত্বকেই অস্বীকার করা? নোবেলজয়ী কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানী যদি কোয়ান্টাম জগৎ অস্বীকার করেন, তবে আমরা কোথায় যাই!

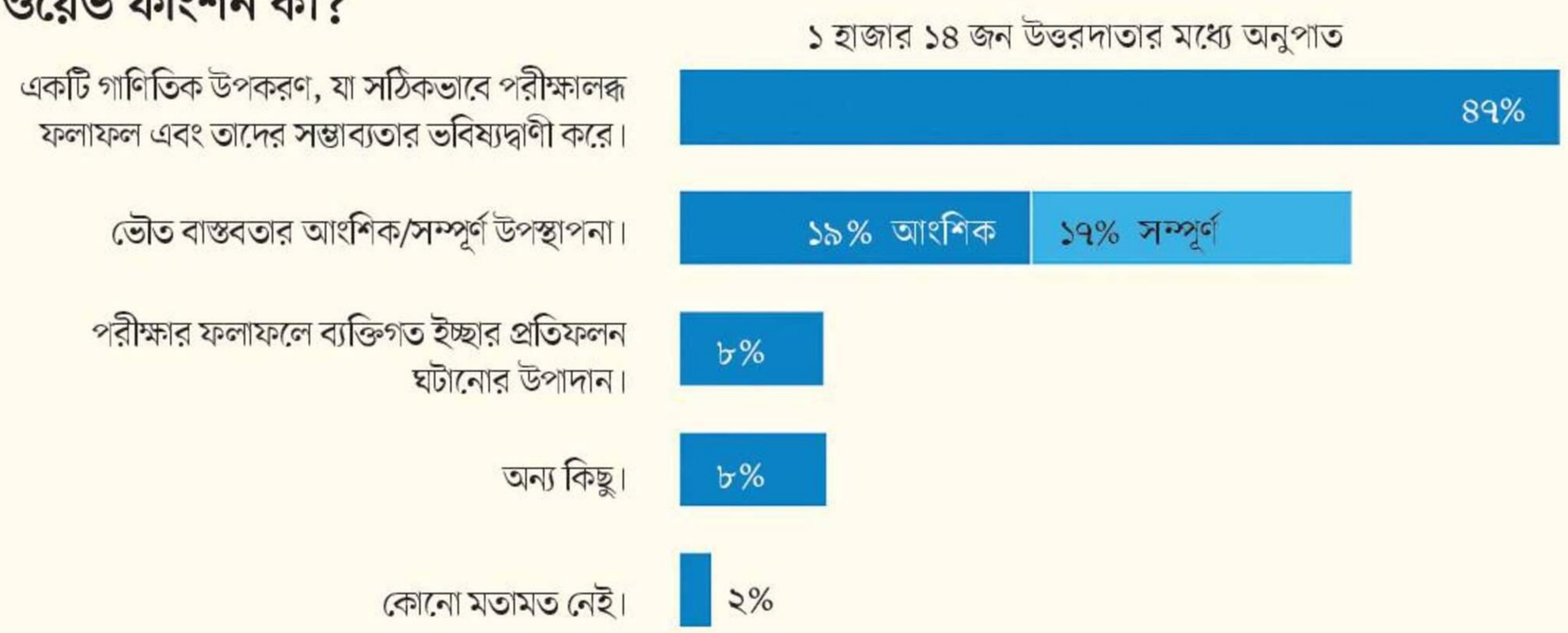
কোয়ান্টামতত্ত্বের দুর্বোধ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সাবধানবাণী দিয়েছেন আইনস্টাইন-ফাইনম্যানের মতো মহাবিজ্ঞানীরা। কিন্তু তাতে কি কোয়ান্টামতত্ত্ব থেমে গেছে, কিংবা ভুল প্রমাণিত হয়েছে? উত্তর, না। গত ১০০ বছরে কোয়ান্টামতত্ত্ব বিজ্ঞানের জগতে দাপটের সঙ্গে উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়েছে। ২০২৫ সাল পদার্থবিজ্ঞানের ‘কোয়ান্টাম বর্ষ’ হিসেবে পালিত হচ্ছে। আর এ কারণেই বিজ্ঞানীরা নতুন করে ভাবতে বসেছেন, কোয়ান্টামতত্ত্ব আসলে কী! বাস্তব জগতের সঙ্গে এর সম্পর্ক কেন এত গোলমেলে!

সাইলিঙ্গারের মতো সব বিজ্ঞানীই যে কোয়ান্টাম জগৎকে অস্বীকার করছেন, তা নয়। প্যারিসের পদার্থবিজ্ঞানী আলেন আসপেক্ট, যিনি একই ধরনের কোয়ান্টাম গবেষণার জন্য সাইলিঙ্গারের সঙ্গেই নোবেল পেয়েছেন, তিনি এ ব্যাপারে একমত হননি। অধ্যাপক আসপেক্ট মনে করেন, কোয়ান্টাম জগৎ পুরোপুরি বাস্তব, তবে প্রকৃতির মতোই রহস্যময় এর আচরণ।

কোয়ান্টামতত্ত্ব ও বাস্তব জগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আবার আলোচনায় সরব হয়েছেন সম্প্রতি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান জার্নাল *নেচার*-এর একটি সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে। কোয়ান্টাম জগৎ সম্পর্কে খোদ কোয়ান্টামতত্ত্বের গবেষকেরাই কী ভাবেন, কীভাবে ব্যাখ্যা করেন এই জগতের নিয়মকানুন—সেটা খুঁজে বের করার জন্য একটি ব্যাপক সমীক্ষা চালায় *নেচার*। ১৫ হাজার কোয়ান্টাম গবেষকের কাছে সমীক্ষার প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়। এসব গবেষকের প্রত্যেকেই কোয়ান্টামতত্ত্বের সক্রিয় গবেষক এবং সাম্প্রতিক সময়ে তাঁদের একাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, কোয়ান্টাম মেকানিকসের মূল চাবিকাঠি শ্রোডিঙ্গার সমীকরণের শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জার্মানির হেলিগোল্যান্ড দ্বীপের অনুষ্ঠানে যেসব কোয়ান্টাম মহারথী উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাছেও রাখা হয়েছিল প্রশ্নগুলো।

১৫ হাজার বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন পাঠানো হলেও মাত্র ১ হাজার ১০০ কোয়ান্টাম বিজ্ঞানী তাঁদের মতামত জানিয়েছেন এ তত্ত্ব সম্পর্কে। প্রায় ১৪ হাজার বিজ্ঞানী এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার তাগিদও অনুভব করেননি। তবু এ ধরনের সমীক্ষার মধ্যে নেচার-এর এই সমীক্ষাই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড়। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে, গবেষকেরা এখনো ব্যাপকভাবে

ওয়েভ ফাংশন কী?



একমত হতে পারেননি কীভাবে কোয়ান্টাম মেকানিকসের আড়ালে থাকা বাস্তবতা ব্যাখ্যা করা যায়। তাতে এটাই আবারও প্রমাণিত হয়, কোয়ান্টামতত্ত্ব এখনো প্রহেলিকাময়।

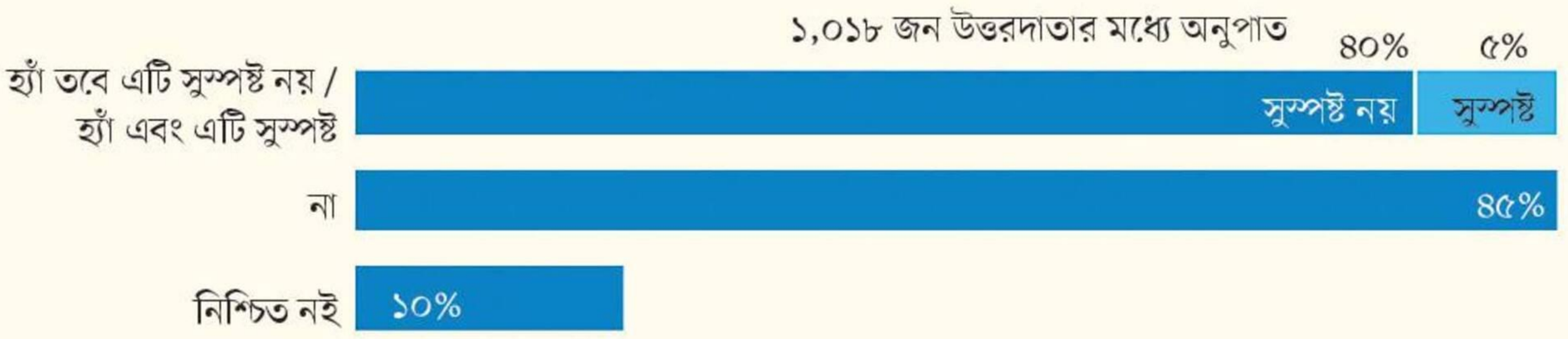
বিজ্ঞানে এশিয়া মহাদেশের প্রথম নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী সি ভি রমণ বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, বিজ্ঞানে একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের একটিই সঠিক উত্তর থাকে। কিন্তু যা কিছু বিজ্ঞান নয়, সেখানে একটি প্রশ্নের অনেকগুলো সঠিক উত্তর থাকতে পারে। কোয়ান্টামতত্ত্বে আমরা একই প্রশ্নের অনেকগুলো সঠিক সমাধানের সম্ভাবনা দেখতে পাই। সি ভি রমণের হিসাব কট্টরভাবে মানতে গেলে বলতে হয়, বিজ্ঞান হিসেবে কোয়ান্টামতত্ত্ব মোটেও কট্টরপন্থী নয়। এতে বহুত্ববাদের স্থান আছে।

কোয়ান্টাম মেকানিকসের সঠিক ব্যাখ্যা কীভাবে করা হবে, সেটা নিয়ে বিজ্ঞানীরা দ্বিধাবিভক্ত হলেও কোয়ান্টাম মেকানিকস প্রয়োগের নিয়মগুলো সুনির্দিষ্ট। যেমন কোনো ঘটনার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে অনুমান করতে গেলে কোয়ান্টাম মেকানিকস একসঙ্গে একাধিক সম্ভাব্য অবস্থার সুপারপজিশন বর্ণনা করে। এদের কোয়ান্টাম অবস্থা বর্ণনার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো ওয়েভ ফাংশন। শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণের সাহায্যে সমাধানযোগ্য ওয়েভ ফাংশন গঠন করে সমীকরণ সমাধান করতে পারলে ঘটনার সম্ভাব্য পরিণতি জানা যায়। কিন্তু ঘটনার ফলাফল কী হলো, তা যখন পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন কোয়ান্টাম জগতের সম্ভাবনার ওয়েভ ফাংশন ভেঙে গিয়ে বাস্তব অবস্থা তৈরি করে, যাতে একাধিক ঘটনার সুপারপজিশনের বদলে একটিমাত্র বাস্তব অবস্থা দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে শ্রোডিঙ্গারের বিখ্যাত বিড়ালের কথা ধরা যাক। বিড়ালটি যখন বাক্সের ভেতর থাকে এবং আমরা বিড়ালের প্রকৃত অবস্থা দেখতে পাই না, তখন বিভিন্ন অবস্থা বিবেচনায় বিড়ালটির প্রাণের ওয়েভ ফাংশন হতে পারে একই সঙ্গে 'বেঁচে আছে' এবং 'মরে গেছে'র সুপারপজিশন। কিন্তু যখন বাক্স খুলব, তখন দেখতে পাব একটি মাত্র অবস্থা—বিড়ালটি হয় বেঁচে আছে, না হয় মরে গেছে। এতে বোঝা যাচ্ছে, পর্যবেক্ষণ করলে কোয়ান্টাম ওয়েভ ফাংশন ধসে পড়ে। এখানেই প্রশ্ন জাগে, কোয়ান্টাম জগৎ বলতে আমরা কি ধরে নেব যে ওটা অদৃশ্য জগৎ?

নেচার-এর সমীক্ষায় ওয়েভ ফাংশন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যে ওয়েভ ফাংশন কোনো বস্তুর কোয়ান্টাম অবস্থার গাণিতিক বর্ণনা দেয়, তার কি বাস্তব কোনো ভিত্তি আছে? শতকরা মাত্র ৩৬ শতাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন, ওয়েভ ফাংশন বাস্তব জগতের প্রতিনিধি। তা-ও মাত্র ১৭ শতাংশ মনে করেন, এটি পুরোপুরি বাস্তব। ১৯ শতাংশ মনে করেন, এটি আংশিক বাস্তব। কিন্তু ৪৭ শতাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন, ওয়েভ ফাংশন শুধু একটি গাণিতিক উপকরণ, যার সাহায্যে কোয়ান্টাম মেকানিকসের গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা যায়। বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। ৮ শতাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন, ওয়েভ ফাংশন আসলে পরীক্ষার ফলাফলে ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোর উপাদান; অর্থাৎ এর সাহায্যে কোয়ান্টাম পরীক্ষার ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করা যায়! আরও আশ্চর্যের বিষয়, বাকি শতকরা ১০ শতাংশ বিজ্ঞানীর মধ্যে ৮ শতাংশ মনে করেন, ওয়েভ ফাংশন অন্য কিছু এবং দুই ভাগের কোনো ধারণাই নেই এই ওয়েভ ফাংশন কী জিনিস।

বস্তুর যে চিরায়ত ধারণা, তার সঙ্গে কোয়ান্টাম বস্তুর ধারণার কি কোনো বিরোধ আছে? সোজাসুজি বলতে গেলে, কোয়ান্টাম বস্তু আর ক্ল্যাসিক্যাল বস্তুর মধ্যে কি কোনো নির্দিষ্ট সীমানা আছে, যেটা পার হলে কোয়ান্টাম বস্তু ক্ল্যাসিক্যাল বস্তু হয়ে যাবে, কিংবা ক্ল্যাসিক্যাল বস্তু কোয়ান্টাম হয়ে যাবে? এই প্রশ্নেও বিজ্ঞানীরা বিভক্ত হয়ে গেছেন। ৪৫ শতাংশ মনে করেন, সীমানা আছে (যার মধ্যে ৪০ শতাংশ মনে করেন, খুব সুনির্দিষ্ট সীমানা আছে; ৫ শতাংশ মনে করেন, সীমানা

ক্লাসিক্যাল এবং কোয়ান্টাম বস্তুর মধ্যে কি কোনো সীমানা আছে?



পরিমাপের জন্য পর্যবেক্ষকের উপস্থিতি আবশ্যক?



নিকটতম পূর্ণসংখ্যা বা আসন্ন মান ধরার ফলে শতাংশের যোগফল ১০০% নাও হতে পারে

আছে। তবে সুনির্দিষ্ট নয়)। ৪৫ শতাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন, ক্ল্যাসিক্যাল ও কোয়ান্টাম বস্তুর মাঝখানে কোনো সীমানা নেই। বাকি ১০ শতাংশ নিশ্চিত নন।

কোয়ান্টামতত্ত্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর পর্যবেক্ষকনির্ভরতা। কোয়ান্টাম মেকানিকস কণার আচরণের সম্ভাবনার কথা বলতে পারে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কী হবে, তা বলতে পারে না। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে কণাটিকে দেখতে হবে। এ নিয়ে ঘোরতর আপত্তি তুলেছিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন। কোয়ান্টাম-রহস্যে বিরক্ত হয়ে তিনি নিজের জীবনীকার আব্রাহাম পেইজকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা, তুমি কি বিশ্বাস করো, যখন তুমি চাঁদের দিকে তাকাও, তখনই শুধু চাঁদের অস্তিত্ব আছে আর অন্য সময়ে নেই?' আইনস্টাইন প্রশ্ন তুললেও কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন, চাঁদের মতো বড় আকারের বস্তুর প্রসঙ্গে এ রকম প্রশ্ন খাটে না। কিন্তু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার যে ধর্ম কোয়ান্টাম মেকানিকস দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হয়, সেখানে দেখা যায় কোনো একটি কণা কী রকম আচরণ করবে, তা নির্ভর করে তার দর্শকের ওপর।

এই পুরোনো প্রশ্ন আবার উত্থাপন করা হয়েছিল *নেচার*-এর সমীক্ষায়। বিজ্ঞানীরা সেখানেও একমত হতে পারেননি। শতকরা ৫৬ শতাংশ বিজ্ঞানী মনে করেন, কোয়ান্টাম ঘটনার পরিমাপ পর্যবেক্ষকনির্ভর। শতকরা ৯ শতাংশ মনে করেন, পর্যবেক্ষকদের শুধু তাকিয়ে দেখলেই চলবে না, কী ঘটছে, সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে; অর্থাৎ ঘটনার আদ্যোপান্ত বুঝতে হবে। কিন্তু ২৮ শতাংশ মনে করেন, কোয়ান্টাম ঘটনার পরিমাপেও কোনো পর্যবেক্ষকের দরকার নেই। ৮ শতাংশ নিশ্চিত নন পর্যবেক্ষণের দরকার আছে কী নেই।

কোয়ান্টামতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে যেসব পরীক্ষণের ভেতর দিয়ে, ডাবল স্লিট বা দ্বিচিড় পরীক্ষণ তাদের অন্যতম। ইলেকট্রন যে কণা এবং তরঙ্গ উভয় ধর্মই প্রদর্শন করে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই পরীক্ষণে। দুটি মাইক্রোস্কোপিক চিড়যুক্ত পর্দার দিকে যদি ইলেকট্রনের প্রবাহ পাঠানো হয় এবং পর্দার অন্য পাশে ডিটেক্টরের সাহায্যে পর্দার চিড়ের ভেতর দিয়ে আসা ইলেকট্রনগুলোর প্যাটার্ন রেকর্ড করলে দেখা যায়, একই ইলেকট্রন তরঙ্গ আকারে দুটি চিড়ের ভেতর দিয়ে গিয়ে নিজেই নিজের তরঙ্গের সঙ্গে ইন্টারফিয়ারেন্স তৈরি করেছে। কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে শুধু যেকোনো একটি চিড়ের পেছনে ডিটেক্টর বসিয়ে ইলেকট্রনের প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ইলেকট্রনগুলো কণার মতো চিড়ের ভেতর দিয়ে গিয়ে একই সরলরেখায় গিয়ে পড়েছে। এই পরীক্ষণের ফলাফলকে সত্য ধরে নিয়েই কোয়ান্টামতত্ত্ব এগিয়েছে, যার মাধ্যমে আমরা কণাতরঙ্গের দ্বৈতসত্তা মেনে নিই।

নেচার-এর সমীক্ষায় এই পরীক্ষণের ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যখন কেউ পর্যবেক্ষণ করছেন না, তখন কি ইলেকট্রনগুলো দুটি চিড়ের ভেতর দিয়েই যায়? ৪৮ শতাংশ বিজ্ঞানী এই প্রশ্নে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, কোয়ান্টাম বস্তুর ক্ষেত্রে এ রকম প্রশ্ন অবান্তর। অন্যদিকে ৩১ শতাংশ বিজ্ঞানী মনে করেছেন, হ্যাঁ; আর ১৪ শতাংশ বিজ্ঞানী মনে করেছেন, না। ৬ শতাংশ বিজ্ঞানী নিশ্চিত নন কীভাবে এই ইলেকট্রনগুলো উভয় চিড়ের ভেতর দিয়ে যায়, সেখানে পর্যবেক্ষণের ভূমিকা আছে কী নেই।

কোয়ান্টামতত্ত্বের প্রতিষ্ঠিত ঘটনাগুলো সম্পর্কেও কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা একমত হতে পারছেন না, এর চেয়ে আশ্চর্যের আর কী হতে পারে। এটি ইঙ্গিত করে, গবেষকদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাজন রয়েছে—একদিকে আছেন যাঁরা 'বাস্তববাদী' দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন; অর্থাৎ সমীকরণগুলোকে বাস্তব জগতে প্রতিফলিত মনে করেন তাঁরা; অন্যদিকে আছেন যাঁরা 'জ্ঞাতবাদী' (Epistemic) দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন, অর্থাৎ যাঁদের মতে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা কেবল তথ্য নিয়েই কাজ-কারবার করে, বাস্তবতার সঙ্গে মিল না থাকলেও।

কোয়ান্টামের জগৎকে কীভাবে বাস্তব জগতের পরিপ্রেক্ষিতে

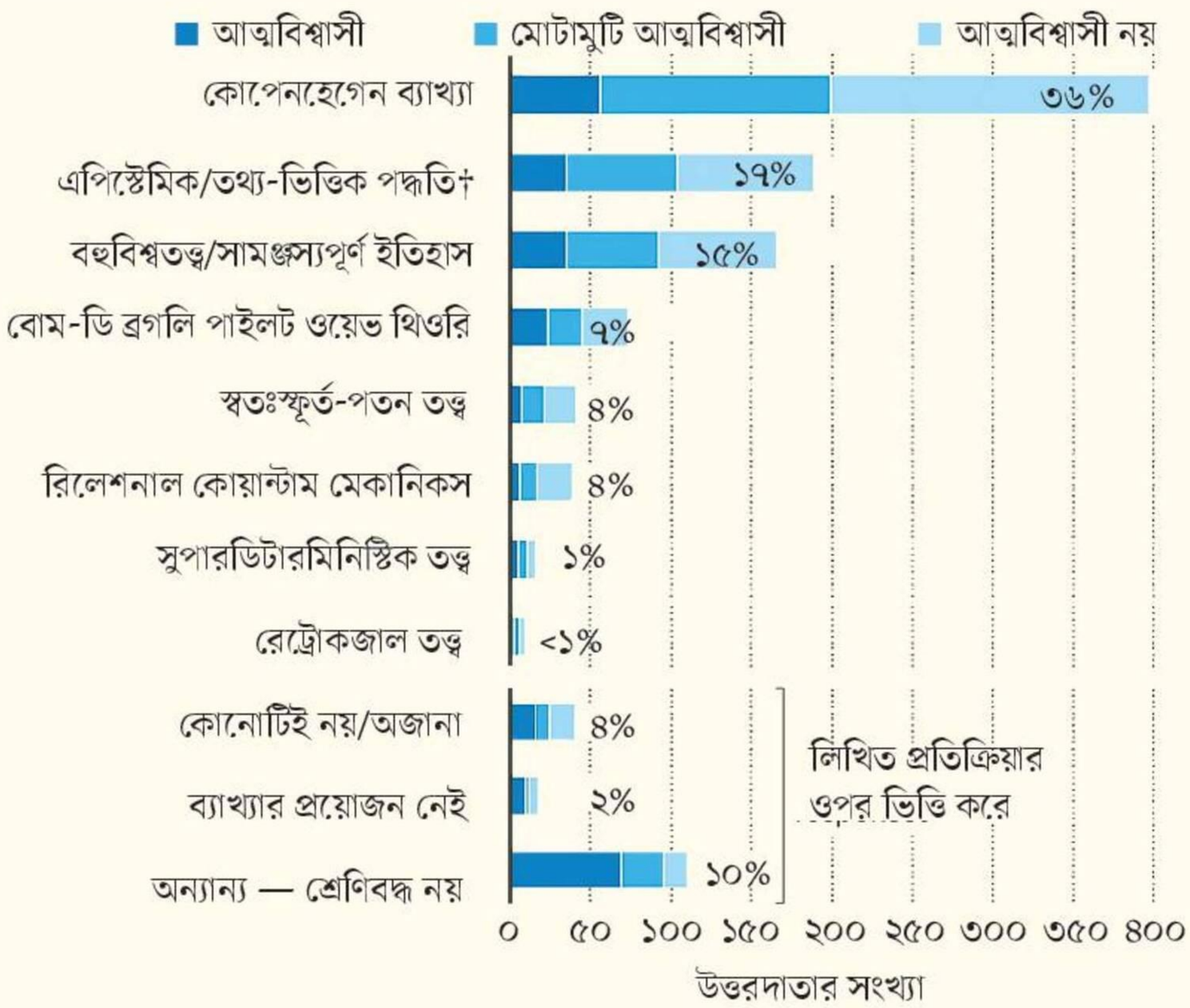
দ্বিচিড় পরীক্ষায় পর্যবেক্ষণ না করা অবস্থায় ইলেকট্রন কি দুটি ছিদ্রের মধ্যে দিয়েই যায়?



নিকটতম পূর্ণসংখ্যা বা আসন্ন মান ধরার ফলে শতাংশের যোগফল ১০০% নাও হতে পারে

কোয়ান্টাম তত্ত্বের পছন্দনীয় নানা ব্যাখ্যা

নেচার-এর জরিপে ১ হাজার ১০১ জন উত্তরদাতার এক-তৃতীয়াংশের বেশি কোয়ান্টাম মেকানিকসের কোপেনহেগেন ব্যাখ্যাটি বেছে নিয়েছেন। কিন্তু অনেক উত্তরদাতাই তাঁদের নির্বাচিত উত্তরের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না।



ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, সেই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেছেন। নেচার-এর এই সমীক্ষায় গবেষকদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, তাঁদের মতে কোয়ান্টাম ঘটনাবলি ও পারস্পরিক ক্রিয়ার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কোনটি; অর্থাৎ তত্ত্বের গণিতকে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত করার জন্য বিজ্ঞানীরা যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা করেছেন, তার মধ্যে তাঁদের পছন্দের কোনটি। সবচেয়ে বড় অংশের উত্তর (৩৬ শতাংশ) ছিল কোপেনহেগেন ব্যাখ্যার পক্ষে। তাঁদের উত্তরের বিষয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মাত্র ২৪ শতাংশ মনে করেন, তাঁদের পছন্দের ব্যাখ্যাটিই সঠিক; অন্যরা একে কেবল যথাযথ বা কিছু পরিস্থিতিতে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

অনেক গবেষকের এক প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরের অসংগতি লক্ষ করা গেছে। তার মানে কি এই যে অনেক কোয়ান্টাম গবেষক কেবল কোয়ান্টামতত্ত্ব ব্যবহার করেন, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ নিয়ে গভীরভাবে ভাবেন না! মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী এই পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন শাট আপ অ্যান্ড ক্যালকুলেট!

এই যে কোয়ান্টাম মেকানিকসের জনপ্রিয় ব্যাখ্যা, কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা, এটি আসলে কী? কোয়ান্টামতত্ত্বে কোনো বস্তুর আচরণকে চিহ্নিত করা হয় তার ওয়েভ ফাংশন দিয়ে। আরউইন শ্রোডিঙ্গার তাঁর বিখ্যাত সমীকরণের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম ওয়েভ ফাংশনের প্রচলন করেছেন ১০০ বছর আগে। ওয়েভ ফাংশন একটি কোয়ান্টাম অবস্থার যতগুলো সম্ভাবনা থাকতে পারে, তার সব কটির গাণিতিক সুপারপজিশনের ধারণা দেয়। কোয়ান্টাম মেকানিকসের এসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন কোয়ান্টাম মেকানিকসের আবিষ্কারকর্তা বা মহারথীরা—শ্রোডিঙ্গার, হাইজেনবার্গ, নীলস বোর। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ান্টাম মেকানিকসের মৌলিক গবেষণা হয়েছিল বলেই কোয়ান্টাম মেকানিকসের এই মূল ব্যাখ্যার নাম দেওয়া হয়েছে 'কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা'। এই ব্যাখ্যায় কোয়ান্টাম মেকানিকসে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা প্রধান। মৌলিক কণাগুলো এখানে কণা ও তরঙ্গ উভয় ধর্ম প্রদর্শন করে। কোয়ান্টাম টানেলিং ও কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গেলমেন্ট এই ব্যাখ্যায় স্বীকৃত। তাই এটি বহুল জনপ্রিয়ও বটে।

কিন্তু এর প্রধান দুর্বলতা হলো, বাস্তব জগতের সঙ্গে মেলাতে গেলে এ ব্যাখ্যাকে পুরোপুরি বিজ্ঞান বলে মনে হয় না। কারণ, এই ব্যাখ্যা বাস্তব ঘটনার সম্ভাবনার কথা বলে, সুনির্দিষ্টভাবে আগে থেকে বলে দিতে পারে না আসলে কী ঘটবে। কিন্তু কোপেনহেগেনপ্রিয় বিজ্ঞানীদের কাছে এটিই বাস্তব। ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরেকটু বেশি বাস্তববাদী দলের উদ্ভব ঘটেছে, যাঁরা মনে করেন ওয়েভ ফাংশন কেবলই একটি গাণিতিক উপকরণ, যা গাণিতিক সমস্যার সমাধান করার জন্য ব্যবহৃত। বাস্তবে ওয়েভ ফাংশন দেখা সম্ভব নয়। কারণ, দেখতে গেলেই এটি ধসে পড়ে। তারই প্রতিফলন দেখা গেছে নেচার-এর সমীক্ষায়, যেখানে ১৭ শতাংশ বিজ্ঞানী একটি জ্ঞাতবাদী ব্যাখ্যায় সমর্থন দিয়েছেন। জ্ঞাতবাদী এই অর্থে যে ওয়েভ ফাংশনগুলো তৈরি করা হয় একজন পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে। মানে, আগে থেকেই ধারণা করে নেওয়া হচ্ছে ফলাফল কী হতে পারে।

কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে অস্বস্তির কারণ ঘটে যখন বলা হয় ওয়েভ ফাংশনগুলো ধসে পড়ে, যখন সেদিকে তাকানো হয়। ১৯৫৭ সালে মার্কিন পদার্থবিদ হিউ এভারেট এই সমস্যা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে প্রস্তাব করেন মেনি ওয়ার্ল্ড বা বহুবিশ্বতত্ত্বের। তাঁর মতে, কণা প্রকৃতপক্ষে একধরনের অর্থে একাধিক স্থানে একই সময়ে উপস্থিত থাকে। একটি বিশ্বে পর্যবেক্ষক যখন কণার পরিমাপ করবেন, তিনি কেবল একটি ফলাফল দেখবেন। কিন্তু তাতে ওয়েভ ফাংশন কখনো প্রকৃতপক্ষে ধসে যায় না; বরং এটি অনেক বিশ্বে বিভক্ত হয়ে যায়, প্রতিটি ভিন্ন ফলাফলের জন্য একটি নতুন বিশ্ব তৈরি হয়। এই বিশ্বও যে কাল্পনিক বিশ্ব, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৫ শতাংশ বিজ্ঞানী কোয়ান্টাম বহুবিশ্বতত্ত্বের ধারণা পছন্দ করেন।

যত দিন যাচ্ছে, বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন ধারণা নিয়ে হাজির হচ্ছেন। তবে কোয়ান্টামতত্ত্ব যে এখনো অসম্পূর্ণ, তা অনেকটা প্রমাণিত। কারণ, কোয়ান্টাম মেকানিকস ইতিহাসের সবচেয়ে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা তত্ত্বগুলোর মধ্যে একটি হলেও এর গণিত মহাকর্ষ বা গ্র্যাভিটি বর্ণনা করতে পারে না। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, কোনো একদিন আরও উন্নততর কোয়ান্টাম মেকানিকস উদ্ভূত হয়ে তার বর্তমানের খামতি পূরণ করবে।

লেখক : শিক্ষক ও গবেষক, আরএমআইটি, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া

সূত্র : ১. বিজ্ঞানচিন্তা, অক্টোবর ২০২২; ২. *নেচার*, ১২ আগস্ট ২০২৫
৩. *সায়েন্টিফিক আমেরিকান*, ৮ আগস্ট ২০২৫



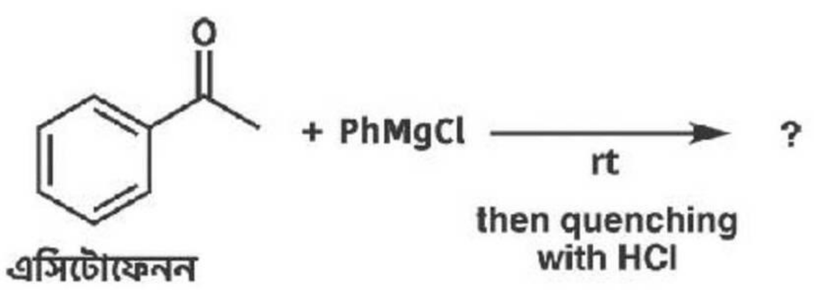
রাসায়নিক বিক্রিয়া

সহজ পাঠ

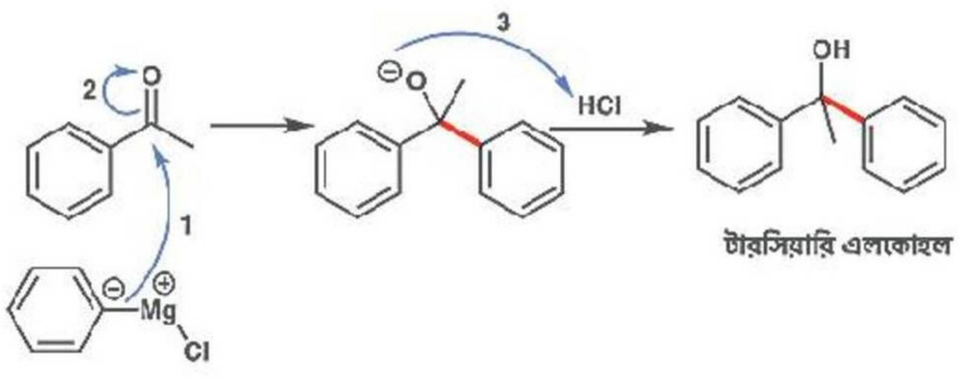
রউফুল আলম

পর্ব ৫

আগের পর্বে আমরা কার্বনিল গ্রুপে নিউক্লিওফিলিক সংযুক্তকরণ বিক্রিয়া (Nucleophilic addition to the carbonyl group, NAC) নিয়ে আলোচনা করেছি। অ্যালডিহাইড যৌগ নিয়েই আগের আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল। এ পর্বে অন্যান্য কার্বনিল যৌগ, যেমন কিটোন নিয়েও আলোচনা করা হবে। কার্বন-কার্বন ও কার্বন-হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরিতে এ ধরনের বিক্রিয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ।

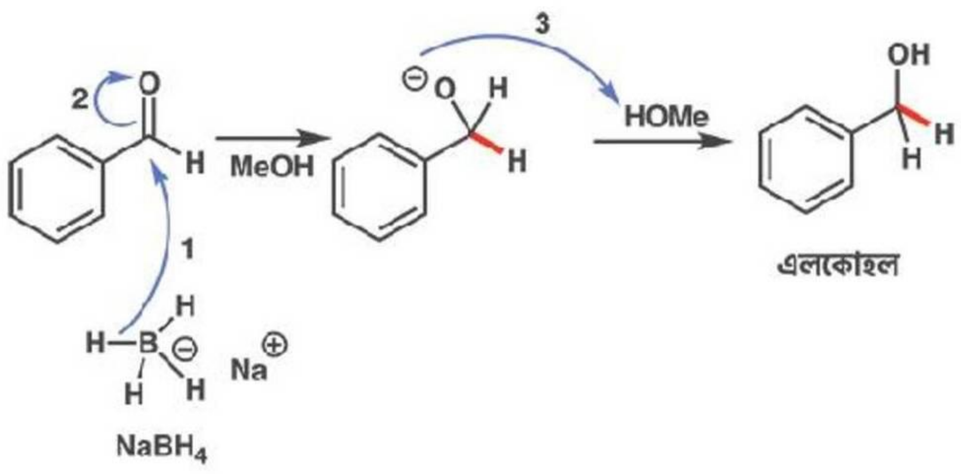


অ্যাসিটোফেনন যৌগকে যদি গ্রিগনার্ড বিকারক, যথা ফিনাইল ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করানো হয়, তাহলে কী হবে (চিত্র-১)? এখানে অ্যাসিটোফেনন একটি কিটোন বা কার্বনিল যৌগ, যেটি একটা ইলেকট্রোফাইল। অন্যদিকে গ্রিগনার্ড বিকারক একটা নিউক্লিওফাইল। সুতরাং গ্রিগনার্ড বিকারক অ্যাসিটোফেনেনের কার্বনিল মূলকের কার্বন পরমাণুকে অ্যাটাক বা আক্রমণ করবে, কিংবা ইলেকট্রন জোড়া প্রদান করবে। আর বিক্রিয়া শেষে একটা টারশিয়ারি অ্যালকোহল যৌগ তৈরি হবে (চিত্র-২)। একই বিক্রিয়া যখন কিটোনের পরিবর্তে অ্যালডিহাইডের সঙ্গে হয়, তখন আমরা সেকেন্ডারি অ্যালকোহল যৌগ পাই। যেটা আগের পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

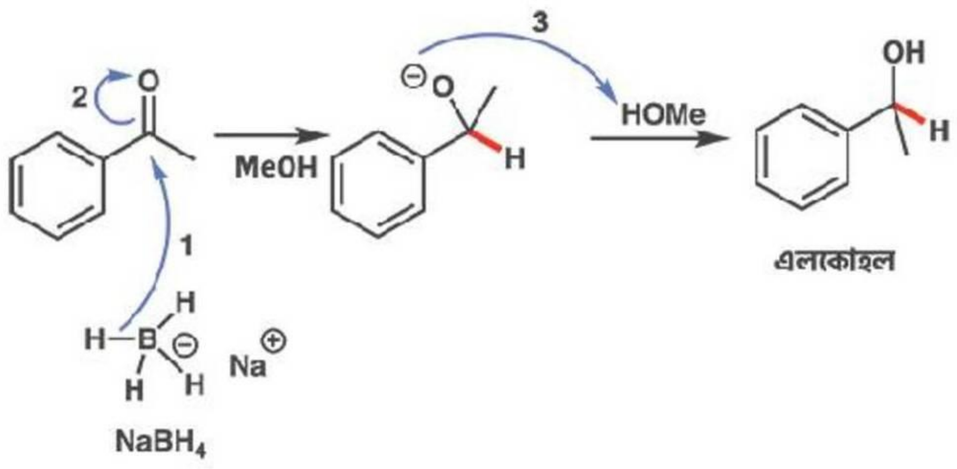


এখন তোমাদের জন্য একটা প্রশ্ন। অ্যালডিহাইড ও কিটোনের মধ্যে কোনটি তুলনামূলক শক্তিশালী ইলেকট্রোফাইল? যেমন একই নিউক্লিওফাইল ব্যবহার করলে বেনজালডিহাইড (অ্যালডিহাইড) ও অ্যাসিটোফেননের (কিটোন) মধ্যে কোনটা দ্রুত বিক্রিয়া করবে? রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপাদ বা প্রোডাক্ট কী হবে এবং বিক্রিয়ার ক্রিয়াকৌশল বা মেকানিজম ব্যাখ্যার আগে সব সময় নিউক্লিওফাইল, ইলেকট্রোফাইল ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর ধারণা ও তুলনামূলক প্রশ্ন করতে হবে।

নিউক্লিওফিলিক সংযুক্তকরণ বিক্রিয়ার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া হলো রিডাকশন বা বিজারণ বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বনিল যৌগকে বিজারিত করে অ্যালকোহলে পরিণত করা হয়। যেমন অ্যাসিটোফেননকে যদি আমরা বিজারিত করতে চাই, তাহলে সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইড ($NaBH_4$) ব্যবহার করতে পারি।

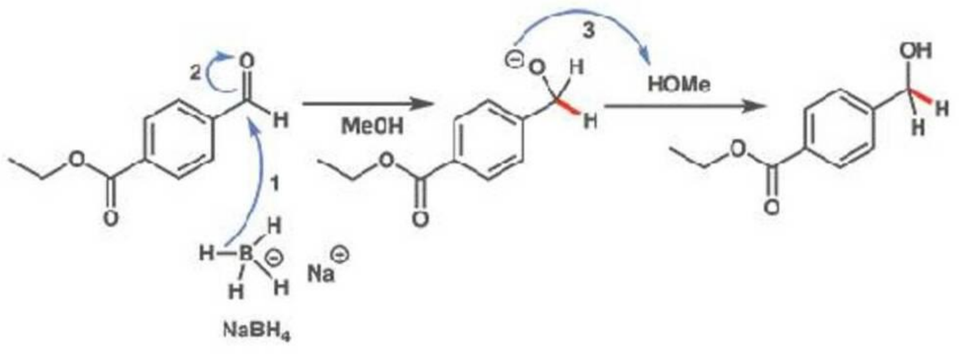


সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইড, লিথিয়াম বোরোহাইড্রাইড ($LiBH_4$) ইত্যাদি বিকারক হলো হাইড্রাইডের উৎস। বিজারক বা বিজারিত বিকারক। রাসায়নিক বিক্রিয়ার চর্চা করতে গেলে অনেক বিকারক বা রিএজেন্ট সম্পর্কেও ধারণা থাকতে হয়। চর্চার মাধ্যমেই ভালো ধারণা তৈরি হয়। বিশেষ করে খুব প্রচলিত অনেক বিকারক বা রিএজেন্ট আছে, যেগুলো অনুশীলনের মাধ্যমেই মনে রাখা হয়। সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইড তেমনই একটা বিকারক। যেটা বিজারক হিসেবে বহুল ব্যবহৃত। কার্বনিল যৌগের সঙ্গে সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইডের বিক্রিয়ায় একটা নতুন কার্বন-কার্বন বন্ধন তৈরি না হয়ে একটা কার্বন-হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হয়। লাল রং ব্যবহার করে নতুন বন্ধনকে হাইলাইট করা হয়েছে।



একই বিক্রিয়া অ্যালডিহাইডের জন্যও করা যায় (চিত্র-৪)। কিটোন বিজারিত হয়ে সেকেন্ডারি অ্যালকোহল তৈরি হয় এবং অ্যালডিহাইড বিজারিত হয়ে প্রাইমারি অ্যালকোহল তৈরি হবে। দুটি বিক্রিয়াতেই মিথানলকে (কিংবা ইথানলকে) দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মিথানল (অ্যালকোহল) ব্যবহারের কারণে বিক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপে আলাদা করে আমাদের প্রোটন বা হাইড্রোজেনের উৎস ব্যবহার করতে হচ্ছে না।

কোনো কোনো রাসায়নিক যৌগে একাধিক কার্যকর মূলক থাকে। যেমন কোনো যৌগে অ্যালডিহাইড ও এস্টার গ্রুপ থাকতে পারে। দুটি গ্রুপেই কিন্তু কার্বনিল মূলক আছে। এমন একটা যৌগকে যদি সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করানো হয়, তাহলে কী হবে?



অ্যালডিহাইড ও এস্টার, এই দুটি গ্রুপের মধ্যে অ্যালডিহাইড হলো শক্তিশালী ইলেকট্রোফাইল (চিত্র-৫)। অর্থাৎ এস্টার গ্রুপের উপস্থিতিতে অ্যালডিহাইড আগে বিক্রিয়া করবে। এই যে এস্টার গ্রুপের উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট করে (সিলেক্টিভলি) অ্যালডিহাইড গ্রুপের সঙ্গে সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইড বিক্রিয়া করছে, বিষয়টাকে আমরা বলি কেমোসিলেক্টিভিটি। অর্থাৎ একাধিক কার্যকর মূলকের উপস্থিতিতে, নির্দিষ্ট করে একটা কার্যকর মূলকের সঙ্গে আগে বিক্রিয়া করাই হলো কেমোসিলেক্টিভিটি। এস্টার গ্রুপকেও বিজারিত করা সম্ভব, তবে সে ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী বিজারক প্রয়োজন। কিংবা সোডিয়াম বোরোহাইড্রাইড ব্যবহার করলেও বিক্রিয়ার তাপমাত্রা ও ঘনত্ব পরিবর্তন করা প্রয়োজন হবে। পরবর্তী পর্বে আমরা আলোচনা করব, কার্বনিল গ্রুপে নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া।

(চলবে)

লেখক : গবেষক ও লেখক

* আগের পর্ব পড়তে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।



পর্দা নামল ১১তম বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের

শেষ হলো বাংলাদেশ জুনিয়র সায়েন্স অলিম্পিয়াডের জাতীয় পর্ব। গত ৫ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির মাঠে এ উৎসব আয়োজিত হয়। এতে প্রায় ছয় শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

অংশগ্রহণকারীদের জন্য ছিল দিনব্যাপী নানা আয়োজন। জাতীয় পর্বে ৬০ জন শিক্ষার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এবারই প্রথমবারের মতো প্রতি ক্যাটাগরিতে একজন করে চ্যাম্পিয়ন নির্বাচন করা হয়েছে। সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণির ছাত্র বিহান পল। জুনিয়র ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহীর ভোলানাথ বিশ্বেশ্বর হিন্দু একাডেমীর অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী জ্যোতির্ময় বিশ্বাস এবং প্রাইমারি ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন সেন্ট জোসেফ ইন্টারন্যাশনার স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী আহানাফ আদিব।

বেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। অলিম্পিয়াড শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজিত হয় রোবটিক্স ও ড্রোন শো। কৌতূহলী শিক্ষার্থীদের দেখানো হয় কীভাবে একটি রোবট ও ড্রোন পরিচালনা করা হয়। এরপর দুপুরে খাবার বিরতির পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে ম্যাজিশিয়ান স্বপন দিনার ম্যাজিক শো পরিবেশন করেন। এরপর শুরু হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকেরা শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

বিকেল ৩টায় শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান।

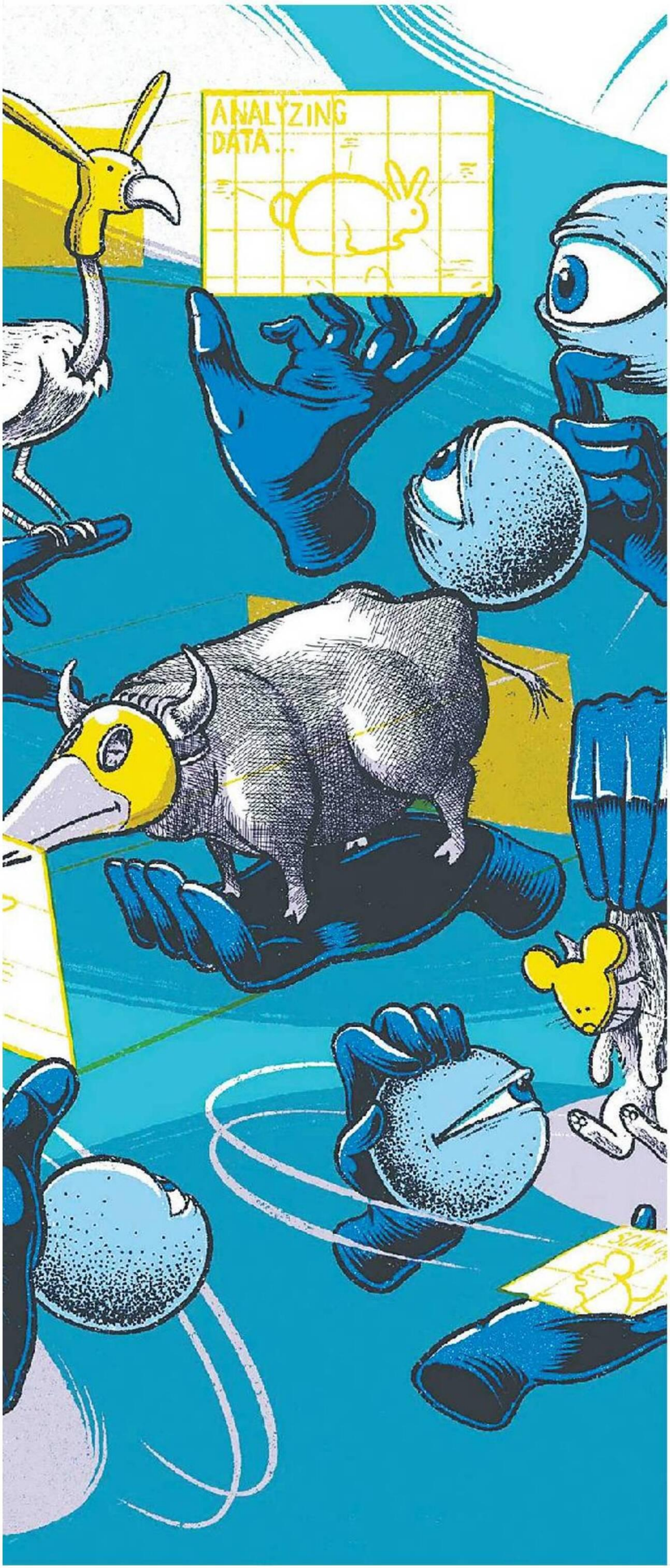
অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে মোট ৬০ জন বিজয়ী নির্বাচিত হয়। এরমধ্যে প্রাইমারি ক্যাটাগরিতে ১০ জন, জুনিয়র ক্যাটাগরিতে ২৮ জন এবং সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে ২২জন। তিন ক্যাটাগরির চ্যাম্পিয়নকে দেওয়া হয় চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। আর অন্যান্য বিজয়ীদের জন্য ছিল মেডেল ও সার্টিফিকেটসহ আকর্ষণীয় পুরস্কার।

বিজ্ঞানচিন্তা প্রতিবেদক

এআইয়ের দখলে ইন্টারনেট

বাঁচার লড়াই

উচ্ছ্বাস তৌসিফ



তোমার নৌকোর মুখোমুখি
আমার সৈন্যদল;
বাঁচার লড়াই।
আমার মন্ত্রী খোয়া গেছে
একটা চালের ভুল;
কোথায় দাঁড়াই।

—লেখা : অনুপম রয়,
গায়ক : ইমন চক্রবর্তী

আমরা এখন দিনের বড় একটা সময় কাটাই ইন্টারনেটে। ফেসবুক বা টিকটকের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট পড়ি, পোস্ট করি, রিলস দেখি ইত্যাদি। এগুলোর ঘাড়ে চেপে আসে বিজ্ঞাপন। সেই বিজ্ঞাপন দেখে আমরা প্রায়ই আঁতকে উঠি। ভাবি, আরে, এই জিনিসই তো আমি মনে মনে খুঁজছিলাম। আপনি হয়তো ল্যাপটপ কিনতে চান কিংবা ওয়ালেট বা মানিব্যাগ—দেখবেন, ঠিক ঠিক চলে এসেছে সেই বিজ্ঞাপন। এ বিজ্ঞাপনগুলো আপনার-আমার মতো ব্যবহারকারীদের দেখানোর পেছনে কাজ করে ‘বট’ (আপাতত পড়ুন, রোবট)।

তাহলে বর্তমানে ইন্টারনেটের চিত্রটা এমন—বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন দেন, বট সেই বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণে ঠিক করে কোন ব্যবহারকারীদের দেখাতে হবে। এরপর আপনার-আমার মতো মানুষ সেই বিজ্ঞাপন দেখেন।

এবার আসুন, আজ থেকে ৩০ বা ৫০ বছর পরের সময়টার কথা ভাবার চেষ্টা করি। আমরা এখনই নিয়মিত বিভিন্ন কাজে চ্যাটজিপিটি, জেমিনি বা ক্লডের মতো এআই ব্যবহার করছি। তাহলে ৩০ থেকে ৫০ বছর পরের ভবিষ্যতে এটা ধরেই নেওয়া যায়, আপনি আর পণ্যের জন্য নিজে ইন্টারনেটে ঘুরে বেড়াবেন না। আপনারও থাকবে ‘সহকারী বট’। আসলে এখনই আছে, সিরি বা গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট। যাহোক, সেই সহকারী বটকে আপনি হয়তো বলবেন, আমি ল্যাপটপ কিনতে চাই। আর সেই ভবিষ্যতে বিজ্ঞাপনদাতা বা পণ্য বিক্রেতারাও নিঃসন্দেহে তাঁদের সহকারী বট দিয়েই বানাবেন বিজ্ঞাপন। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?

সেই ভবিষ্যতের ইন্টারনেট হবে এমন—একটা বট বিজ্ঞাপন বানাচ্ছে, একটা বট বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণ করছে, আরেকটা বট সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেই বিজ্ঞাপন দেখে, জিনিসটা কিনবে কি না।

এ দৃশ্য যদি আপনার কাছে অবিশ্বাস্য লাগে, তাহলে এই পর্যায়ে আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিয়েই লেখাটা শুরু করি। ইন্টারনেট এখন আর মানুষের দখলে নেই।

২.

একটা সময় ইন্টারনেট ছিল মূলত মানুষের দখলে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেদের জীবনের টুকিটাকি তুলে ধরা, মজার ঘটনা শেয়ার করা বা মিম চালাচালি—এসবই ছিল অন্তর্জালের দুনিয়ার মূল চালচিত্র। কিন্তু সেই দিন এখন অতীত। এ বছরের শুরুতে ওয়েব ট্রাফিকের হিসাব রাখা শুরু

হওয়ার পর বিষয়টা প্রথমবারের মতো টের পাওয়া গেল। দেখা গেল, ইন্টারনেটে মানুষের চেয়ে রোবট বা 'বট'-এর আনাগোনা বেড়ে গেছে।

এই বট ট্রাফিকের অর্ধেকের বেশি ক্ষতিকর। অনলাইনে আমাদের অরক্ষিত ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নেওয়া এগুলোর মূল লক্ষ্য। মাঝেমধ্যেই আমরা দেখি, গুগলের কয়েক লাখ ব্যবহারকারীর তথ্য ফাঁস হয়েছে। এর পেছনে দায়ী এসব ক্ষতিকর বট ও পেছনের কিছু নোংরা মানসিকতার মানুষ। এর পাশাপাশি এই ট্রাফিকের আরেকটি বড় অংশজুড়ে আছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই কোম্পানিগুলোর বট। এগুলো ইন্টারনেট থেকে যথেচ্ছভাবে তথ্য সংগ্রহ করে। পরোয়া করে না কোনো নিয়মকানুনের। দেখবেন, চ্যাটজিপিটি বা জেমিনিকে সরাসরি কোনো লিংক দিয়ে ব্রাউজ করতে বললে জবাব দেবে, আমি লিংকে ঢুকতে পারি না। অথচ ওকে এ মুহূর্তে চলমান কোনো ক্রিকেট ম্যাচের স্কোর কিংবা নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের নাম বলে সেখানকার কোনো তথ্য জানতে চান, উত্তর দিয়ে দেবে চট করে। আসলে এসব মডেলকে প্রশিক্ষণ দেওয়া বা ব্যবহারকারীদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য নিয়মিতই ইন্টারনেট ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে এসব বট। এ দৌড়ে বলাবাহুল্য, এগিয়ে আছে ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি, গুগলের জেমিনি ও অ্যানথ্রোপিকের ক্লড। চ্যাটজিপিটির পেছনের বটটির নাম 'চ্যাটজিপিটি-ইউজার'। এটি একাই বর্তমানে বিশ্বের মোট ওয়েব ট্রাফিকের ৬ শতাংশের জন্য দায়ী। আরেক কাঠি সরেস ক্লডের পেছনের বট 'ক্লডবট'। এটি দখল করে নিয়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ! এ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে *নিউ সায়েন্টিস্ট*-এর এক ফিচারে।

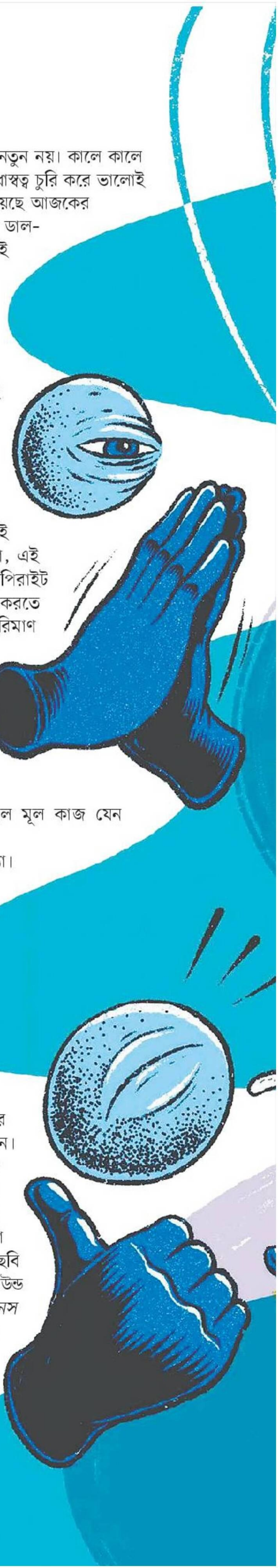
এই কোম্পানিগুলোর ভাষ্য, তাদের মডেলগুলোকে আপ টু ডেট বা হালনাগাদ রাখতে এই ডেটা স্ক্র্যাপিংয়ের প্রক্রিয়া জরুরি। কিন্তু কনটেন্ট নির্মাতা, অর্থাৎ শিল্পী, লেখক বা প্রোগ্রামারদের চিন্তা উল্টো। তাঁরা এই এআই বটগুলোকে কপিরাইট লঙ্ঘনের কারিগর হিসেবে দেখছেন। শুধু তা-ই নয়, এসব বট বা এআইয়ের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাও নিতে চেষ্টা করছে শিল্পীরা ও বড় প্রতিষ্ঠানগুলো। এ রকম একটা বড় ঘটনা ঘটেছে এ বছরের শুরুতে। বিখ্যাত কার্টুন, কমিকস ও অ্যানিমেশন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডিজনি ও ইউনিভার্সালের মতো বড় প্রতিষ্ঠান মিডজার্নির বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, এই ইমেজ জেনারেটর *স্টার ওয়ার্স* বা *ডেসপিকেবল মি*-এর মতো জনপ্রিয় সব ফ্র্যাঞ্চাইজির চরিত্রগুলো নকল করে ছবি তৈরি ও কনটেন্ট নির্মাণ করছে।

কিন্তু ডিজনি বা ইউনিভার্সালের মতো মামলা লড়ার আর্থিক ক্ষমতা তো আর সব কনটেন্ট নির্মাতার নেই। তাই অনেকেই বেছে নিচ্ছেন প্রতিরোধের ভিন্নধর্মী এক পথ। তাঁরা এমন সব অনলাইন টুল ব্যবহার করছেন, যেগুলো এআইকে ঘোল খাওয়াতে পারে। বুদ্ধিটা খুব কঠিন কিছু নয়। বট শনাক্ত করলেই কনটেন্টের পেছনের কোডকে খানিকটা বদলে দিতে হবে। এতে মানুষ ওয়েবসাইটে এলে হয়তো দেখবে, এখানে একটা গাড়ির ছবি আছে। কিন্তু এআই বট যখন ওয়েবসাইটে ঢুঁ দেবে, কোড দেখে তার মনে হবে, জিনিসটা আসলে গরুর ছবি। ফলে বট আর সত্যিকারের তথ্যটা পড়তে পারবে না। এভাবে ঠেকানো যাবে চুরি বা নকল। এই বিশেষ পদ্ধতিকে কম্পিউটারবিজ্ঞানীরা বলছেন 'এআই পয়জনিং'। কথাটা খাঁটি বাংলা করলে দাঁড়ায়, এআইকে বিষ প্রয়োগ। কিন্তু এই পদ্ধতির ভুল ব্যবহার ইন্টারনেটকে আরও বিপজ্জনক করে তুলতে পারে, এমন আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কপিরাইট নিয়ে এই দ্বন্দ্ব কিন্তু নতুন নয়। কালে কালে বারবার নকলবাজেরা শিল্পীদের মেধাস্বত্ব চুরি করে ভালোই আয় করেছে। এ কারণেই তৈরি হয়েছে আজকের কপিরাইট আইন। কিন্তু মিডজার্নি বা ডাল-ইর মতো ইমেজ জেনারেটর এআই আসার পর এ সমস্যা বেড়ে গেছে বহুগুণে। তার ওপর এআই নিয়ে পরিষ্কার আইন না থাকায় বাড়ছে সমস্যা।

যুক্তরাষ্ট্রে এ সমস্যা আরও মারাত্মক। এখনকার বড় এআই প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাষ্ট্রেরই। আর সেখানে 'ফেয়ার ইউজ' বা ন্যায্য ব্যবহারের জন্য রয়েছে বিশেষ আইন। এই আইনের কথা হলো, শর্ত সাপেক্ষে কপিরাইটধারীর অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করা যাবে তার কাজ। তো, এই শর্তগুলো কী? একটা শর্ত হলো, কপিরাইট করা মৌলিক কিছু আপনি ব্যবহার করতে পারবেন বটে, কিন্তু সেটা যথেষ্ট পরিমাণ বদলে নিতে হবে, অর্থাৎ হুবহু সেটা ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু সেই কপিরাইটেড জিনিস ব্যবহার করে আপনি নতুন কিছু তৈরি করলে কোনো সমস্যা নেই। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শর্ত হলো, আপনার এই কাজের ফলে মূল কাজ যেন বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

এই আইনকে ঘিরেই যত সমস্যা। যেমন ধরুন, কিছুদিন আগে ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে জাপানের অ্যানিমেশন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ঘিবলির ধাঁচে একটা ছবি এঁকে নিজের ফেসবুক প্রোফাইল পিকচার দেন। এটাকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলা হচ্ছে 'ঘিবলি স্টাইল আর্ট'। এই আর্ট আপনি মজা করার জন্য করলে কোনো সমস্যা নেই। কিংবা মিকি মাউসের স্টাইলে কোনো ছবি আঁকলেন, কিন্তু সেটার ব্যাকগ্রাউন্ড হয়তো নেওয়া হলো *দ্য সিম্পসনস* থেকে। এগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে করাটা ঠিক আছে। কিন্তু এই ডিজাইন ব্যবহার করে আপনি যদি টি-শার্ট বানান কিংবা



অন্য কোনো বাণিজ্যিক পণ্য, তখন সেটা স্পষ্টতই মেধাস্বত্ব বা কপিরাইটের লঙ্ঘন। ফেয়ার ইউজ আইন অনুযায়ী ব্যক্তিগতভাবে ওই ছবি মজা করার জন্য আপনি তৈরি করতেই পারেন। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যবহার করতে পারবেন না। সমস্যা হলো ফেয়ার ইউজ আইনের দোহাই দিয়ে কেউ যদি এ রকম আর্ট তৈরির পর বাণিজ্যিক ব্যবহার করে এবং দাবি করে, এটা আসলে মৌলিক সৃষ্টি, তখন বিষয়টা গোল পাকিয়ে যায়। এখানে দায়ী কে? যে ছবি বানানোর প্রম্পট লিখেছে, নাকি সেই এআই? ন্যায্য ব্যবহার ও কপিরাইট লঙ্ঘনের যে আইন, সেই সীমারেখা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে উঠছে দিনে দিনে।

৩.

নিজেদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার্থে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কনটেন্ট নির্মাতা আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছেন। মিডজার্নির বিরুদ্ধে ডিজনি ও ইউনিভার্সালের মামলাগুলো এর সর্বশেষ উদাহরণ। এ ছাড়া *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস* ও ওপেনএআইয়ের মধ্যে আরেকটা



এ বছরের জুনে মিডজার্নি এআইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করে ডিজনি, দাবি করে মিডজার্নি তাদের চরিত্রগুলো নকল করছে।

আইনি লড়াই চলছে। *টাইমস*-এর অভিযোগ, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন কাহিনি বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করছে এই এআই প্রতিষ্ঠান।

এআই প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্য এসব অভিযোগের দায় নিতে রাজি নয়। তাদের কথা, তারা কোনো অন্যায়ই করছে না; বরং তাদের দাবি, ডেটা স্ক্র্যাপিং করা ফেয়ার ইউজ আইনের আওতায় পড়ে। ওপেনএআই আরও এক ধাপ বেড়ে বলেছে, কপিরাইটযুক্ত কাজে ব্যবহার না করে মানুষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম, এমন এআই মডেল তৈরি করা সম্ভবই নয়। গুগলেরও একই কথা। তারা বলছে, কপিরাইট, প্রাইভেসি ও পেটেন্ট আইনে যুগোপযোগী প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও আনা উচিত। কারণ, এআই মডেলগুলোকে প্রশিক্ষণ দেওয়া এখন আর বাহুল্য কিছু নয়, বাস্তবতা ও প্রয়োজন।

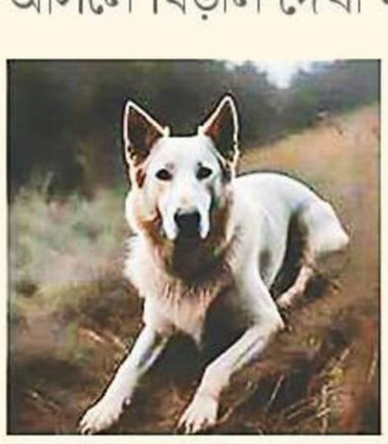
তবে জনমত এখনো মেধাস্বত্ব ও শিল্পী বা সৃজনশীলদের পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের কপিরাইট অফিস এআই ও কপিরাইট আইন নিয়ে সাধারণ মানুষের মতামত জানতে চেয়েছিল। দেখা গেছে, ৯১ শতাংশ মানুষই এআই সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। একে তো মেধাস্বত্ব চুরি, তার ওপর চাকরির বাজার বদলে দেওয়া, এ রকম আরও বহু কারণে মানুষ এআই সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করছেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয়টি হলো, এআই বটগুলো এখন ওয়েবসাইটে এত বেশি ট্রাফিক পাঠায় যে ওয়েবসাইটের সার্ভার এ চাপ সামলাতে পারে না। কিছু ওয়েবসাইট চাপ সামলাতে না পেরে অফলাইনেও চলে যেতে বাধ্য হয়। এটাকে বলা হয় ডিডস (DDoS) অ্যাটাক।

এ জন্য কনটেন্ট নির্মাতারা নিজের ওয়েবসাইটে বট প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য নানা কৌশল ব্যবহার করেন। এর একটি আমাদের সবার পরিচিত—ক্যাপচা। যেখানে একগাদা গাড়ি, ট্রাফিক লাইট বা বিভিন্ন জিনিস শনাক্তের মাধ্যমে আমাদের প্রমাণ করতে হয়, আমরা মানুষ! ভালো লাগে না আমাদের, কিন্তু এটা ওয়েবসাইটের সুরক্ষার জন্য জরুরি। আবার কিছু বিশেষ ফাইলে বটকে নিষিদ্ধ করা হয়। এরপরও কিছু বট এই কোডেড নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ডেটা সংগ্রহ চালিয়ে যায়।

এই সেই বাঁচার লড়াই। নিজের কনটেন্ট, ব্যবহারকারীদের তথ্য সুরক্ষিত রাখার লড়াই। এ যেন সেই দাবা খেলা, যেখানে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের নৌকার মুখোমুখি আমাদের সৈন্য। কী করা যায়?

এআই পয়জনিং

নাইটশেড টুল ধীরে ধীরে এআইকে বিষপ্রয়োগ করে, ফলে বট ভুলভাবে মনে করে কুকুরের এই ছবিতে আসলে বিড়াল দেখা যাচ্ছে



কুকুর
পরিষ্কার মডেল



৫০
বিষাক্ত নমুনা



১০০
বিষাক্ত নমুনা



বিড়াল
৩০০
বিষাক্ত নমুনা

৪.

ইন্টারনেটের জগৎটি যেন সবার জন্য নিরাপদ হয়, সে জন্য কিছু মানুষ ও প্রতিষ্ঠান বরাবরই কাজ করে যাচ্ছে। বাঁচার লড়াইয়ে এরাই কনটেন্ট নির্মাতা ও আমাদের মতো ব্যবহারকারীদের ভরসা।

যেমন ক্লাউডফ্লেয়ার। ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সার্ভিস থেকে সাইবার সিকিউরিটি, বিভিন্ন ধরনের সেবা দেয় এই প্রতিষ্ঠান। এখন তারা তৈরি করেছে এআই ল্যাবিরিন্থ। ক্লাউডফ্লেয়ার মূলত ওপরে আলোচিত ডিডস আক্রমণের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। এআই বট যেহেতু অনেক অনেক ট্রাফিক পাঠায়, তাই ক্লাউডফ্লেয়ার কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি বেছে নিয়েছে। তারা এআই বটগুলোর জন্য অর্থহীন ও ভুয়া কনটেন্টে ভরা হাজারো পৃষ্ঠার এক গোলকধাঁধা তৈরি করে। হয়তো জানেন, ইংরেজি ল্যাবিরিন্থ কথাটির অর্থ এই গোলকধাঁধা। এতে ঢুকে বটগুলো তাদের সময় ও শক্তি শেষ করে ফেলে এই অর্থহীন ডেটা ঘেঁটে, কিন্তু আসল তথ্যের নাগাল পায় না। ক্লাউডফ্লেয়ারের মতে, তাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকা ওয়েবসাইটগুলোয় এই ক্রলার বা বটগুলোর কাছ থেকে দিনে প্রায় ৫০ বিলিয়ন অনুরোধ আসে। এআই ল্যাবিরিন্থ এসব বটের ক্রলিং বা তথ্য ঘাঁটার গতি কমিয়ে দেয় এবং তাদের বিভ্রান্ত করে। এভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করে ওয়েবসাইটকে।

আরেকটি বিকল্প এবং আরও আগ্রাসী উপায় হলো যেটা আগে বলেছি, এআই পয়জনিং। এতে কনটেন্টের পাশাপাশি ব্যাকএন্ডের কোডের ভেতরে এমনভাবে কারিকুরি করে রাখা হয়, যেন এআই সত্যিকার তথ্য পড়তে না পারে। গাড়ির ছবিকে যেন গরু বলে শনাক্ত করে। এতে বটের উদ্দেশ্য আর পূর্ণ হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তৈরি এমন দুটি টুলের নাম 'গ্লেজ' (Glaze) ও 'নাইটশেড' (Nightshade)। বর্তমানে এআই পয়জনিংয়ে এই টুল দুটি বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে।

গ্লেজ টুলটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় ২০২২ সালে। আমরা জানি, যেকোনো ছবির সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একক পিক্সেল। এই গ্লেজ টুলটি যেকোনো শিল্পকর্মে পিক্সেল পর্যায়ে কিছু পরিবর্তন করে দেয়। এসব পরিবর্তন খোলা চোখে দেখা যায় না। কিন্তু এআই যখন এসব পিক্সেলকে ০ ও ১-এর কোডে পড়তে যায়, তখন ছোট ছোট ওসব পরিবর্তন এআই বটের কাছে ভিন্ন অর্থ নিয়ে ধরা দেয়। এআই তখন মূল তথ্য পড়তে পারে না, ভুল তথ্য পড়ে। শিল্পীর কাজের ধরনকে ভুল ভেবে নেয়, ছবির এক জিনিসকে ভাবে অন্য কিছু। যেমন জলরঙের ছবিকে হয়তো ভাবে তেলরঙে আঁকা ছবি, গাড়িকে ভাবে গরু ইত্যাদি।

নাইটশেড বাজারে আসে ২০২৩ সালে। এটি আরও এককাঠি সরেস। এটি ছবির ডেটাকে এমনভাবে বদলে দেয় যে এআই কোড পড়তে এসে মূল তথ্যই ধরতে পারে না। ফলে এআই ভুল শেখে। যেমন বিড়ালের ছবি দেখে সেটাকে হয়তো ভাবে কুকুর (কারণ, কোডের ভাষায় সে রকমই লেখা থাকে, যেটা শুধু বট দেখতে পায়)।

এ দুটি টুলই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে বিনা মূল্যে ডাউনলোড করে নিজের পিসিতেই রান করতে পারবেন যে কেউ। টুল দুটি এরই মধ্যে ডাউনলোড হয়েছে ১০ মিলিয়নের বেশি বার। এই দুটির পেছনের জ্যেষ্ঠ গবেষক শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বেন ঝাও। *নিউ সায়েন্টিস্ট*কে তিনি বলেন, এই টুলগুলো শিল্পীদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিচ্ছে। তাঁর ভাষায়, এই এআই প্রতিষ্ঠানগুলো বিলিয়ন থেকে ট্রিলিয়ন ডলারের কোম্পানি, বিশ্বের অন্যতম বড় কোম্পানি। তারা জোর করে যা খুশি, তা-ই দখল করে নিচ্ছে।

এ ধরনের আত্মনাশকতার ধারণা অবশ্য নতুন নয়। সুইডেনের স্টকহোম ইউনিভার্সিটির ইলিওনোরা রোসাতির কথায় উঠে এসেছে বিষয়টি। তাঁর ভাষ্যে, 'আগের দিনে নিজের সৃষ্টিতে ইচ্ছা করেই কিছু ভুল ঢুকিয়ে রাখার পরামর্শ দেওয়া হতো। যেমন একজন মানচিত্রকর হয়তো তাঁর মানচিত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু ভুয়া জায়গার নাম লিখে রাখতেন। পরে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির তৈরি মানচিত্রে যদি সেই একই ভুয়া নাম পাওয়া যায়, তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, সেটা নকল।

৫.

চিন্তার বিষয় হলো প্রযুক্তির এই কৌশল ভালো মানুষের হাতে যেমন ভালো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি খারাপ মানুষের হাতে ব্যবহৃত হতে পারে বাজে উদ্দেশ্যে। শুধু শিল্পীরাই নন, কিছু রাষ্ট্রও এআইয়ের বিরুদ্ধে 'বিষ প্রয়োগ'-এর এই নীতি ব্যবহার করে মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর চেষ্টা করছে।

যেমন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক দ্য আটলান্টিক কাউন্সিল এ বছরের শুরুতে দাবি করেছে, রুশ সংবাদমাধ্যম প্রাভদা (Pravda) এআই বটগুলোকে ভুয়া সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য এই পয়জনিং কৌশল ব্যবহার করেছে। আয়রনি বা পরিহাস যা-ই বলি, এই কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না—রুশ ভাষায় প্রাভদা শব্দের অর্থ 'সত্য'। যাহোক, দ্য আটলান্টিক কাউন্সিলের অভিযোগ অনুযায়ী, প্রাভদা লাখ লাখ ওয়েব পেজ তৈরি করে, যেগুলো দেখতে অবিকল আসল সংবাদের মতো। এই পেজগুলো ইউক্রেন যুদ্ধ সম্পর্কে ক্রেমলিনের ভাষ্য প্রচার করার জন্য ডিজাইন করা হয়। বিপুল পরিমাণ ভুয়া খবরের কারণে এআই ক্রলাররা ব্যবহারকারীর প্রশ্নের উত্তরে এই নির্দিষ্ট ভাষ্যকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে, যেহেতু বহু বহু খবরে এই একই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। নিউজগার্ড নামের এক মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থার বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ১০টি প্রধান এআই চ্যাটবট এক-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রে প্রাভদার মতামতের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ উত্তর দিয়েছে।

তাহলে এ সমস্যার সমাধান কী? বেন ঝাওয়ের মতে, সমাধানটা সহজ। এআই প্রতিষ্ঠানগুলো ইচ্ছেমতো যেকোনো ওয়েবসাইটে ঢুঁ না দিয়ে বৈধভাবে কনটেন্ট নির্মাতাদের সঙ্গে চুক্তি করতে পারে। এর মাধ্যমে তারা তথ্যের সত্যতা যেমন নিশ্চিত করতে পারবে, তেমনি ভুল তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট কনটেন্ট নির্মাতাকে জবাবদিহির আওতায়ও আনতে পারবে। এতে তাদের মডেলগুলো শুধু নির্ভরযোগ্য ডেটা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে এগোতে হলে এআই প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাইসেন্সিং ফি দিতে হবে। এই ফি এড়াতে এআই প্রতিষ্ঠানগুলো বিষয়টা মানতে চাইবে না, স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জিনিস তথ্য সব সময় বিনা মূল্যে চাইলে তো হবে না। এটুকু মূল্য দিতেই হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় আইনও করা প্রয়োজন।

সামনের দিনগুলো কেমন হবে, আমরা কেউ জানি না। কিন্তু সেই পৃথিবীতে এআইয়ের যে বড় ভূমিকা থাকবে, তা এরই মধ্যে স্পষ্ট। তাই এআইসহ সবকিছুকে একটা কাঠামোয় আনা আমাদের জন্য জরুরি। সব মানুষের তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও জরুরি। এ আমাদের বাঁচার লড়াই। এই লড়াইয়ে হারার কোনো উপায় নেই।

লেখক : সহসম্পাদক, বিজ্ঞানচিন্তা

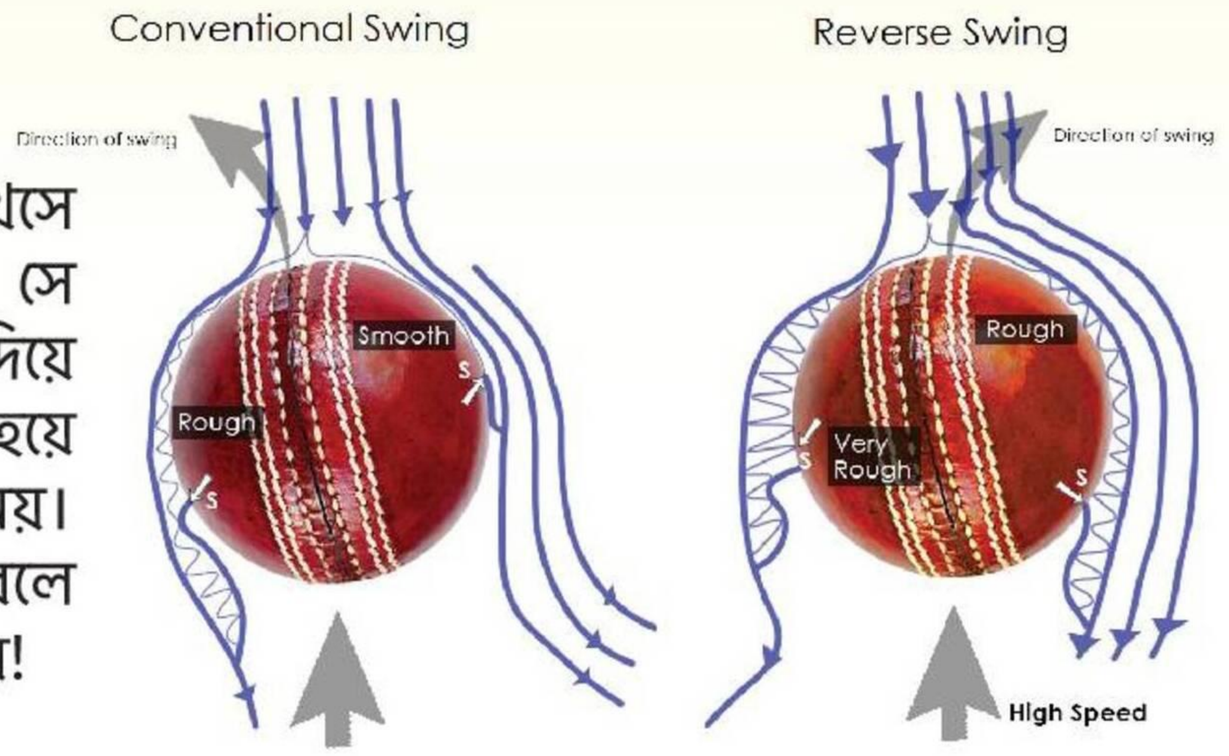
সূত্র : *নিউ সায়েন্টিস্ট*, *হাউ ইট ওয়ার্কস*, উইকিপিডিয়া

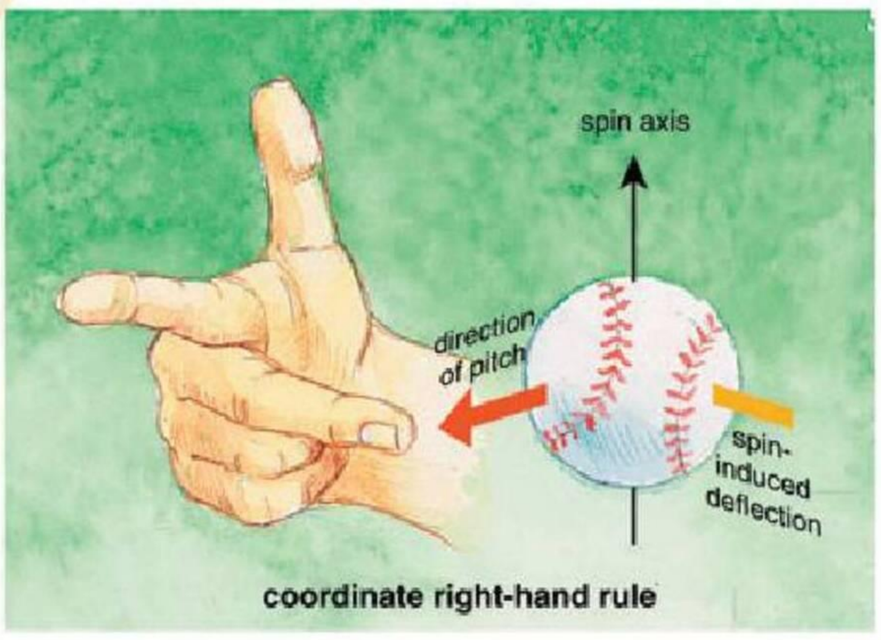
খেলার বিজ্ঞান বিজ্ঞানের খেলা!

বিজ্ঞান মোটেও খেলো বিষয় নয়, তবে খেলতে খেলতেও বিজ্ঞান শেখা যায়। আমাদের প্রতিদিনের জীবনেই এমন অনেক কিছু ঘটে যা অনুসন্ধান করলে বিজ্ঞানের চমৎকার সব সূত্র বের হয়ে আসবে। খেলাধূলাও এর ব্যতিক্রম নয়। এখন চলছে এশিয়া কাপ। চলো ক্রিকেটের কিছু বিষয়ের সাথে বিজ্ঞানের সংযোগ জেনে নেয়া যাক!

সুইং আর রিভার্স সুইং

একজন ফাস্ট বোলার যখন চকচকে আর খসখসে দু'পাশের বল নিয়ে দৌড়ায়, তখন আসলে সে খেলছে বাতাসের সাথে। বাতাস মসৃণ দিক দিয়ে সহজে চলে যায়, আর খসখসে দিক দিয়ে ধীর হয়ে পড়ে। এই অসম চাপের কারণে বল হঠাৎ বাঁক নেয়। ফাস্ট বোলাররা এই সুবিধাটাকে কাজে লাগিয়েই বলে রিভার্স সুইং করে ব্যাটসম্যানকে হতভম্ব করে দেয়!





আঙুলের ঘূর্ণি থেকে ম্যাগনাস এফেক্ট

একজন স্পিনার যখন আঙুলে সামান্য মোচড় দেয়, তখন বল বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে চাপের এক অসম খেলা তৈরি করে। ফলে বল ডান-বামে মোড় নেয়, ব্যাটসম্যানকে ফাঁকি দেয়। এই ঘটনাকে বিজ্ঞানীরা বলেন ম্যাগনাস এফেক্ট। ঠিক একই কারণে ফুটবলে বাঁকানো শট হয়, বা টেবিল টেনিসে স্পিন কাজ করে।

ব্যাটের সুইট স্পট

যখন ব্যাটের ঠিক "সুইট স্পট" এ বল লাগে, তখন বলের ভেতর সর্বোচ্চ শক্তি সঞ্চারিত হয়। তখনই বল উড়ে গিয়ে গ্যালারিতে ছক্কা হয়। কিন্তু যদি একটু এদিক-সেদিক লাগে? শক্তি হারিয়ে যায়, আর বল হয়তো মাটিতেই থেমে যায়। এটা শক্তির রূপান্তরের চমৎকার উদাহরণ।

হেলমেট কেন গোল?



ফাস্ট বোলারের বাউন্সার ব্যাটসম্যানের মাথায় লাগলে ভয়ঙ্কর বিপদ হতে পারত। কিন্তু হেলমেট গোলাকার হওয়ায় আঘাতের চাপ পুরো পৃষ্ঠে ছড়িয়ে যায়। এই নকশাটাই মূলত ফোর্স ডিস্ট্রিবিউশন-এর বিজ্ঞান।

দেখলে তো, ক্রিকেটের প্রতিটি মুহূর্তে কীভাবে নিউটনের সূত্র , বায়ুবিদ্যা, ঘর্ষণ আর শক্তির রহস্য কাজ করে? খেলা দেখতে দেখতে যদি এভাবে বিজ্ঞান শেখা যায়, তাহলে মন্দ কী!

তোমার মতো এরকম নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞানপ্রিয় বন্ধুদের পাবে অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্সের অন্যরকম প্রজন্ম গ্রুপে। এখানে আমরা বিজ্ঞানবাক্সের নানারকম এক্সপেরিমেন্টের পাশাপাশি নতুন কোনো আইডিয়া মাথায় এলেও সেটা নিয়ে গল্প করি। আর বছর জুড়ে নানারকম একটিভিটি আর ক্যাম্পেইন তো চলছেই! জয়েন করে দেখো, খুব ভালো লাগবে।

বিজ্ঞানবাক্স পাওয়া যাচ্ছে

meena bazar
bringing freshness to your life

রকমারি.com
www.rokomari.com

এছাড়াও নিকটস্থ লাইব্রেরিতে এবং

bigganbaksho.com

সব বিজ্ঞানবাক্স দেখতে স্ক্যান করো

অন্যরকম প্রজন্ম গ্রুপে জয়েন করতে স্ক্যান করো



অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স



ওরে পাখি...

কাজী আলিম-উজ-জামান

‘প্রায় এক বছর হয়ে গেল ওর দেখা নেই
ওহ, গত গ্রীষ্মে সবুজ, সবকিছু ছিল আরও সবুজ,
কাঁটাবন কম, আকাশটা ছিল আরও নীল।
নিশ্চয়ই এখন গ্রীষ্মই, কারণ এক পাখি এসেছে—
এসো এক পাখি, তার সঙ্গী আসবে পরে,
পাখি দৌড়ায়, ওড়ে ঘোরে, আরও ঘন হয়।
ওহ, সুখী সেই পাখি, যার সঙ্গী আসবে,
উচ্চতায়, খাঁড়ে—আমি যদি হতাম সেই পাখি,
একসঙ্গে এই আবহাওয়ায় বাসা বানাতাম।’

আ বার্ড সং, ক্রিস্টিনা রোসেত্তি (১৮৩০-১৮৯৪)

পাখির ডাক কিংবা গান শুনে আমাদের মন ভরে যায়। ভোরের আলো ফোটার আগে যেসব পাখি একটানা গেয়ে যায়, তাদের সুরে প্রকৃতি যেন জেগে ওঠে। কিন্তু পাখিরা কেন গান গায়? তারা কি কেবল সৌন্দর্য ছড়ায়, নাকি এই গানের পেছনে আছে জটিল জৈবিক বা স্নায়ুবৈজ্ঞানিক কোনো উদ্দেশ্য? এই গানের সঙ্গে কি তাদের টিকে থাকার সংগ্রামের কোনো সম্পর্ক আছে?

বিজ্ঞান বলছে, অধিকাংশ পুরুষ পাখির গান হলো একধরনের প্রেম নিবেদন। প্রজনন ঋতুতে পুরুষ পাখিরা গান গেয়ে মেয়ে পাখিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। শব্দের বৈচিত্র্য আর সুরের শক্তি দিয়ে তারা যেন নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চায়।

তবে গান শুধু প্রেমের বার্তা নয়, এটি একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা ‘টেরিটরি’ রক্ষা করার অস্ত্রও। অনেক পাখি সকালে গেয়ে জানিয়ে দেয়, ‘এই এলাকা আমার।’

গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক গায়ক পাখি ছোটবেলায় বড়দের কাছ থেকে গান শেখে, ঠিক যেমন মানুষ ভাষা শেখে। এই শেখার জন্য পাখিদের মস্তিষ্কে বিশেষ নিউরাল নেটওয়ার্ক গঠিত হয়। যেমন জেব্রা ফিঞ্চ বা সোনালিকা নামের পাখি একধরনের অডিটরি-মোটর লুপ ব্যবহার করে গান শেখে ও মনে রাখে।

মানুষ যেমন স্বরযন্ত্র (Larynx) ব্যবহার করে কথা বলে, পাখিরা ব্যবহার করে কণ্ঠ-অঙ্গ বা সিরিনক্স (Syrinx)। এটি পাখির শ্বাসনালির নিচের দিকে থাকে এবং এখানে বাতাস প্রবাহিত হলে তা শব্দে রূপ নেয়। সিরিনক্সের জটিল কাঠামোর জন্য পাখিরা একই সঙ্গে দুটি আলাদা সুর তুলতে পারে, যা মানুষ পারে না!

পাখির কোলাহল ও গান শুনলে মানুষের মন শান্ত হয়, চাপ কমে যায়। এটি এক প্রাকৃতিক মেডিটেশন, যা উদ্বেগ কমিয়ে মানসিক প্রশান্তি আনতে সাহায্য করে। পাখির কোলাহল শুনে মানুষের মধ্যে জীবনধারার গতিশীলতা অনুভূত হয়। এই গান আমাদের সক্রিয় ও প্রাণবন্ত থাকার উদ্দীপনা দেয়। সুতরাং পাখিদের গান মানুষের মনের জন্য একধরনের প্রাকৃতিক ওষুধ, যা মানসিক ও আত্মিক কল্যাণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিচিকিৎসা অনুষদের সাবেক ডিন ও গাইনোকোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. আ ন ম আমিনুর রহমান বলেন, পুরুষ পাখির যৌন হরমোন টেস্টোস্টেরন হলো গান নিয়ন্ত্রণের জন্য সাহায্যকারী প্রাথমিক হরমোন। গানের বিকাশ, গঠন ও গান গাওয়ার প্রেরণাকে প্রভাবিত করে এই হরমোন। পুরুষ গায়ক পাখিদের ক্ষেত্রে প্রজনন ঋতুতে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা সাধারণত বৃদ্ধি পায়, যা গান গাওয়ার কার্যকলাপ বৃদ্ধির সঙ্গে মিলে যায়। এটি গান তৈরির জন্য দায়ী মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলোকে প্রভাবিত করে, যার মধ্যে রয়েছে গান নিয়ন্ত্রণকারী নিউক্লিয়াস ও পাখির কণ্ঠ-অঙ্গ বা সিরিনক্স। টেস্টোস্টেরন ইস্ট্রোজেনে রূপান্তরিত হতে পারে, যা গান নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে গানের গঠনের বিকাশ ও সংগঠনে। তবে টেস্টোস্টেরন গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক হলেও



রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গানের পাখি শংখ শালিক।
ছবি : আ ন ম আমিনুর রহমান।







মান্দার গাছের ডালে মনের সুখে গান গাইছে কাঠ শালিক (বাঁয়ে ওপরে)। বরিশালের বাবুগঞ্জে গান গাইছে ছোট মুনিয়া (বাঁয়ে নিচে)। হবিগঞ্জের সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানে মন খুলে গান গাইছে সিঁদুরে লাল মৌটুসি (ডানে)। ছবি : আ ন ম আমিনুর রহমান।

সামাজিক পরিবেশ ও স্নায়ুতন্ত্রের মতো অন্য উৎপাদকগুলোও গানকে প্রভাবিত করে। কোনো কোনো প্রজাতির স্ত্রী পাখিও গান গাইতে পারে এবং তাদের গান গাওয়ার আচরণও হরমোনের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়, বিশেষ করে টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন। টেস্টোস্টেরনের মাত্রা এবং গানের ওপর তাদের প্রভাব ঋতুভেদে পরিবর্তিত হতে পারে, প্রজনন ঋতুতে প্রায়ই উচ্চমাত্রা এবং গান গাওয়ার কার্যকলাপ বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়।

কোন পাখি কীভাবে গান করে

নাইটিঙ্গেল : নাইটিঙ্গেল একটানা কয়েক ঘণ্টা গান গাইতে পারে এবং তার গান বেশ জটিল ও সুরেলা। নাইটিঙ্গেলের গলায় প্রায় ২০০ প্রকার সুর থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে, তারা গান গাওয়ার সময় শ্বাস নেওয়ার মাঝখানে দ্রুত ও নিখুঁতভাবে শব্দ পরিবর্তন করে। সঙ্গী আকর্ষণ ও এলাকা ঘোষণার জন্যই এরা গান করে।

কোকিল বা এশিয়ান কোয়েল (Koel) : পুরুষ কোকিল 'কু-উ কু-উ', এই বিখ্যাত ডাক দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। এটা অনেক দূর থেকে শোনা যায়। স্ত্রী কোকিলকে আকর্ষণ করার জন্যই এরা গান করে। গ্রীষ্মকালে এই গান বেশি শোনা যায়। কারণ, এটি প্রজনন মৌসুম। গান শুনেই আমরা বুঝি কোকিল এসেছে।

বুলবুল : বুলবুল নানা রকম ছন্দ ও স্বরে গান গায়, অনেক সময় শব্দ নকলও করতে পারে। এরা শহরাঞ্চলে সহজেই মানিয়ে নেয়। দ্রুত সুর পাল্টাতে পারে।

ময়না : এরা কণ্ঠ অনুকরণের মাস্টার। মানুষের ভাষা বা অন্য পাখির শব্দ অনুকরণে দারুণ পারদর্শী। কণ্ঠে দুটি সাউন্ড সোর্স থাকে। ফলে একসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সুর তুলতে পারে। এদের গানের উদ্দেশ্য যোগাযোগ, সতর্কতা ও সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা।

জেব্রা ফিঞ্চ : শেখা ও অনুশীলনের মাধ্যমে গান করে। মানুষের ভাষা শেখার প্রক্রিয়ার সঙ্গে এর অনেকটা মিল রয়েছে। এই পাখি সঙ্গী আকর্ষণ ও সামাজিক বন্ধন তৈরি করতে চায়।

শ্যামা : উচ্চ স্বরে ও বৈচিত্র্যময় সুরে গান গায়। দিনের শুরুতে এবং কখনো কখনো সন্ধ্যায়ও এদের গান শোনা যায়। গান অনেকটা কথোপকথনের মতো, একেকটি টোন মানে একেকটি বার্তা। পুরুষ শ্যামা অন্য শ্যামার গান অনুকরণ করতে পারে। সঙ্গীকে আকর্ষণ ও প্রতিযোগীদের হুঁশিয়ারি দেওয়ার জন্য এরা গান করে।

টিয়া : সরাসরি গান গায় না, তবে অসাধারণ শব্দ অনুকরণের ক্ষমতা রাখে। মানুষের কথা, ঘণ্টা, কোকিলের ডাক—সব অনুকরণ করতে পারে। মানুষের ভাষার স্বর-ছন্দ ধরে ফেলে। পাখিটি সিরিনক্স ও জিব নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত দক্ষ।

চড়ুই : ছোট ছোট 'চিপ চিরিক' ধরনের শব্দে গান গায়। গান তেমন জটিল নয়, তবে নির্বিচার ও সামাজিকভাবে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করে। দলীয় যোগাযোগ, সতর্কসংকেত, বাসার অবস্থান জানানোর জন্যই তাদের এই ডাকাডাকি।

লাইরবার্ড : পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ অনুকরণকারী পাখি হিসেবে পরিচিত। ক্যামেরার ক্লিক, অন্য পাখির ডাক—সব অনুকরণ করতে পারে। জটিল ও দীর্ঘ সুরের মাধ্যমে এরা নিজের প্রতিভা দেখায়। মূলত সঙ্গীকে আকৃষ্ট করতেই এই 'নাটকীয়' গান গায় পাখিটি।

মকিংবার্ড : শতাধিক পাখির গান নকল করতে পারে। একটানা মিনিট দশেক গাইতেও পারে, প্রতিটি প্যাটার্ন আলাদা। অন্যদের গান অনুকরণ করে সুরের বৈচিত্র্য বাড়ায়। সঙ্গীকে প্রভাবিত করতে এবং প্রতিযোগীদের ভয় দেখাতেই মূলত এরা গান করে।

কাঠঠোকরা : শব্দ তৈরি করে গাছের গায়ে ঠোকর দিয়ে গান করে, যা একধরনের ড্রামিং। তবে এটা গান না হলেও সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি এলাকা চিহ্নিত করার ও সঙ্গীকে জানানোর একরকম ভাষা।

ইদানীং পাখিদের গান কম শোনা যায়

বড় শহর বা শিল্পাঞ্চলে এখন এত বেশি কোলাহল—গাড়ি, কলকারখানা, হর্ন, নির্মাণকাজ; যার ফলে পাখির গান চাপা পড়ে যায়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, শহরের শব্দমাত্রা প্রতি ১০ ডেসিবেল বাড়লে পাখিরা তাদের গানের সময়সীমা ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে ফেলে। ফলে পাখি গান গাইলেও আমরা শুনতে পাই না। অনেক পাখি গান গাওয়াই বন্ধ করে দেয়। কারণ, তারা নিজেদের সঙ্গীর কাছেও পৌঁছাতে পারে না।

পাখিদের বাসা বাঁধা ও গান গাওয়ার জন্য গাছ, ঝোপঝাড় ও শান্ত পরিবেশ দরকার; কিন্তু নগরায়ণের কারণে গাছ কাটা পড়ছে, বন কমছে। যেসব পাখি জায়গা পাচ্ছে না, তারা অন্যত্র চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ প্রজনন ঋতুতেও ফিরে আসে না। কারণ, বাসা বাঁধার জায়গা নেই।

বায়ুদূষণ ও কীটনাশক শুধু মানুষের ক্ষতি করে না, পাখিদের স্নায়ুতন্ত্রেও প্রভাব ফেলে। এ কারণে তাদের গানের স্বাভাবিক ছন্দ বদলে যায়, অনেক সময় তারা নিঃশব্দ হয়। বিশেষত কীটনাশক পাখিদের খাদ্যচক্রে হস্তক্ষেপ করে, যার ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে তাদের গান গাওয়ার ক্ষমতা।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতুর স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়েছে, পাখির প্রজননের সময় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে গানের সময়ের ওপর। যে পাখি আগে মার্চ-এপ্রিলে গাইত, এখন হয়তো গাইছে ফেব্রুয়ারিতে—যখন আমরা হয়তো শুনতেই পাই না।

২০১৯ সালের এক বড় গবেষণায় দেখা গেছে, গত ৫০ বছরে উত্তর আমেরিকায় প্রায় ৩ বিলিয়ন (৩০০ কোটির বেশি) পাখি হারিয়ে গেছে। ইউরোপ, এশিয়া, এমনকি বাংলাদেশেও বহু স্থানীয় পাখির সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুনতাসীর আকাশ বিজ্ঞানচিন্তাকে বলেন, 'দেশে শব্দদূষণের কারণে পাখিদের ওপর কোনো প্রভাব পড়ছে কি না, এ নিয়ে কোনো গবেষণা নেই। অথচ অডিও মথ ব্যবহার করে সহজেই গবেষণাটি করা যায়। অডিও মথ ক্যামেরা ট্র্যাপের মতোই রিমোটলি কাজ করে। ছবির পরিবর্তে শব্দ ধারণ করে অডিও মথ দিয়ে পাখির ওপর শব্দদূষণের প্রভাব পরিমাপ করা সম্ভব। আশা করি, আমাদের বন বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ নেবে।'

পাখিদের গান ফেরাতে কী করা যায়

বিজ্ঞানীরা বলছেন, গাছ লাগালে পাখিরা ফিরে আসে, বাসা বাঁধে ও গান গায়। তবে যানবাহনের হর্ন ও উচ্চ শব্দ নিয়ন্ত্রণ জরুরি। প্রাকৃতিক কৃষিপদ্ধতি পাখির জন্য নিরাপদ। পোকামাকড় ও ফলদ গাছ রক্ষা করতে হবে।

পাখির গান শুধু প্রকৃতির সুর নয়, এটি বিজ্ঞানের জন্য এক বিস্ময়কর জগৎ। গানের মাধ্যমে তারা প্রেম করে, যুদ্ধ করে, শেখে, অভিযোজিত হয় আর আমাদের শোনায় পৃথিবীর প্রাচীনতম সংগীত।

পাখিদের গান কোনো একঘেয়ে বায়োলজিক্যাল সিগন্যাল নয়। প্রতিটি পাখির আলাদা ভাষা, আলাদা কৌশল আর একেকটি সুরের পেছনে থাকে নিখুঁত বিজ্ঞান।

পাখির গান প্রকৃতির হৃৎস্পন্দন। আজ আমরা যদি সেটি কম শুনি, তার মানে প্রকৃতি কিছু হারাচ্ছে—আমরাও হারাচ্ছি।

বিজ্ঞান আমাদের বলছে, এটি শুধু কল্পনা নয়, একটি বাস্তব সংকেত। যদি আমরা এখনই পদক্ষেপ না নিই, ভবিষ্যতের প্রজন্ম হয়তো পাখির গান কেবল ইউটিউবে শুনবে, প্রকৃতিতে নয়।

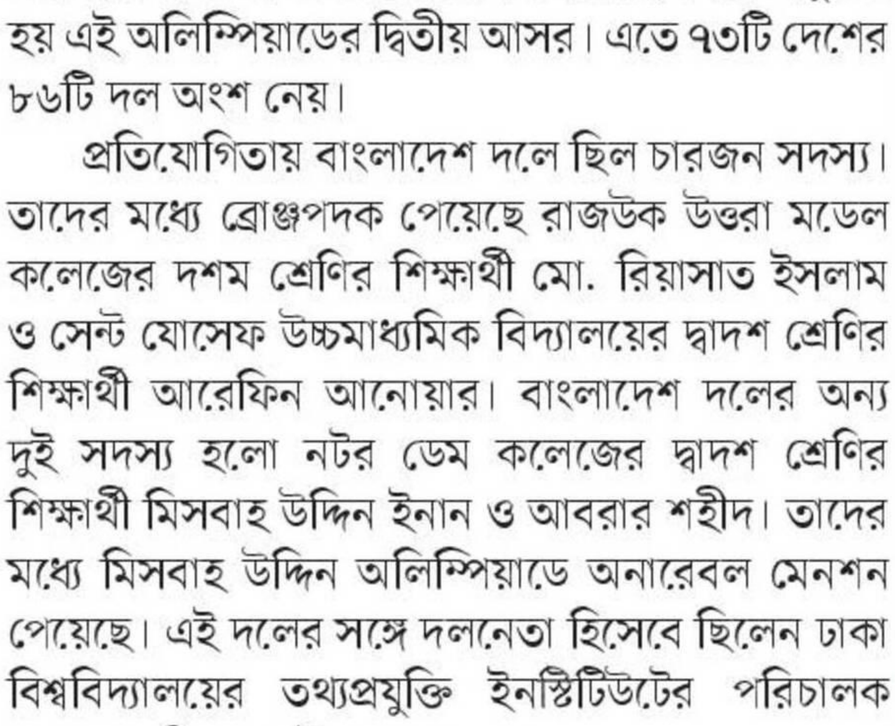
লেখক : সাংবাদিক

বিজ্ঞানায়োজন

আন্তর্জাতিক এআই অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের ২ পদক জয়

আন্তর্জাতিক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অলিম্পিয়াডে দুটি ব্রোঞ্জপদক জিতেছে বাংলাদেশ। গত ৮ আগস্ট, শুক্রবার অলিম্পিয়াডের সমাপনী পর্বে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ২-৯ আগস্ট চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয় এই অলিম্পিয়াডের দ্বিতীয় আসর। এতে ৭৩টি দেশের ৮৬টি দল অংশ নেয়।

প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দলে ছিল চারজন সদস্য। তাদের মধ্যে ব্রোঞ্জপদক পেয়েছে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. রিয়াসাত ইসলাম ও সেন্ট যোসেফ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী আরেফিন আনোয়ার। বাংলাদেশ দলের অন্য দুই সদস্য হলো নটর ডেম কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী মিসবাহ উদ্দিন ইনান ও আবরার শহীদ। তাদের মধ্যে মিসবাহ উদ্দিন অলিম্পিয়াডে অনারেবল মেনশন পেয়েছে। এই দলের সঙ্গে দলনেতা হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক বি এম মইনুল হোসেন।





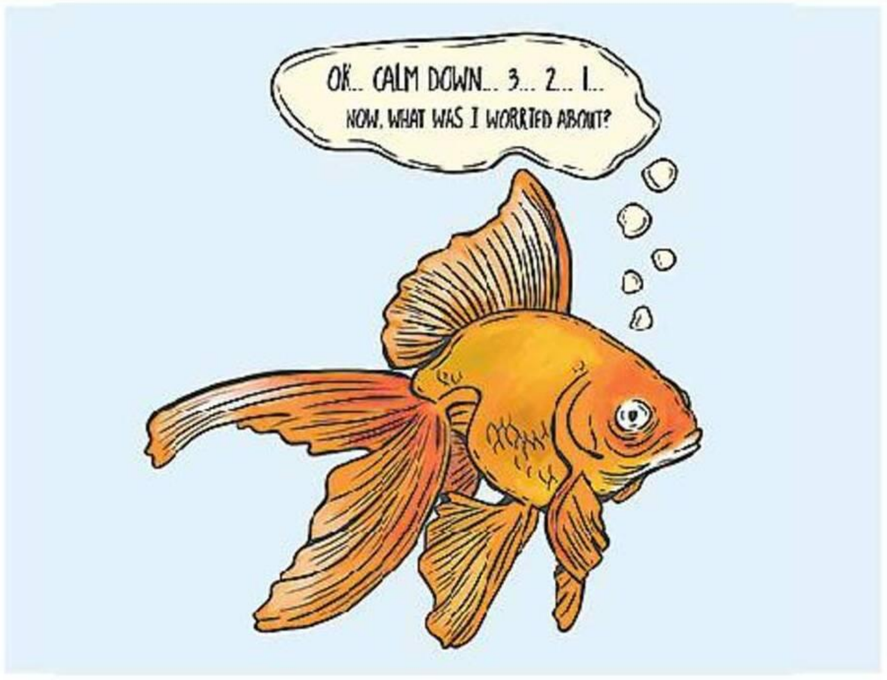
এপেক্স অ্যাস্ট্রো-অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত বাছাইপর্বে পাঁচজন নির্বাচিত

শেষ হলো অ্যাপেক্স অ্যাস্ট্রো-অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত বাছাইপর্ব। গত ২৯-৩০ জুলাই রাজধানীর আফতাবনগরের ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত হয় এ অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত বাছাইপ্রক্রিয়া। এ পর্বে সারা দেশের নির্বাচিত ৩০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। সেখান থেকে নির্বাচন করা হয়েছে ৫ শিক্ষার্থীকে।

নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা হলো সিনিয়র গ্রুপে রাজধানীর হীড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী সপ্তর্ষি রহমান ও আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী রাডিট রাইয়ান। জুনিয়র গ্রুপে যশোরের পুলিশ লাইনস সেকেন্ডারি স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. মকদুম আমীন, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. জুবায়ের হোসাইন এবং খুলনার সাউথ হেরাল্ড ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী সায়ান্তন রয়।

এই পাঁচজন আগামী ২০-২৭ সেপ্টেম্বর রাশিয়ায় অনুষ্ঠেয় ওপেন ওয়ার্ল্ড অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। এ ছাড়া তারা ২৯তম আন্তর্জাতিক অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াড ও এশিয়ান-প্যাসিফিক অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডেও অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

তথ্যকণা



গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি কি সত্যিই দুর্বল

প্রচলিত ধারণা অনুসারে, গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি মাত্র তিন সেকেন্ড স্থায়ী হয়। এই ধারণা আসলে একটি মিথ বা কিংবদন্তি। ধারণাটি এসেছে মূলত ছোট ট্যাংকে এদের আটকে রাখার পক্ষের যুক্তি হিসেবে। তবে বিশ্বজুড়ে গবেষকেরা প্রমাণ করেছেন, গোল্ডফিশ ও অন্যান্য মাছকে বিভিন্ন কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব। এরা গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে সাঁতার কাটতে, আলো বা শব্দের সংকেতে সাড়া দিতে এবং প্রতিদিন একই সময়ে খাদ্যের উৎসে ফিরে যেতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, গোল্ডফিশের স্মৃতিশক্তি তিন সেকেন্ডের পরিবর্তে অন্তত তিন মাস পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

লেখক : আসহাবিল ইয়ামিন, শিক্ষার্থী, ঢাকা কলেজ
সূত্র : হাউ ইট ওয়ার্কস

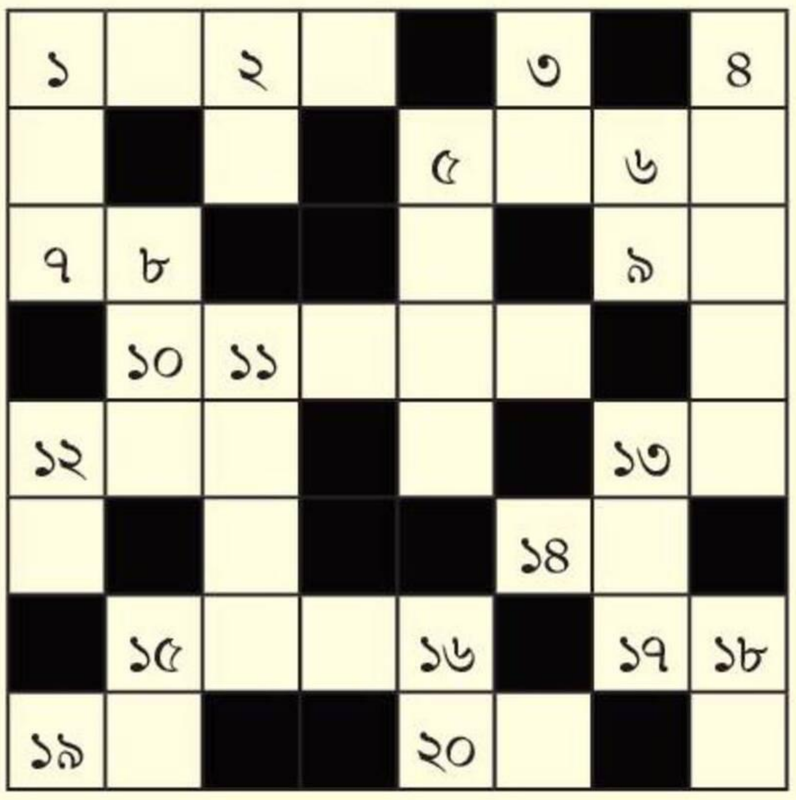


আন্তর্জাতিক আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের স্বর্ণপদক জয়

১৮তম আন্তর্জাতিক আর্থ সায়েন্স অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদকসহ মোট পাঁচটি পদক অর্জন করেছে বাংলাদেশ দল। চীনের জিনিং কনফুসিয়াস স্কুলে এই অলিম্পিয়াড আয়োজিত হয় ৭-১৭ আগস্ট।

এতে দলীয় প্রতিযোগিতা আর্থ সিস্টেম প্রজেক্টে মোহাম্মদ তাহমিদ রহমান পেয়েছেন একটি স্বর্ণপদক। আর ব্রোঞ্জপদক পেয়েছেন ফারিস আহমেদ। আবার দলীয় প্রতিযোগিতা 'আন্তর্জাতিক টিম ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন'-এ বাংলাদেশ দল থেকে মোহাম্মদ তাহমিদ রহমান একটি রৌপ্যপদক পেয়েছেন। আর এককভাবে অংশ নেওয়া 'ইন্ডিভিজ্যুয়াল থিওরেটিক্যাল টেস্ট' এবং 'ইন্ডিভিজ্যুয়াল প্র্যাকটিক্যাল টেস্ট'-এ মোহাম্মদ তাহমিদ রহমান একটি রৌপ্য এবং শেখ ফাহিম মাহমুদ একটি ব্রোঞ্জপদক পেয়েছেন; অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোহাম্মদ তাহমিদ রহমান একটি স্বর্ণপদক এবং দুটি রৌপ্যপদক পেয়েছেন।

শব্দজট ৭



বাঁ থেকে ডানে

১. একপ্রকার শক্তি স্থানান্তর বা নির্গমনপ্রক্রিয়া। ৫. তাপ পরিমাপক যন্ত্র। ৭. অবলম্বন না করে যে উদ্ভিদ বাড়তে পারে না। ৯. চতুষ্পদ প্রাণীর সামনের দিকের পদতল। ১০. অ্যাসপারাগাস পরিবারের বহুবর্ষজীবী বাগানের উদ্ভিদ। ১২. বাইরে সুদৃশ্য অথচ ভেতরে দুর্গন্ধ ও অখাদ্য শাঁসযুক্ত ফল। ১৩. যা মাথাকে ধড়ের সঙ্গে যুক্ত করে। ১৪. স্বল্পতম তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং সর্বোচ্চ শক্তির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণ। ১৫. দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের গুণফল। ১৭. একটি হিংস্র, মাংসাশী ও কর্কশ শব্দকারী শিকারি পাখি। ১৯. মানুষের বসবাসের জন্য নির্মিত কাঠামো। ২০. অতিক্ষুদ্র শস্য, যা থেকে তেল হয়।

ওপর থেকে নিচে

১. একটি গার্হস্থ্য প্রজাতি বা ছোট মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী। ২. একটি অস্বচ্ছ, মৃদু ক্ষারীয় ও লবণাক্ত তরল পদার্থ। ৩. কদম ফুল বা গাছ। ৪. ক্ষুদ্র বন ও বনসদৃশ ঝোপ। ৫. পদার্থবিজ্ঞানে যেখানে তাপ, কাজ, শক্তি ও তাপমাত্রার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়। ৬. মস্তক। ৮. মহাকাশে অবস্থিত আলো বিকিরণকারী বস্তু। ১১. জলপথে ভ্রমণ করার যান। ১২. পাখনা ও সাধারণত দেহের উপরিভাগে আঁশযুক্ত, ফুলকাবিশিষ্ট জলচর মেরুদণ্ডী প্রাণী। ১৩. একধরনের চর্মরোগ। ১৫. সময় পরিমাপক যন্ত্র। ১৬. কানের নিচের নরম মাংস। ১৮. সমকোণে অবস্থিত রেখা।

শব্দজট ৭-এর বিজয়ী দেখুন ৭৭ পৃষ্ঠায়

সমাধান পাঠিয়ে জিতে নিন পুরস্কার!

একটি কাগজে বড় করে লিখুন 'শব্দজট ৭', তারপর উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন। খামের ওপর বড় করে লিখতে হবে 'শব্দজট ৭', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে বিজ্ঞানচিন্তার ঠিকানায়। সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে দৈবচয়নে দুজন পাবেন বিশেষ পুরস্কার!

উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

উত্তর পাঠান : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

শব্দজটটি তৈরি করেছেন **সুমন মাহমুদ**

ডলফিন আর শুশুকের তফাত কী



ডলফিন



শুশুক



গঙ্গা নদীর ডলফিনের ত্বক ধূসর নয়; বরং গোলাপি



ডলফিন বুদ্ধিমান ও কৌতূহলী—প্রায়ই মানুষের কাছাকাছি চলে আসে।

এদের **পৃষ্ঠ পাখনা বাঁকানো**

বটলনোজ ডলফিন



শরীর লম্বাটে ও ছিপছিপে গড়নের

ছোটবেলায় ফেরিতে করে পদ্মা পাড়ি দিচ্ছিলাম। মুগ্ধ চোখে বিশাল জলরাশি আর বড় বড় ঢেউ দেখতে দেখতেই হঠাৎ দেখি ধনুকের মতো বাঁকা একটা প্রাণী পানির ওপর উঠেই আবার সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল। এরপর আরও কয়েকটা। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই জানতে পারলাম, ওগুলো শুশুক। আপনার চোখেও নিশ্চয়ই কখনো কখনো এমন দৃশ্য ধরা পড়েছে? আরেকটু বড় হয়ে দেখা পেয়েছি ডলফিনের। কিন্তু শান্তশিষ্ট এই দুটো প্রাণীর পার্থক্য কী? চট করে দেখে চেনার উপায়ই-বা কী? চলুন, জেনে নিই।

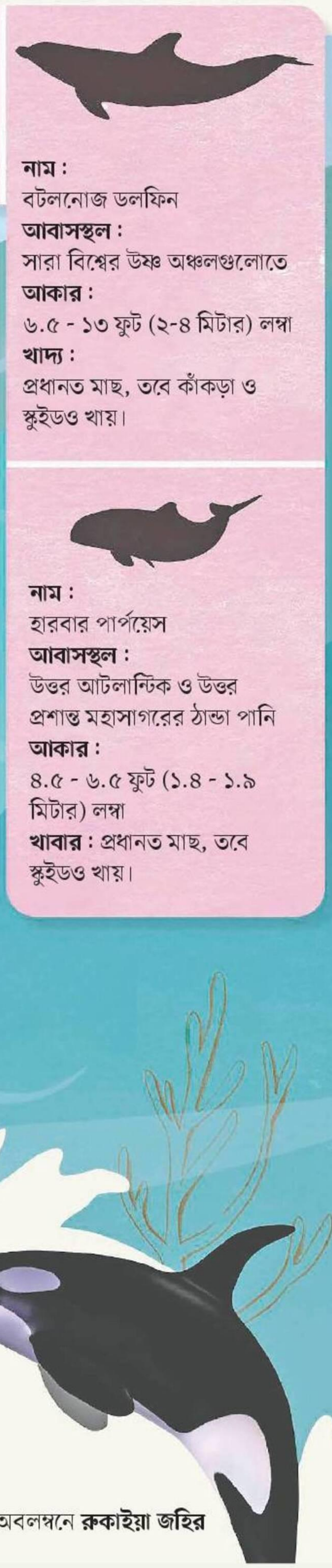
ডলফিন না শুশুক

ডলফিন ও পার্পয়েস একে অপরের আত্মীয়, তারা সিটেশিয়ান (Cetacean) নামের এক পরিবারের অংশ। মজার ব্যাপার হচ্ছে সাগর দৈত্য তিমিও কিন্তু এই পরিবারে অন্তর্ভুক্ত। যদিও তারা পানির নিচে বসবাস করে, তবু তারা স্তন্যপায়ী প্রাণী, তাই শ্বাস নিতে মাঝেমধ্যে পানির ওপরে উঠে আসে।

জানেন কি

ডলফিনের নাক লম্বা, শুশুকেরটা চ্যাপটা। এদের পাখনার গঠনও আলাদা। ডলফিনেরা মানুষ দেখে ভয়ে না পালিয়ে বরং বন্ধু হতে চায়। কিন্তু লাজুক শুশুকেরা সাধারণত মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে।



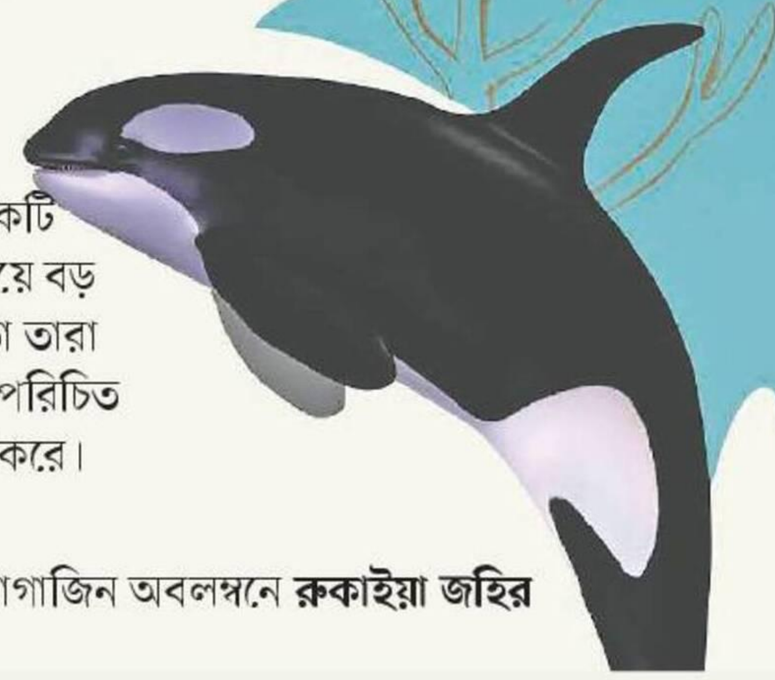


নাম :
বটলনোজ ডলফিন
আবাসস্থল :
সারা বিশ্বের উষ্ণ অঞ্চলগুলোতে
আকার :
৬.৫ - ১৩ ফুট (২-৪ মিটার) লম্বা
খাদ্য :
প্রধানত মাছ, তবে কাঁকড়া ও স্কুইডও খায়।

নাম :
হারবার পার্পয়েস
আবাসস্থল :
উত্তর আটলান্টিক ও উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের ঠান্ডা পানি
আকার :
৪.৫ - ৬.৫ ফুট (১.৪ - ১.৯ মিটার) লম্বা
খাবার : প্রধানত মাছ, তবে স্কুইডও খায়।

পরিবারের মিল

ওরকা (Orca) ডলফিনের একটি প্রজাতি—এই পরিবারের সবচেয়ে বড় সদস্য। অন্যান্য ডলফিনের মতো তারা সামাজিক এবং পড (Pod) নামে পরিচিত পরিবারের মতো গোষ্ঠীতে বাস করে।



বিদেশি ম্যাগাজিন অবলম্বনে **রুকাইয়া জহির**

কার্যকারণ

আব্দুল কাইয়ুম

মহাশূন্যে বাতাস নেই অথচ পৃথিবীতে এত বাতাস কেন?

সূর্যের গ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণধারণের উপযুক্ত বায়ুমণ্ডল আছে। এই বায়ুমণ্ডল কোটি কোটি বছরের বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিকে লাখ লাখ আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটত। তরল লাভার সঙ্গে প্রচুর বাষ্পও বের হতো। বাষ্প তো আসলে পানি, যার উপাদানগুলো হলো ২ ভাগ হাইড্রোজেন ও ১ ভাগ অক্সিজেন পরমাণু। অগ্ন্যুৎপাতে আরও বের হতো কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া। ১টি কার্বন ও ২টি অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড অণু এবং ১টি নাইট্রোজেন ও ৩টি হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ে অ্যামোনিয়া অণু গঠিত। লক্ষ করলে দেখব, এসব অণু-পরমাণু নিয়েই মূলত বায়ুমণ্ডল গঠিত। অবশ্য আরও কিছু ছোটখাটো গ্যাসীয় অণু বাতাসে রয়েছে। ওগুলোও এসেছে সেই অগ্ন্যুৎপাতের সময় গলিত লাভার সঙ্গে। এখন প্রশ্ন হলো, আগ্নেয়গিরি থেকে তো মুক্ত অক্সিজেন বের হয়নি। তাহলে পৃথিবীর বাতাসে এত অক্সিজেন এল কীভাবে?

অক্সিজেন এসেছে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও বাষ্পীয় পানি থেকে। আমরা আগেই দেখেছি, এদের উপাদানে অক্সিজেন রয়েছে। এই অক্সিজেনকে গ্যাসীয় অণুগুলো থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে আসল ভূমিকা রেখেছে মহাসাগরের পানি ও প্রাথমিক স্তরের ব্যাকটেরিয়া। সূর্যের আলোও সেখানে ভূমিকা রেখেছে। সাগরের পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটি বড় অংশ দ্রবীভূত হয়। সেখান থেকে ব্যাকটেরিয়া সূর্যের আলো ও কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে শুধু কার্বনটুকু কাজে লাগায় এবং অক্সিজেন মুক্ত করে। অন্যদিকে সূর্যের আলো অ্যামোনিয়ার অণু ভেঙে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন আলাদা করে। হাইড্রোজেনের ঘনত্ব খুব কম। হালকা বলে বেশ কিছু হাইড্রোজেন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল উপেক্ষা করে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অ্যামোনিয়া থেকে যায়। বাতাসে এখন প্রায় ৫ ভাগের ১ ভাগ অক্সিজেন এবং বাকি ৪ ভাগের সামান্য কম নাইট্রোজেন। এ ছাড়া রয়েছে ১ শতাংশের মতো কার্বন ডাই-অক্সাইড। সামান্য কিছু হিলিয়াম, আরগন, ক্রিপটন, নিয়ন, জেনন প্রভৃতি নিষ্ক্রিয় গ্যাসও আছে।

পৃথিবীর আদি যুগে এসব গ্যাসের পরিমাণ কিন্তু ছিল খুব কম। কালের বিবর্তনে পরিমাণ বাড়তে থাকে। গ্যাসগুলোর বর্তমানের এই নির্দিষ্ট অনুপাতে পৌঁছাতে প্রায় ৫০০ কোটি বছর লেগেছে। বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলোর এই অনুপাত পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য একেবারে আদর্শ। প্রাণী ও উদ্ভিদের ব্যবহারের জন্য গ্যাসগুলো এক অভাবনীয় অনুপাতে অবস্থান করছে। প্রাণীরা বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। বিপরীতে উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এই দুই গ্যাসীয় উপাদানের অনুপাতের হেরফের হলে বিপর্যয় দেখা দেবে। কারণ, বনভূমি কমে গেলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়, দেখা দেয় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি। তখন পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। এই প্রতিকূল প্রক্রিয়া এখনই শুরু হয়ে গেছে। সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহে কিছু বায়ুমণ্ডল থাকলেও সেখানে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য অক্সিজেন কম বা একেবারেই নেই। গ্রহগুলোর বাইরে মহাশূন্যে বাতাস থাকতে পারে না। কারণ, বাতাস ধরে রাখার জন্য দরকার অভিকর্ষ বল। কোনো বস্তুপিণ্ড, তথা ভর ছাড়া তো অভিকর্ষ বল থাকে না। তাই পদার্থবিহীন মহাশূন্যে কোনো বাতাস নেই।

ধাঁধা

প্রাচীন রুপার মুদ্রা-রহস্য

একটি জাদুঘরের প্রদর্শনীর বাক্স থেকে অতি প্রাচীন রুপার মুদ্রা চুরি গেছে। তবে সেখানে রাখা হয়েছে একটি নকল মুদ্রা। এ ঘটনার পর সেখানে পুলিশ আসে। পুলিশ কর্মকর্তা জাদুঘরের নতুন ইন্টার্নকে সন্দেহ করেন। কারণ, তিনিই সকালে প্রদর্শনীটি পরিষ্কার করেছেন। ইন্টার্ন জানিয়েছেন, 'আমি সকালে বাক্স খুলে মুদ্রাগুলো নরম কাপড় দিয়ে মুছে আবার তালা দিয়ে দিয়েছি। চুরিটা নিশ্চয়ই বিকেলে কেউ করেছে। দেখুন, নকল মুদ্রাটার গায়ে একটি নতুন করে লাগা আঁচড়ের দাগ আছে। চোর নিশ্চয়ই তাড়াহুড়ায় বিকেলে মুদ্রা বদলানোর সময় এই দাগ ফেলেছে।' পুলিশ কর্মকর্তার রসায়নে বেশ ভালো জ্ঞান ছিল। তিনি একটি আতশি কাচের সাহায্যে নকল মুদ্রাটির আঁচড় ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। মুদ্রাটি নকল হলেও সেটি রুপা দিয়েই তৈরি। আঁচড়ের ভেতরের অংশটুকু দেখার পর তিনি নিশ্চিত হলেন, ইন্টার্ন মিথ্যা বলছেন এবং তিনিই চোর। বলুন তো, আঁচড়ের দাগ দেখে পুলিশ কর্মকর্তা কীভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন?

গত সংখ্যার সমাধান

বনসাই-রহস্য

বিশেষ ওই ছত্রাক বাতাসের মাধ্যমে স্পোর বা রেণু ছড়ায়। এগুলো অত্যন্ত হালকা এবং আণুবীক্ষণিক হওয়ায় খুব সহজেই জুতার তলায় বা কাপড়ের ভাঁজে আটকে যেতে পারে। যে ওই ছত্রাকের আশপাশে গিয়েছে, শুধু তার জামা বা জুতায় এই ছত্রাকের স্পোর পাওয়া যেতে পারে। কারণ, শহরের আর কোথাও এই ছত্রাক নেই। যেহেতু সংগ্রাহকের ফরেনসিক রিপোর্টে ছত্রাকের রেনু পাওয়া গেছে, তারমানে সে গ্রীনহাউসের মধ্যে ঢুকেছিল এবং বনসাইটি চুরি করেছে

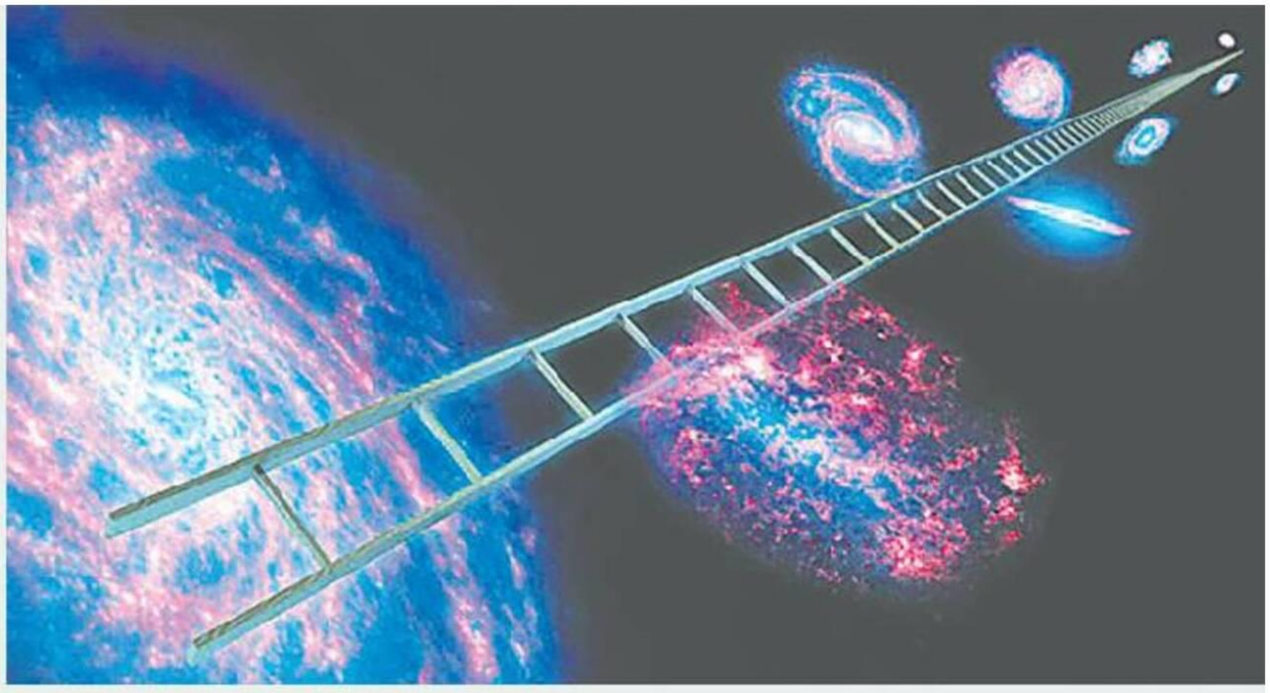
সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দিন বিজ্ঞানচিন্তার ঠিকানায়। সমাধানদাতা ২ জনের জন্য পুরস্কার হিসেবে রয়েছে ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর। খামের ওপর অবশ্যই 'গোয়েন্দা ধাঁধা' লিখবেন। উত্তরের সঙ্গে আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন।

প্রশ্নোত্তরে বিজ্ঞান

উত্তর দিচ্ছেন সম্পাদক **আব্দুল কাইয়ুম**

প্রশ্ন : চলন্ত ট্রেনে ফড়িং ঢুকে পড়লে সেটি কি ট্রেনের গতিতে উড়বে?

উত্তর : পরীক্ষা করে দেখাই তো ভালো। ফড়িংটা যদি আগে থেকে চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই থাকে, তাহলে নিউটনের প্রথম গতিসূত্র অনুযায়ী ট্রেনের গতিতেই স্বাভাবিকভাবে উড়তে পারবে। কিন্তু একটি চলন্ত ট্রেনে যদি বাইরে থেকে কোনো ফড়িং ঢুকে পড়ে, তাহলে সে ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা খেতে পারে বা না-ও পারে। নির্ভর করে সে কত গতিতে উড়ে ট্রেনে ঢুকছে তার ওপর। চলন্ত ট্রেনের গতির চেয়ে সে ধীরে না জোরে চলে ট্রেনে ঢুকছে তার ওপর। তবে যেহেতু ফড়িং প্রয়োজন অনুযায়ী তার গতি বাড়াতে বা কমাতে পারে, তাই এ ক্ষেত্রে ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা কম।



প্রশ্ন : মহাকাশের বিভিন্ন গ্রহ, নক্ষত্র ও গ্যালাক্সির দূরত্ব কীভাবে মাপা হয়?

উত্তর : জ্যোতির্বিদেরা বিভিন্ন জ্যামিতিক বা গাণিতিক সূত্র ব্যবহার করে গ্রহ-নক্ষত্র বা আরও দূরবর্তী গ্যালাক্সির দূরত্ব বের করেন। যেমন তুলনামূলক দূরবর্তী কোনো নক্ষত্রের তুলনামূলক ঔজ্জ্বল্য বের করে দূরত্ব বের করা যায়। যে নক্ষত্র যত দূরে থাকবে, তার ঔজ্জ্বল্য তত ম্লান হবে। পৃথিবীর কোনো এক বিন্দুতে আকাশের কোনো নক্ষত্রের অবস্থান ছয় মাসের ব্যবধানে তার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য নক্ষত্র থেকে কতটা দূরে সরে গেল, সেটা হিসাব করে তারকার দূরত্ব বের করা যায়। এ ধরনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। এ ধরনের একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো 'কসমিক ডিসট্যান্স ল্যাডার'। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব বের করা যায়।

সুডোকু ৫৪

সুডোকু বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় বুদ্ধিবৃত্তিক ধাঁধা। বুদ্ধির ব্যায়াম করতে, নিউরনের ক্ষমতা বাড়াতে কিংবা সময়কে আনন্দময় করতে এই জাপানি ধাঁধা সহায়ক হতে পারে। প্রতিটি কলাম ও সারিতে ১-৯ পর্যন্ত সব কটি অঙ্ক মাত্র একবার বসাতে হবে। তেমনি প্রতিটি ৩×৩ বর্গক্ষেত্রের ভেতরেও ১-৯ পর্যন্ত সব কটি অঙ্ক একবার বসবে। নিচের সুডোকুটি পূরণ করে পুরস্কার জিতে নিন।

সুডোকু ০১

		৯		২			৩	
	৬	৮	১		৫	৭	৯	
	২	৪	৯	৮	৩		১	
৭			৩		৬			২
		১		৯		৩		
২			৫		১			৭
	১		৬	৭	৪	২	৮	
	৩	৫	২		৮	৯	৪	
	৪			৩		১		

সুডোকু ০২

	৩			৯		৮		
		৯			৪	২		
	৪		২		৬		৭	
		৫		৭			৮	৩
	১						২	
	৮			৪		৯		
	৭		৩		৫		৯	
		৬	৯			১		
		৩		১			৬	

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দিন বিজ্ঞানচিন্তার ঠিকানায়। সমাধানদাতা একজন পাবেন ৫০০ টাকার বই। উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর। খামের ওপর অবশ্যই 'সুডোকু ৫৩' লিখবেন। উত্তরের সঙ্গে আপনার নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখুন।

গত সংখ্যার গোয়েন্দা ধাঁধার বিজয়ী

নাফিসা বিনতে মাহবুব, ঈশ্বরদী, পাবনা
শাহরিয়ার মাহমুদ নাফিজ, যাত্রাবাড়ী
রেদুয়ান ইসলাম রুমান, রাজনগর, পঞ্চগড়

শব্দজব্দ ৬-এর বিজয়ী

রিয়া ইসলাম, সদর, রাজবাড়ী
আরিয়া ইসলাম, নড়িয়া, শরীয়তপুর
প্রিয়াঙ্কা রায়, রুমা, বান্দরবান

সুডোকু ৫৩-এর বিজয়ী

রাবিদ আল হাসান, দিঘাপাতিয়া, নাটোর
স্নেহা তাসনিম, আদর্শ মুসলিমপাড়া, চাঁদপুর
নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

ধাঁধা

তিন অঙ্কের কোন সংখ্যাটি একই সঙ্গে বর্গসংখ্যা, আবার ঘনসংখ্যা?

আব্দুল কাইয়ুম



আমরা গণিতের সমস্যা নিয়ে কাজ করার সময় বড় বড় সংখ্যা পাই। কিন্তু এদের মধ্যে কিছু সংখ্যা দেখে আমরা বেশ অবাক হয়ে যাই। যেমন ধরো, আমরা তো বড় বড় গুণ-ভাগের অঙ্ক করি। কিন্তু যদি কোনো সংখ্যাকে ১৮ দিয়ে ভাগ করি? ভাগফলটি কিন্তু বেশ চমকপ্রদ হতে পারে। সাধারণত আমরা হয়তো তা খেয়াল করি না। যেমন ১০০/১৮ = ১.২৩৪৫৬৭৯০১২৩। কেমন? খুব অবাক হতে হয় না? শুধু মাঝখানে ৮ অঙ্কটি বাদ গেছে, এরপর আবার যেন প্রথম থেকে শুরু হয়ে গেছে, তা-ই না? অবশ্য অঙ্ক করার সময় এ ধরনের মিল অনেক সময় পাওয়া যায়।

এ মাসের ধাঁধা

যদি প্রশ্ন করি, ২ অঙ্কের এমন একটি সংখ্যা বলো তো, যেটা একই সঙ্গে বর্গসংখ্যা আবার ঘনসংখ্যা? এর উত্তর হয়তো অনেকেই চট করে বলতে পারবে। সংখ্যাটি হতে পারে ৬৪। কারণ, ৬৪ = (৮ × ৮) = (৪ × ৪ × ৪)। হ্যাঁ, উত্তর সঠিক!

এবার একই ধরনের একটি ধাঁধা দিচ্ছি। একটু চিন্তা করে বলো তো, ১০০ থেকে ৯৯৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে ৩ অঙ্কের কোন সংখ্যাটি বর্গসংখ্যা আবার একই সঙ্গে ঘনসংখ্যাও?

তোমার উত্তর দ্রুত পাঠিয়ে দাও বিজ্ঞানচিন্তার অফিসের ঠিকানায়। সঠিক উত্তর বিজয়ীদের ১০ জনের নাম প্রকাশিত হবে আগামী সংখ্যায়।

গত সংখ্যার উত্তর

পাঁচটি বিজোড় অঙ্ক বের করো তো, যেসব অঙ্ক বা অঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত সংখ্যাগুলোর যোগফল ১৬। উল্লেখ্য, এক বা একাধিক অঙ্কের সমন্বয়ে সংখ্যা তৈরি হতে পারে।

উত্তর

১ + ১ + ১ + ১৩

যেভাবে উত্তর বের করলাম

এখানে ৪টি বেজোড় সংখ্যা রয়েছে, যা ৫টি অঙ্কের সমন্বয়ে গঠিত। এদের যোগফল ১৬।

আগস্ট সংখ্যার সঠিক ১০ উত্তরদাতা

জান্নাতুন নওরিন, ডিমলা, নীলফামারী
ইশতিয়াক আহমেদ, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও
ফয়সাল আহমেদ, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
গালিব হাসান, নকলা, শেরপুর
হাসিবুল ইসলাম, মিঠাপুকুর, রংপুর
ইমরান হোসেন, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা
জয়ন্ত কুমার, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
ফারহানা মিম, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও
ইফফাত জাহান, বাবুগঞ্জ, বরিশাল
উম্মে কুলসুম, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

পাঠক যখন লেখক

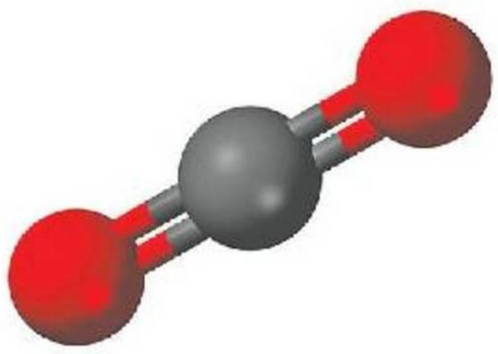
হয়তো আপনার ভেতরেই লুকিয়ে আছে আগামী দিনের বিজ্ঞান লেখক। হয়তো আপনি চাইছেনও কিছু একটা লিখতে। তবে দেরি কেন, ৫০০ শব্দের ভেতর লিখে ফেলুন বিজ্ঞান বা গণিতবিষয়ক কোনো ফিচার কিংবা মজার তথ্য। পাঠাতে পারেন বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের খবরও। তবে যা-ই লিখুন, সেটাতে যেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি, ব্যাখ্যা এবং সূত্রটা থাকে ঠিকমতো। তারপর লেখাটা পাঠিয়ে দিন বিজ্ঞানচিন্তার দপ্তরে। মানসম্মত লেখাগুলো প্রকাশ করা হবে বিজ্ঞানচিন্তা অনলাইন বা প্রিন্ট সংস্করণে। লেখা পাঠাতে পারেন—editor@bigganchinta.com ঠিকানায়। অথবা লেখা অ্যাটাচ করে দিতে পারেন facebook.com/bigganchinta এই পেজের ইনবক্সেও। ডাকযোগে বা কুরিয়ারে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫।



রসায়ন কুইজ ১০৫

১. মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকর কোন গ্যাস নিশ্বাসের মাধ্যমে বের হয়?

ক. অক্সিজেন
খ. নাইট্রোজেন
গ. কার্বন ডাই-অক্সাইড



২. লেবুর রসে কোন ধরনের অ্যাসিড থাকে?

ক. সাইট্রিক অ্যাসিড
খ. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড
গ. সালফিউরিক অ্যাসিড

৩. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে কোন গ্যাস?

ক. অক্সিজেন
খ. নাইট্রোজেন
গ. হাইড্রোজেন

রসায়ন কুইজ ১০৪

১. ক. লিথিয়াম
২. খ. ৭
৩. খ. ডায়মন্ড

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ১০৫



১. আলোর সাহায্যে কোনো কিছুকে বড় করে দেখতে আমরা কোন যন্ত্র ব্যবহার করি?

ক. পেরিস্কোপ
খ. মাইক্রোস্কোপ
গ. টেলিস্কোপ

২. কোনো বস্তুর গতিপথ পরিবর্তনের জন্য কী প্রয়োগ করতে হয়?

ক. ভর
খ. বল
গ. ক্ষমতা

৩. বিদ্যুৎ পরিবাহী সবচেয়ে ভালো ধাতু কোনটি?

ক. সোনা
খ. তামা
গ. লোহা

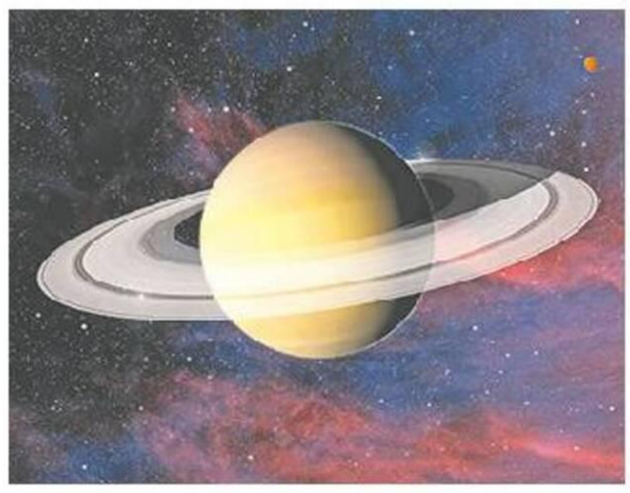
পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ১০৪

১. গ. ০ m/s^2
২. ক. ওজন
৩. খ. গামা রশ্মি

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ১০৫

১. আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে ছোট গ্রহ কোনটি?

ক. শনি
খ. বৃহস্পতি
গ. বুধ



২. নিচের কোনটি বামন গ্রহ?

ক. পৃথিবী
খ. প্লুটো
গ. বুধ

৩. আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনটি পৃথিবী থেকে প্রায় কত উচ্চতায় অবস্থিত?

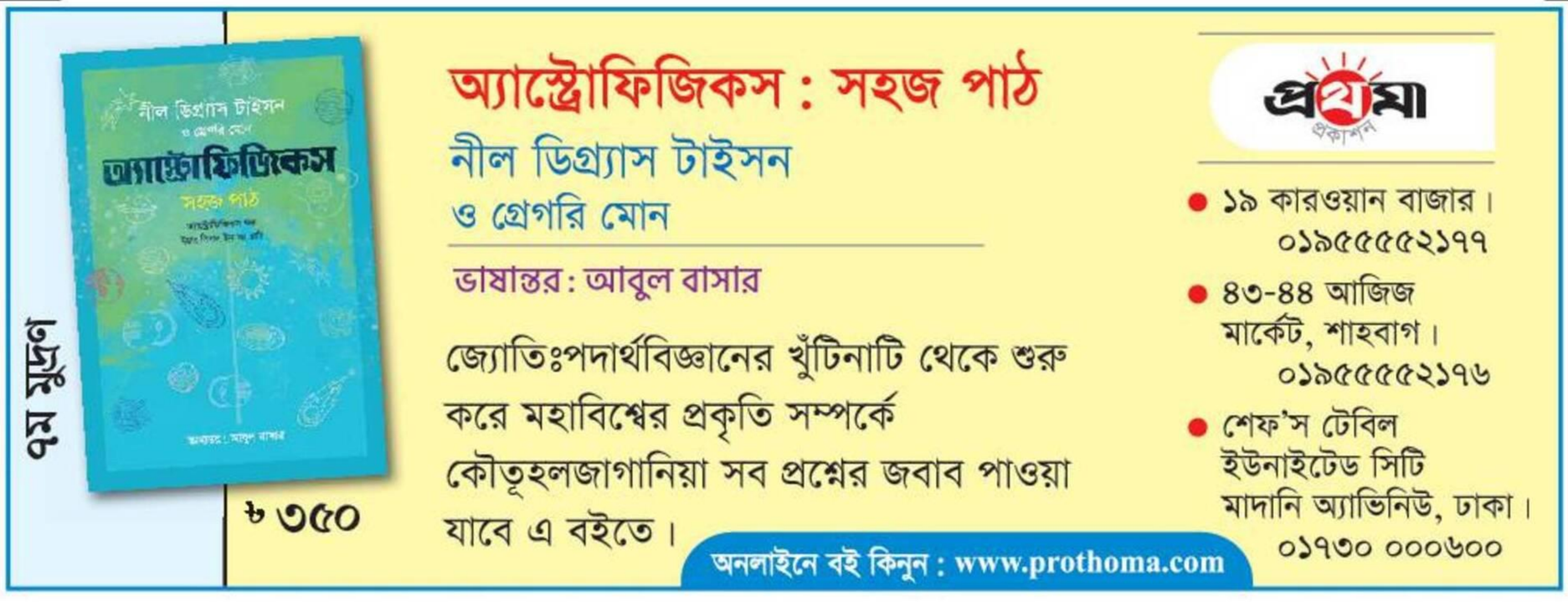
ক. ৪২০ কিলোমিটার
খ. ৬০০ কিলোমিটার
গ. ৯০০ কিলোমিটার

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ১০৪

১. ক. ৯০ মিনিটে
২. খ. পরমাণু সংকুচিত হয়ে নিউট্রনে পরিণত হয়
৩. খ. বৃহস্পতির ঘূর্ণিঝড়

প্রতিটি কুইজের উত্তর আলাদা কাগজে লিখে পাঠাতে হবে। না হলে উত্তর গ্রহণযোগ্য হবে না। একই খামে একাধিক কুইজ পাঠানো যাবে। আগে কাগজে বড় করে কুইজের নাম লিখে পরে উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে হবে। খামের ওপর প্রথমে বড় করে লিখতে হবে 'কুইজ', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। প্রতিটি বিভাগে তিনজন করে কুইজ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবেন রকমারি.com -এর সৌজন্যে ৩০০ টাকার বই। কুইজের উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : **বিজ্ঞানচিন্তা**, ১৯, প্রথম আলো ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।



জীববিজ্ঞান কুইজ ১০৫

১. আমাদের শরীরের সবচেয়ে বড় অঙ্গ কোনটি?

ক. ফুসফুস
খ. মস্তিষ্ক
গ. ত্বক



২. কোন প্রাণীর দাঁত আছে, কিন্তু চোখ নেই?

ক. কেঁচো
খ. তিমি
গ. হাতি

৩. আমাদের শরীরের কোন অংশ খাবার হজমে সাহায্য করে?

ক. ফুসফুস
খ. পাকস্থলী
গ. যকৃত

.....

জীববিজ্ঞান কুইজ ১০৪-এর উত্তর

১. খ. ইনসুলিন
২. খ. পাতা
৩. ক. ১২০ দিন

প্রযুক্তি কুইজ ৭৭

১. কম্পিউটারের কোন অংশকে মস্তিষ্কের সঙ্গে তুলনা করা যায়?

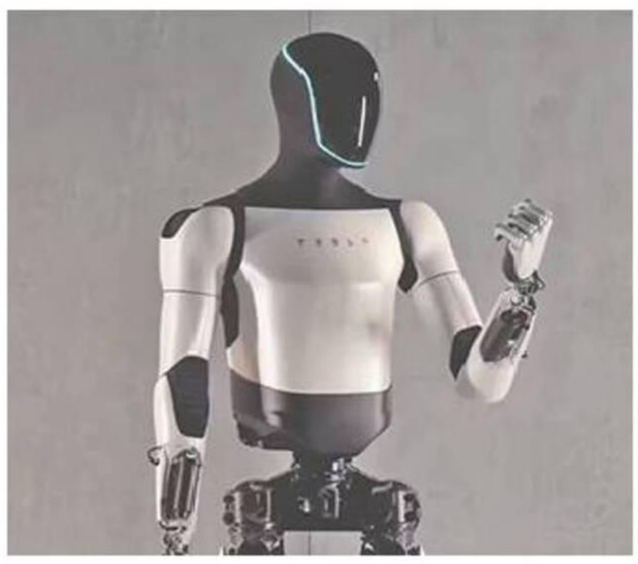
ক. মনিটর
খ. কি-বোর্ড
গ. সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট

২. স্মার্টফোনে তথ্য জমা রাখার জন্য কোন যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয়?

ক. র‍্যাম
খ. হার্ডডিস্ক
গ. গ্রাফিকস কার্ড

৩. মানুষের মতো দেখতে রোবটকে কী বলে?

ক. হিউম্যানয়েড রোবট
খ. রোবোটিক ম্যান
গ. রোবট মানব



.....

প্রযুক্তি কুইজ ৭৫-এর উত্তর

১. খ. অ্যান্ড্রয়েড
২. ক. মানুষ আর রোবট আলাদা করতে
৩. ক. অ্যান্টিভাইরাস

বিজ্ঞানচিন্তার গ্রাহক হোন



এক বছর বা ছয় মাসের গ্রাহক হয়ে

ঘরে বসেই
সংগ্রহ করুন
বিজ্ঞানচিন্তা

গ্রাহক হতে ফোন করুন
নিচের নম্বরে
০১৭০৮৪১১৯৯৬

ডেলিভারি চার্জ ছাড়া ঘরে বসে পেতে চাইলে যোগাযোগ করুন :

prothoma.com

বিজ্ঞানচিন্তা

বিজ্ঞানচিন্তার আগস্ট সংখ্যার কুইজ বিজয়ী

গত সংখ্যার সব বিভাগের কুইজের উত্তর অনেকেরই সঠিক হয়েছে। তবে লটারির মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগে ৩ জন করে ১৫ জন বিজয়ীকে বাছাই করা হয়েছে। বিজয়ী প্রত্যেকে পাবেন ৩০০ টাকার বই। বিজয়ীদের অভিনন্দন।

সৌজন্যে
অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স
বাংলাদেশের প্রথম সায়েন্স কিট

রসায়ন কুইজ ১০৪

নূর হাসানাত পরশ
চুরখাই, সদর, ময়মনসিংহ

গাজী তাহিয়া ইসলাম
রাজপাড়া, রাজশাহী

মাহিমা তাবাসসুম
কলেজ রোড, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

পদার্থবিজ্ঞান কুইজ ১০৪

মোবাশ্বের হোসেন
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম

নাফিসা বিনতে মাহবুব
আলোবাগ মোড়, পাবনা

সাইফুল ইসলাম
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা

মহাকাশবিজ্ঞান কুইজ ১০৪

রাবিদ আল হাসান
দিঘাপতিয়া, নাটোর

আওলাদ হোসেন
গাজিরখেয়া বাজার, ধর্মপুর, নোয়াখালী

অঙ্গন ঘোষ
মল্লিকাহাটি, ঘোষপাড়া

জীববিজ্ঞান কুইজ ১০৪

ওয়াসিমা ওয়াদুদ
টঙ্গী, গাজীপুর

জুওয়াইরিয়া
কাউতলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

রোমেনা পারভীন তিথি
টুটপাড়া কবরখানা, খুলনা

প্রযুক্তি কুইজ ৭৬

শুভম রায়
থানাপাড়া, নীলফামারী

ধীমান সান্যাল
মেরিগোল্ডপাড়া, নওগাঁ

মাহমুদুল হাসান রুম্মান
ফেনী সদর, ফেনী

Aarong Dairy

Milk for Good

Aarong Dairy

Mango Milk Drink
UHT
200 ml

a BRAC social enterprise

মজায় মজায় খেলাদিতাই

Aarong Dairy
Chocolate Milk Drink
UHT
200 ml

Aarong Dairy
Mango Milk Drink
UHT
200 ml

Aarong Dairy
VANILLA
MILK DRINK
UHT

Aarong Dairy
Strawberry Yogurt Drink
UHT
200 ml

BIGGANCHINTA September, 2025 Regd, DA 6410, Year 09 Issue 12, Tk. 50

